বুঝে নিন আধুনিক বিজ্ঞান

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপর শীর্ষক বক্তৃতামালা

বক্তা : ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী
Diploma in Science & Technology, England



লেকচার নোট্স

লেকচার নোট্স

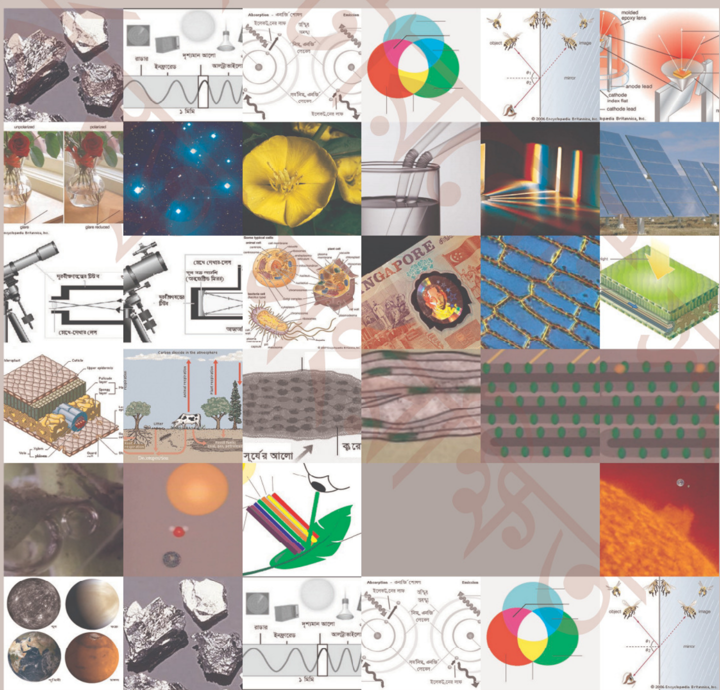
বুঝে নিন আধুনিক বিজ্ঞান

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপর শীর্ষক বক্তৃতামালা

২১-৪১

বক্তা : ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

Diploma in Science & Technology, England



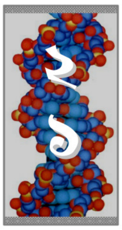
KAA Publication

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া

আলী সেন্টার, সুবিদ বাজার পয়েন্ট, সিলেট।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম





বক্তাঃ ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী, নেশন্যাল ডিপ্লোমা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ইংল্যান্ড।

স্থানঃ খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সুবিদ বাজার, সিলেট।

ঘ. বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক বিজ্ঞান

বক্তৃতা ২১ : আধুনিক প্রযুক্তি

'বুঝে নিন আধুনিক বিজ্ঞান' লেকচারের একুশতম সংযোজনে সকল শিক্ষার্থী বন্ধুদের উষ্ণ স্বাগত জানাচ্ছি। আমরা এ লেকচারেও আধুনিক কয়েকটি প্রযুক্তির উপর আলোচনা করবো। বিজ্ঞান শুধু মনের ভেতর জাগ্রত **'জানার আগ্রহ'** মেটানোর বিষয় নয়। মানবকল্যাণে একে নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে ব্যবহার করার কাজও বিজ্ঞানের। আর এ পদ্ধতির নামই টেকনোলজি বা প্রযুক্তি। যাক, আমরা ইতোমধ্যে ৬টি প্রযুক্তির উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি। আমাদের ধারণায় এগুলো ও পরবর্তীতে ব্যাখ্যাত আরো ৮টি আধুনিক প্রযুক্তি আজকের মানব-সভ্যতায় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে এবং দূর ভবিষ্যৎ পর্যন্ত রাখবেও। তবে হয়তো প্রতিটি প্রযুক্তি দিন দিন আরো পরিবর্তিত, সংশোধিত ও উন্নততর হবে। অন্তত অতীতের ইতিহাস তা-ই প্রমাণ করে। আজকে আমরা তিনটি বিষয়ের উপর বর্ণনা সীমিত রাখবো। এগুলো হলোঃ **১. স্থির ও চলচিত্র ক্যামেরা, ২. টেলিভিশন ও ৩. এটম বোমা**।

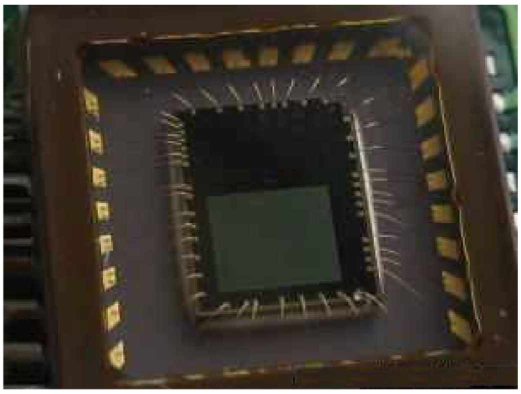
৭. স্থির ও চলচিত্র ক্যামেরা

আজকাল আমাদের মোবাইল সেটে স্থির ও চলচিত্র [**অডিও ও ভিডিও**] রেকর্ড ও প্রদর্শনের সুযোগ হয়েছে। আমরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদিতে যাই এবং বক্তা বা অনুষ্ঠানের স্থির চিত্র, শব্দ না হয় ভিডিও রেকর্ড করে নিই। এরপর নিজের ল্যাপটপ বা কম্পিউটারে ব্লুটুথ, সরাসরি ইউএসবি পোর্টের সঙ্গে যুক্ত করে কিংবা মেমরী কার্ড সংযুক্ত করে ছবি, অডিও-ভিডিও রেকর্ডিং কপি করে নিই। এখন এগুলো ই-মেইলে বন্ধু-বান্ধবের নিকট পাঠানো বা এমনকি ইন্টারনেটের ওয়েভসাইটে আপলোড [upload] করা যাবে। আধুনিক এই প্রযুক্তির সুফল আমরা ভোগ করছি সবাই। তবে একথা নিশ্চিত, সকলে এই টেকনোলজির মূলে কী আছে তা জানি না। এবার তা উন্মুক্ত হবে- কিন্তু খুব সংক্ষেপে।

আমরা সবাই সাধারণ ক্যামেরা দেখেছি। যে কোনো মুহূর্তকে ছবি আকারে **'ফ্রিজ'** করার যন্ত্র এটি। ক্যামেরার পেছনে ফটোগ্রাফিক ফিল্মে ছবির ছাপ পড়ে আলোকরশ্মি পতিত হয়ে। সামনের **'লেন্স'** দিয়ে দৃশ্য থেকে আলোকরশ্মি প্রতিবিম্ব হয়ে ঢুকে ঐ ফিল্মে পতিত হয়। কতক্ষণ **'শাটার'** [আলোকরশ্মি ভেতরে প্রবেশের সময়নিয়ন্ত্রক] খোলা রাখতে হবে তা নির্ভর করে দৃশ্যের মধ্যে সূর্য বা অন্য কোন সূত্রের অংশুজালের মাত্রার উপর। আকাশের তারাদের ছবি ওঠাতে সময় সময় ঘন্টার পর ঘন্টাব্যাপী শাটার খুলে রাখতে হয়। অপরদিকে সূর্যের তীব্র আলোকরশ্মি দ্বারা উদ্ভাসিত যে কোন সিনারির ফটো ওঠাতে অতি ক্ষুদ্র একটি ক্ষণ মাত্র শাটার খোলা রাখতে হবে- অন্যথায় ফিল্ম জ্বলে যাবে। এ পর্যন্ত ছবি ওঠানোর প্রযুক্তি যেটুকু বুঝিয়ে বলেছি, তাহলো **'ট্রেডিশনাল'** ছবি উত্তোলন কৌশলের অন্তর্গত। আজকাল এরূপ ক্যামেরার ব্যবহার তেমন নেই। এ যুগের ক্যামেরা মূলত **'ডিজিটেল'** টেকনোলজির উপর নির্ভরশীল। তা-ই এ নাম: ডিজিটেল ক্যামেরা।



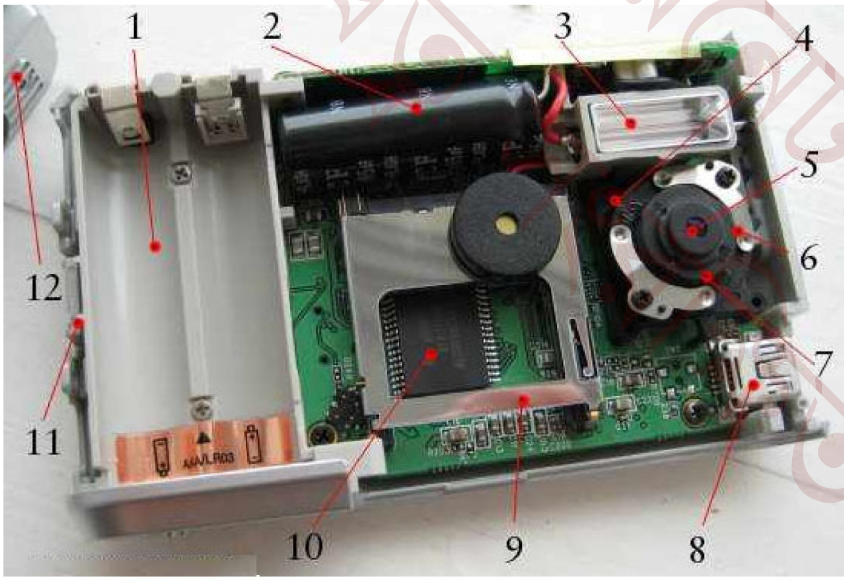
আমরা কোনো এক লেকচারে বলেছি, ডিজিট [digit] শব্দের অর্থ সংখ্যা। উপরে বর্ণিত সাধারণ আলোক-ক্যামেরা দ্বারা ফটোগ্রাফিক ফিল্মে যে ছবি সংরক্ষিত হয় তা মূলত আলোকরশ্মির রঙের মধ্যে ঔজ্জ্বল্যতা ও আঁধারের ছাপ। কিন্তু ডিজিটেল সংরক্ষণ হলো এই একই জিনিস সংখ্যা হিসাবে ধরে রাখা ইলেকট্রনিক উপায়ে। ঠিক সাধারণ লাইট-ক্যামেরার মতো ডিজিটেল ক্যামেরার মাধ্যমে ছবি ওঠানোর সময় সামনের লেন্সের দ্বারা দৃশ্যের আলো ভেতরে ঢুকাতে হবে। এ পর্যন্ত প্রযুক্তি সাধারণ ফিল্ম-ক্যামেরা থেকে ভিন্ন কিছু নয়। আপনি বোতামে টিপ দিলেন, দৃশ্যের ছবি থেকে আগত আলোকরশ্মি ক্যামেরার অভ্যন্তরে চলে গেল। কিন্তু এই আলোক-দৃশ্য এবার কিভাবে সংরক্ষণ হবে, সেখানে কিন্তু বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। আর এটাই হলো ডিজিটেল প্রযুক্তির কাজ। একখণ্ড ইলেকট্রনিক যন্ত্র আছে যার কাজ হলো এই আলোকরশ্মিকে **'ইলেকট্রিকেল সিগনালে'** [electrical signal] পরিবর্তন করা। এ যন্ত্রটির নাম **'চার্জ-কাপল্ড ডিভাইস'** [charge-coupled device -CCD]। নীচে একটি আধুনিক 'CCD' চীপ দেখানো হলো।



টিভি'র স্ক্রীন কিংবা ল্যাপটপ কম্পিউটারের ডিসপ্লে স্ত্রীনে কিভাবে আমরা ছবি, লেখা ইত্যাদি দেখি? খুব মেগনিফাই বা বড় করে ছবি বা লেখার দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাবো এগুলো মূলত বিভিন্ন ঔজ্জ্বল্যতায় সৃষ্ট অতি ক্ষুদ্রকায় সমচতুর্ভুজ মাত্র- যার নাম **'পিক্সেল'** [pixel]। এরূপ হাজার হাজার পিক্সেল মিলে ছবি তৈরী করে। খুব দ্রুত এসব পিক্সেল **'অন-অফ'** হতে থাকে- যা আমাদের চোখে ধরা পড়ে না- দ্রুততার কারণে। সিসিডি চীপ ক্যামেরায় প্রবেশ-হওয়া অংশুজালকে [**বা ছবিকে**] কয়েক মিলিয়ন

পিক্সেলে ভেঙ্গে ফেলে। প্রতিটি পিক্সেলের বিভিন্ন রঙ ও ঔজ্জ্বল্যতাকে একেকটি সংখ্যা [**০ ও ১** এর সমন্বয়ে সৃষ্ট বাইনারি (দু'টি বেইজের)] হিসাবে সংরক্ষণ করে রাখে। এই ক্রিয়ার নামই সিগনালকে **'ডিজিটাইজ'** [**সংখ্যায় পরিবর্তন**] করা। এর কারণ কি? কারণ অনেক। এভাবে বাইনারি সংখ্যায় পরিবর্তন হওয়ার ফলে সংরক্ষিত তথ্য অতি সহজে আধুনিক সকল ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ায় প্রেরণ ও প্রদর্শন অনেকটা সহজ, পরিষ্কার ও অপরিবর্তিত অবস্থায় সম্ভব হয়। মূল সিগনাল বা তথ্য ছিলো **'এ্যানালগ'**। সিসিডি তা পরিবর্তন করে **'ডিজিটেল'** বানালো।

সিসিডি কর্তৃক সংরক্ষিত ডিজিটেল **'ছবি'** আপনি কম্পিউটারে নিয়ে আসতে পারেন। কম্পিউটার এই তথ্যকে প্রদর্শন করবে ছবি হিসাবে। এরপর আপনি লেইজার বা অন্য কোনো প্রিন্টার দ্বারা তা কাগজে প্রিন্ট করতে সক্ষম হবেন। আপনি এই ছবিকে যতোদিন প্রয়োজন কম্পিউটারের মেমোরীতে সংরক্ষণ করে রাখতে পারেন। ডিজিটেল ক্যামেরার মাধ্যমে অবশ্য শুধুমাত্র স্থির ছবি নয়, চলচিত্র বা ভিডিও ফিল্মও করতে পারেন। ডিজিটেল টেকনোলজি আজকের ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রাদির **'ভাষা'**। এই ভাষায় প্রায় সব যন্ত্রাদি, যেমন: মোবাইল সেট, কম্পিউটার, রেডিও ও টিভি ইত্যাদি তথ্য আদান-প্রদান করে। আপনার সংরক্ষিত ছবি বা ভিডিও কম্পিউটারের বিভিন্ন ছবি-সংস্কার সফ্টওয়ার দ্বারা অতি সহজে উন্নততর করতে পারেন। যেমন: ফটোশপ নামক প্রোগ্রাম দ্বারা ছবির ঔজ্জ্বল্য বাড়াতে ইচ্ছা করলেন। কমান্ড প্রেরণ করার পর সফ্টওয়ার সংরক্ষিত ডিজিট বা সংখ্যার মধ্যে রদবদল করবে মাত্র। অনুরূপ ছবি ঘুরানো, আয়তন বৃদ্ধি ইত্যাদি অনেক ধরনের সংস্কার কাজে সফ্টওয়ার সংশ্লিষ্ট সংখ্যার উপর রদবদল ঘটাবে- এতেই আপনার কাঙ্ক্ষিত ফলাফল আসবে। সুতরাং বুঝাই যাচ্ছে, ডিজিটেল তথ্য নিয়ে সংস্কার কাজ, সংরক্ষণ, প্রেরণ, প্রিন্ট, প্রাপ্তি ইত্যাদি সবই সহজভাবে সম্ভব। নীচের চিত্রে একটি ডিজিটেল ক্যামেরার অভ্যন্তর দেখাচ্ছে।



১. ব্যাটারির স্থান, ২. ফ্লাস-কেপাসিটর, ৩. ফ্লাসের বাতি, ৪. আলো-নির্গতকারী-ডায়োড [LED], ৫. লেন্স, ৬. ফোকাসযন্ত্র, ৭. সিসিডি [CCD], ৮. ইউএসবি [USB] পোর্ট, ৯. নিরাপদ ডিজিটেল কার্ড ঢুকানোর স্লট, ১০. প্রসেসর চীপ, ১১. কব্জি সংযুক্তিকারক এবং ১২. উপরস্থ কেইস।

৮. টেলিভিশন

টিভি- আমরা পছন্দ করি বা না- সহজে চলে যাবে না ড্রইং কক্ষ থেকে। অতীতে টিভি কাজ করতো কেথড-রে-টিউবের [cathode-ray tube] মাধ্যমে। অবশ্য এখনো, বিশেষ করে আমাদের দেশে এসব পুরাতন স্টাইলের টিভি সেট ব্যবহৃত হচ্ছে। এসব টিভি **'এ্যানালগ'** সিগনালের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু অত্যাধুনিক টিভির সিগনাল মূলত **'ডিজিটেল'** প্রযুক্তিনির্ভর। আশারাখি শিক্ষার্থীরা ডিজিটেল সিগনাল বলতে কী বুঝায় তা এখন পুরোদমে বুঝে নিয়েছেন। আমরা এ লেকচারের শুরুতেও এ সম্পর্কে বলেছি। **'কেথড-রে টিউব টিভি'**র চলচিত্র বনে শূন্যস্থান-

টিউবের [vacuum tube] মাধ্যমে। এ সম্পর্কে অতিরিক্ত কিছু বলার দরকার নেই- কারণ, আজ থেকে দু'চার বৎসর পর এ ধরনের টিভি মিউজিয়াম-পিস হিসাবেই থাকবে মাত্র। ডিজিটেল টিভি কিভাবে কাজ করে তা কিন্তু বুঝার ব্যাপার আছে। এখন তা-ই বুঝানোর চেষ্টা চালাবো। তাওফিকদাতা আল্লাহ তা'আলা।

আমাদের চক্ষু ও ব্রেন: টিভি স্ক্রীনে যেসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দু তৈরী হয় তাকে বলে পিক্সেল। এগুলো আলোকরশ্মি দ্বারা সৃষ্ট। ইলেকট্রমেগনেটিক সিগনালের মাধ্যমে টিভি প্রেরকযন্ত্র থেকে আগত ডিজিটেল সিগনাল অনবরত টিভির পর্দায় পিক্সেল হিসাবে জ্বলতে-নিভতে থাকে। আমরা দর্শকের চোখে এসব পিক্সেলের আলোকরশ্মি পতিত হয়ে ব্রেনে চলে যায়। সেখানে এসব পিক্সেল থেকে সৃষ্টি হয় পরিচয়মূলক **'ছবি'**। ফলে আমরা দেখি। প্রতি সেকেন্ডে টিভি সেট এসব ছবি শত শতবার রেফ্রেশ বা পুনঃসৃষ্টি করতে থাকে। এই রদবদল আমাদের চোখে ধরা পড়ে না- বেশী দ্রুত হওয়ায়। ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, চিত্রের মধ্যে গতিশীলতা পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ চলচিত্র প্রদর্শিত হয়। কিন্তু আসলে প্রতিটি পিক্সেল একেকটি **'স্থির'** চিত্র। দ্রুত রদবদল হওয়ায় এগুলো ভিডিও সিগনাল হিসাবে দৃশ্যমান হয়। ভিডিও সিগনালকে আস্তে আস্তে চলন্ত করলে এই সত্যটি ধরা পড়ে। ফ্রেম-বাই-ফ্রেম এই রদবদল দেখতে পাওয়া যায়।

ক্যামেরা থেকে টিভির স্ক্রীনে: অধিকাংশ টিভি ক্যামেরা ৩টি মৌলিক জিনিসের উপর নির্ভরশীল। এগুলো হলো: ১. দৃশ্য গ্রেফতারের জন্য একটি অপটিকেল সিস্টেম [optical system], ২. ইলেকট্রনিক সিগনালে দৃশ্য রূপান্তরের জন্য একটি পিকাপ যন্ত্র [pickup device] এবং ৩. একটি এনকোডার যন্ত্র [encoding device] যাতে, এই সিগনালকে সম্প্রচার করা যায়। আমরা এখনই খুব সংক্ষিপ্তভাবে এ তিনটি পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করবো।



১. অপটিকেল সিস্টেম [optical system]: অপটিকেল শব্দ আলোকবিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পৃক্ত। যে কোনো দৃশ্য থেকে আলোকরশ্মি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। টিভি ক্যামেরার উদ্দেশ্য হলো এই রশ্মিকে অনবরত গ্রেফতার করে প্রযুক্তির মাধ্যমে ঘরে ঘরে টিভির পর্দায় পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত করা। অপটিকেল সিস্টেমে আছে লেন্স, প্রিজম ও আয়না। সামনের দৃশ্যকে ফোকাসে আনতে এসব বস্তু ব্যবহৃত হয়। আলোকরশ্মিকে এই সিস্টেম তিনটি মৌলিক রঙ তথা লাল, নীল ও সবুজ আলোতে আলাদা করে। উল্লেখ্য এই তিন রঙের আলো প্রয়োজনমাফিক মিশ্রণ করে যে কোন রঙের ছবি তৈরী সম্ভব।

২. পিকাপ যন্ত্র [pickup device]: এটির কাজ হলো দৃশ্যকে ইলেকট্রিক সিগনালে রূপান্তর। কারণ, সিগনালে রূপান্তর ছাড়া দৃশ্যকে আলোকের গতিতে প্রেরণ আদৌ সম্ভব নয়। ইতোমধ্যে আলোচিত সিসিডি [**চার্জড-কাপল্ড ডিভাইস**] যন্ত্র দ্বারা দৃশ্যকে সিগনালে রূপান্তর করা হয় সাংখ্যিকভাবে। অর্থাৎ ক্যামেরার সামনের দৃশ্য থেকে প্রাপ্ত আলো এই যন্ত্রে এতে পতিত হয়। এরপর এটা একে ডিজিটেল সিগনালে পরিবর্তন করে।

৩. এনকোডার যন্ত্র [encoding device]: পিকাপ যন্ত্রের মাধ্যমে প্রাপ্ত সিগনালকে কোডিং করতে হবে। এর অর্থ হলো টিভির রিসিভার যন্ত্রের জন্য প্রস্তুত করা। ফলে প্রাপ্ত ইলেকট্রনিক তথ্য পুনরায় ছবিতে পরিবর্তন সম্ভব হয়।



দেওয়ালে ঝুলন্ত 'চেপ্টা-স্ক্রীন সিনেমা-টিভি'

সিগনাল সম্প্রচার: ক্যামেরায় ধারণকৃত টিভি সিগনালকে সম্প্রচার [transmit] করতে হবে। এ কাজটি আঞ্জাম দেয় প্রেরকযন্ত্র [transmitter]। ইলেকট্রনিক টিভি সিগনালকে এটি তৈরী করে চলন্ত [carrier wave] তরঙ্গে। টিভি সিগনালে থাকে দু'টি অংশ: **চলচিত্র ও শব্দ**। প্রেরকযন্ত্র এ দু'টি সিগনালকে যথাক্রমে আমপ্লিটিউড মডুলেশন [amplitude modulation] ও ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেশন [frequency modulation] দ্বারা প্রস্তুত করে। এ উভয় কাজ কিভাবে হয় তা বুঝিয়ে বলা আদৌ সম্ভব নয় এ লেকচারে। সংক্ষেপে এর অর্থ হলো সিগনালকে উন্নততর করা। সিগনাল চলন্ত করার জন্য এটা জরুরী। উন্নততর করার পর উভয় সিগনাল একত্রিত করে তৈরী হয় একটি ক্যারিয়ার ওয়েভ। এতে থাকে ভিডিও ও অডিও সিগনাল।

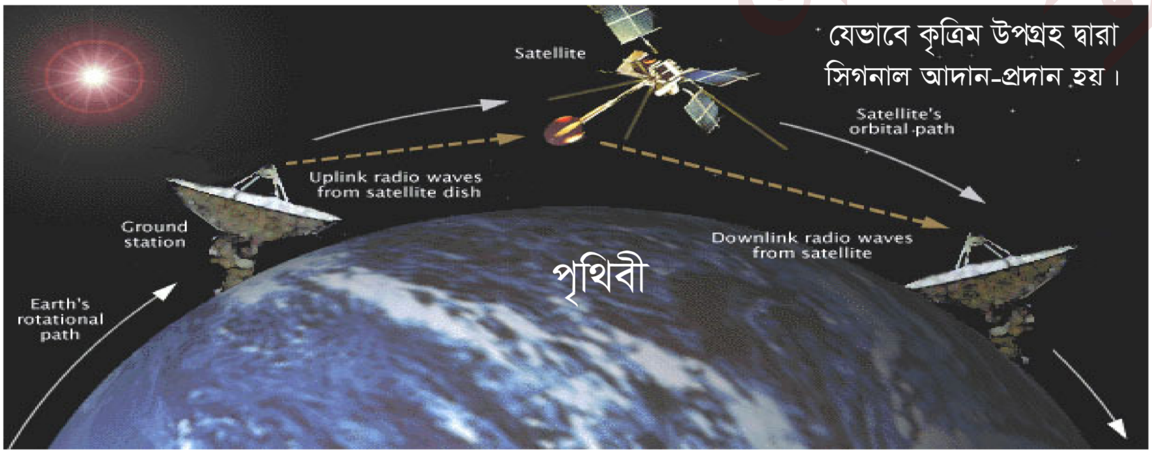
এবার অডিও-ভিডিও সিগনাল প্রেরণের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছে। টিভির ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে এবার এই সংস্কারকৃত সিগনাল প্রেরণ করা হবে ইলেকট্রমেগনেটিক রেডিয়েশনের মাধ্যমে। এই সিগনাল আলোকের গতিতে চলে। তিনটি পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় সিগনাল সম্প্রচারে: **১. ক্যাব্ল, ২. মাইক্রওয়েভ রিলে স্টেশন ও ৩. যোগাযোগ কৃত্রিম উপগ্রহ।** এ তিনটির উপর আরো কিছু ব্যাখ্যা এবার তুলে ধরছি।

১. ক্যাব্ল ট্রান্সমিশন: এ কাজে ব্যবহৃত হয় ফাইবার-অপটিক ক্যাব্ল। কাচের তৈরী শত শত টিউবের ভেতর দিয়ে চলে আসে ডিজিটেল টিভি সিগনাল সরাসরি সেটের মধ্যে। উর্ধ্বে ৫০০ পর্যন্ত চ্যানেল একই ক্যাবলের মাধ্যমে প্রেরণ সম্ভব। আজকাল ক্যাব্ল টিভি সর্বত্র মাকড়সার জালের মতো বিস্তার লাভ করছে।

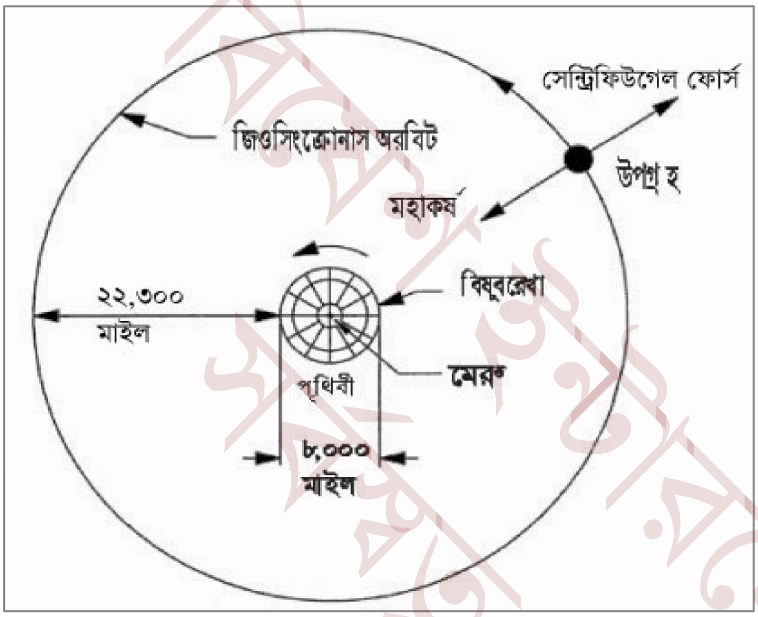
২. মাইক্রওয়েভ রিলে ট্রান্সমিশন: এগুলো এখনো বাংলাদেশে চালু আছে। আমাদের সিলেটে সুউচ্চ এরূপ একটি টিভি টাওয়ার আছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অনুরূপ টাওয়ার বিদ্যমান। এগুলো সকলে মিলে টিভি সিগনাল আমাদের ঘরের সেটে প্রেরণ করে থাকে। টিভি স্টেশন [তা যেখানেই আছে] থেকে প্রেরিত সিগনাল চলে আসে নিকটস্থ টাওয়ারে। মাইক্রওয়েভ [ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সিগনাল] ব্যবহারের মাধ্যমে সিগনালটি চলে যায় পরবর্তী টাওয়ারে, সেখান থেকে পরবর্তীটিতে। এভাবে টাওয়ার থেকে টাওয়ার হয়ে সমগ্র দেশব্যাপী টিভি সিগনাল সম্প্রচার হয়। এ সিস্টেমকে **'টেরেস্ট্রিয়েল টিভি'** [terrestrial TV] বলে। অপরদিকে ইতোমধ্যে বর্ণিত ক্যাব্ল টিভির অপর নাম **'সাবটিরানিয়ান টিভি'** [subterranean TV], অর্থাৎ মাটির নীচের টিভি।

৩. স্যাটেলাইট ট্রান্সমিশন: সঙ্গত কারণে এই টিভি সিস্টেমের নামকরণ হয়েছে, স্যাটেলাইট টিভি। মহাকাশে স্থাপিত যোগাযোগ কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে সিগনাল প্রেরণ এখন প্রায় সবদেশে বিস্তারলাভ করেছে। গ্রাউন্ড স্টেশন থেকে টিভি সিগনাল স্যাটেলাইটে পোঁছে। প্রয়োজনীয় সংস্কার, আমপ্লিফিকেশন শেষে সিগনাল পুনরায় পৃথিবীপানে পাঠানো হয়। টিভি'র এ্যারিয়েল বা আন্টেনা তা ধরে চলচিত্র হিসাবে সেটের পর্দায় প্রদর্শন করে।

মহাকাশে ৩৫,৮০০ কিমি [২২,৩০০ মাইল] উর্ধ্বে পৃথিবীর বিষুবরেখা [equator] বরাবর প্রদক্ষিণরত একাধিক কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপিত হয়েছে। এসব উপগ্রহ যে প্রদক্ষিণপথ অনুসরণ করে তার নাম **'জিওসিংক্রোনাস অরবিট'** [geosynchronous orbit]। বৃত্তাকার এই প্রদক্ষিণপথের বৈশিষ্ট্য হলো, পৃথিবীর দৈনিক গতির সমপরিমাণ গতিতে এবং একই দিকে কৃত্রিম উপগ্রহ চলন্ত থাকে। ফলে পৃথিবীর যে কোন বিশেষ অংশের উপর স্টেশনারী বা স্থায়ী থেকে ভূ-কেন্দ্র হতে প্রেরিত যে কোনো ধরনের ইলেকট্রমেগনেটিক সিগনাল আদান-প্রদান সহজ হয়ে ওঠে। নীচের চিত্রটি দেখুন।



জিওসিংক্রোনাস অরবিটে স্থাপিত কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে টেলিভিশন, টেলিফ্যাক্স, রেডিও, টেলিফোন ইত্যাদি সব ধরনের এ্যানালগ ও ডিজিটেল তথ্য আদান প্রদান সম্ভব হচ্ছে। পৃথিবীর একপ্রান্তে বসে অপরপ্রান্তে অনুষ্ঠিতব্য আপনার ফেভারিট অনুষ্ঠান, ক্রিকেট-ফুটবল-টেনিস ম্যাচ্, সংবাদ ইত্যাদি সরাসরি উপভোগ করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে এসব কৃত্রিম উপগ্রহ। নীচের চিত্রে জিওসিংক্রোনাস অরবিট তুলে ধরেছি। আমরা কৃত্রিম উপগ্রহের উপর একটি বিশেষ লেকচার উপস্থাপনের আশা রাখি।



০৯. এটম বোমা

টিভি সম্পর্কে অল্প বলতে যেয়ে অনেক বললাম। এ লেকচারে পারমাণবিক বোমা বা এটম বোমা কাভার করতে পারবো কি না ভাবছিলাম। অবশেষে কিছুটা অতিরিক্ত ধৈর্য ধারণ করে বর্ণনা তুলে ধরার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। শিক্ষার্থী শ্রোতা বন্ধুরাও আশারাখি একটু বেশী ধৈর্য ধারণ করে মনোযোগসহ শ্রবণ করে নেবেন।

বস্তুর ক্ষুদ্র অংশ অণুর ভেতর কী পরিমাণ এনার্জি [বল] লুকানো আছে তা আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি। পদার্থবিজ্ঞানের উপর লেকচারের সময় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। ১৯০৫ সালে বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন প্রকাশ করেন তার থিওরী অব রিলেটিভিটি। এই থিওরীর অনুসরণেই পরবর্তীতে বিজ্ঞানীরা আনবিক বোমা উদ্ভাবন করেছিলেন। ইউরেনিয়াম ও প্লুটোনিয়াম পদার্থ ব্যবহৃত হয় আনবিক বোমায়। উভয় পদার্থ তেজস্ক্রিয়সম্পন্ন। আনবিক বোমা বিস্ফোরিত হয় যখন রেডিওএক্টিভ এটমের কেন্দ্র থেকে এনার্জি বেরিয়ে আসে। এনার্জি বেরিয়ে আসার দু'টি প্রক্রিয়া আছে: ১. নিউক্লিয়ার ফিশন প্রতিক্রিয়া ও ২. নিউক্লিয়ার ফিউশন প্রতিক্রিয়া। প্রথমটির বৈশিষ্ট্য হলো, কেনো মুক্ত নিউট্রন কণা এটমের কেন্দ্রে আঘাত হানলে তা ভেঙ্গে পড়ে। এতে নির্গত হয় বিরাট মাত্রার এনার্জি। দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়া হলো, হাইড্রোজেনের এটম প্রচণ্ড চাপ ও তাপে '**একত্রিত**' [fuse] হওয়া। এতে সৃষ্টি হয় হিলিয়াম এটম। কিন্তু এই প্রক্রিয়ার সময় বেরিয়ে আসে বিরাট মাত্রার এনার্জি। এরূপ প্রতিক্রিয়াই প্রতিনিয়ত সংঘটিত হচ্ছে আমাদের সূর্যের কেন্দ্রে। ফিউশন প্রতিক্রিয়া পৃথিবীর বুকে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে সংঘটন সম্ভব নয়। তবে ফিশন প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত উপায়ে সংঘটন সম্ভব। এটাই ব্যবহৃত হয় বিদ্যুৎ উৎপাদনে আনবিক চুল্লিতে। এটম বোমার জন্য উভয় প্রতিক্রিয়া ব্যবহৃত হয়।


এটম বোমা

আধুনিক এটমিক প্রক্রিয়া: এ যুগে আনবিক বোমা বলিস্টিক মিসাইলের ভেতর ফিট করে রাখা হয়। এছাড়া এগুলো কোন বিমান থেকে পতনও করা হতে পারে (বায়ের চিত্র দ্রঃ)। বিভিন্ন '**আনবিক শক্তিসম্পন্ন**' দেশে যে পরিমাণ এটম বোমা আছে তা যদি বিস্ফোরিত হয় পৃথিবীর বুকে তাহলে পুরো পৃথিবীটাই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। আনবিক বিস্ফোরণ থেকে তাৎক্ষণিক উচ্চ তাপ ও তেজস্ক্রিয়া চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েই ধ্বংসযজ্ঞের শেষ হবে না। সমস্যাটা হবে দীর্ঘ মেয়াদী।

যেমনটি আমরা দেখছি জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে। সে-ই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় উভয় শহরে আমেরিকা কর্তৃক দু'টি বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল। তাৎক্ষণিক বিরাট ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটনের পর আজো উভয় শহরের মানুষ স্বাভাবিক জীবন-যাপন করতে পারছেন না। তবে আসল কথা হলো, কোনো আনবিক যুদ্ধ বাঁধলে সমগ্র পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ধূলোবালিতে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। ফলে সূর্যের আলো পৃথিবীর জমিনে পৌঁছতে পারবে না। শুরু হবে, বিরাট ফ্রিজিং প্রতিক্রিয়া। একে বিজ্ঞানীরা **'গ্লোবাল গ্লাসিয়েটিং'** [global glaciating] বলে আখ্যায়িত করেছেন। অর্থাৎ পুরো পৃথিবীব্যাপী উত্তর-দক্ষিণমেরু মতো গ্লাসিয়ার বা হিমায়িত বরফ সৃষ্টি হবে। চিরতরে নিশ্চিহ্ন হবে প্রাণীজীবন। আমরা এ থেকে আল্লাহর দরবারে ফানাহ চাই।

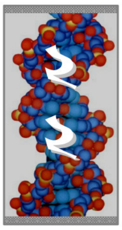
প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা! আজকের জন্য এটুকুই। আশাকরি এই দীর্ঘ বক্তৃতা থেকে সকলে কিছুটা উপকৃত হয়েছেন। আগামীতে আধুনিক প্রযুক্তির উপর আরো কিছু তথ্য তুলে ধরার আশা ব্যক্ত করে শেষ করছি। আল্লাহ হাফিজ।



এটম বোমা বিস্ফোরণ থেকে সৃষ্ট 'মাশরুম'

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম





বক্তা: ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী, নেশন্যাল ডিপ্লোমা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ইংল্যান্ড।

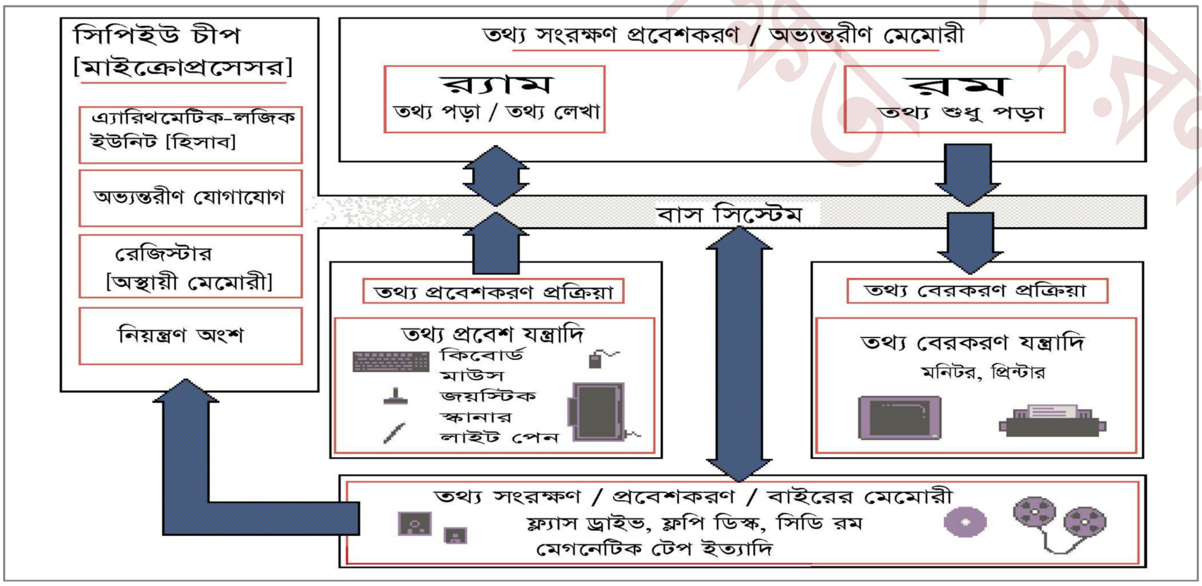
স্থান: খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সুবিদ বাজার, সিলেট।

ঘ. বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক বিজ্ঞান

বক্তৃতা ২২ : আধুনিক প্রযুক্তি

১০. ব্যক্তিগত কম্পিউটার [পিসি]

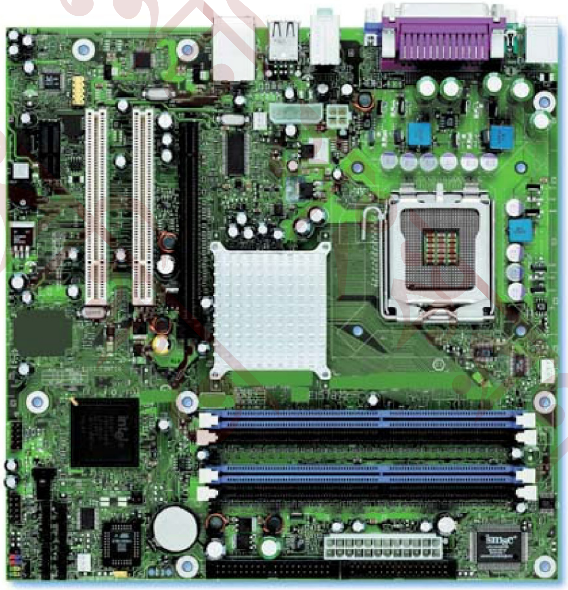
প্রিয় ছাত্রবন্ধুরা! সবাইকে জানাচ্ছি সাদর সম্ভাষণ। আজকের লেকচার কম্পিউটারের উপর। সম্ভবত আরো এক দু'টো বক্তৃতাও সংযুক্ত হবে আধুনিক যুগের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এই যন্ত্রটিকে বুঝিয়ে দিতে। আর বুঝিয়ে



দেওয়াই উদ্দেশ্য। কম্পিউটার বিজ্ঞানের উপর বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই এখানে। এরপরও যেটুকু সম্ভব ব্যাখ্যা তুলে ধরবো। আমি আশা করছি আপনাদের মতো ক্ষুদে বিজ্ঞানীরা এ থেকে কম্পিউটারের উপর **'এক্সপার্ট'** না হলেও অন্তত **'নবিস'** থাকবেন না- অনেকটাই বুঝ এসে যাবে, প্রযুক্তির এই সর্বাপেক্ষা অত্যাশ্চর্য উদ্ভাবন সম্পর্কে। আগের পৃষ্ঠায় কম্পিউটার সিস্টেমের একটি **'স্কিমেটিক ডায়াগ্রাম'** [schematic diagram] তুলে ধরেছি।

ব্যবহার: কম্পিউটার আজকের যুগে কতো ব্যাপক আকারে ব্যবহৃত হচ্ছে বিভিন্নভাবে তার তালিকা খুব দীর্ঘ। এখানে ক'টি মাত্র উল্লেখ করছি: ব্যবসা-বাণিজ্যে হিসাব-নিকাশ, বিলিং, বার কোড সৃষ্টি, কাস্টমার ক্রেডিট কন্ট্রোল, ইলেকট্রনিক উপায়ে ফান্ড আদান-প্রদান, ইন্টারনেট ব্যাংকিং ইত্যাদি শত শত কাজ; ঘরে ঘরে অধিকাংশ ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির সার্কেট, নিয়ন্ত্রণ, চালনা, এয়ারকন্ডিশনারের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ, বাড়ির নিরাপত্তা সিস্টেম, সময় নির্ণয়, টিভি, অডিও, ভিডিও, ফ্রিজ ইত্যাদি চালনা ও নিয়ন্ত্রণসহ অনেক কাজ ক্ষুদ্র কম্পিউটার মাইক্রপ্রসেসর দ্বারা চলে; যানবাহনে কম্পিউটার জ্বালানি নিয়ন্ত্রণ, গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণ, সংকেত সিস্টেম ইত্যাদি আরো অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া, ইন্টারনেট, প্রকাশনা, মেশিন কন্ট্রোল, রবটিক্স, বিমান চালনা, কৃত্রিম উপগ্রহ, টিভি সম্প্রচার, মোবাইল ও ল্যান্ড টেলিফোন সিস্টেম, পুরো শিক্ষাব্যবস্থাসহ সর্বত্র কম্পিউটার আর কম্পিউটার। কোন্‌টি রেখে কোন্‌টি বলবো? এককথায় আধুনিক যুগটিই এখন কম্পিউটার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আপনাদের সম্মুখে যে লেকচার নোটবই আছে, তা-ও আমি সম্পূর্ণটাই ল্যাপটপে টাইপ ও ডিজাইন করেছি। সুতরাং শ্রোতাবন্ধুরা বুঝতেই পারছেন, আজকের এই অত্যাধুনিক টেকনোলজি-নির্ভর যুগ-সৃষ্টিতে কম্পিউটার কী বিরাট পরিমাণ অবদান রাখছে। দূর-ভবিষ্যৎ পর্যন্ত উন্নত থেকে উন্নততর চেহারা ও শক্তিতে কম্পিউটার আরো বেশী অবদান রাখবেও। মূলত কম্পিউটার একটি **'অত্যাশ্চর্য বিপ্লবের নাম'**। এ প্রসঙ্গে আমরা কম্পিউটারের ইতিহাস বর্ণনায় যাবো না। প্রসঙ্গক্রমে হয়তো অতীতের কিছুটা তথ্য উল্লেখ করবো মাত্র।

১০.ক. কিভাবে কম্পিউটার কাজ করে



কম্পিউটারের দু'টি আলাদা অংশ আছে: **১. কঠিন যন্ত্রাংশ [hardware]** এবং **২. তরল যন্ত্রাংশ [software]**। হার্ডওয়্যারের অন্তর্ভুক্ত হলো যাবতীয় যন্ত্রাদি। যেমন: মেমোরী [memory - সংরক্ষণ] ইউনিট যা প্রোগ্রাম নির্দেশনা সংরক্ষণ করে রাখে; সেন্ট্রেল প্রসেসিং ইউনিট [central processing unit - CPU] যার কাজ প্রোগ্রাম নির্দেশনা প্রসেস করা; প্রবেশ সিস্টেম [input device] ও বেরকরণ সিস্টেম [output device], প্রথমোক্ত সিস্টেমের মাধ্যমে ব্যবহারকারী কম্পিউটারের ভেতর কিছু তথ্য প্রবেশ করে থাকেন। এ লক্ষ্যার্জনে ব্যবহৃত হয় কিছু যন্ত্রাদি যেমন: কিবোর্ড, মাউস, স্কানার, মাইক্রফোন, ডিজিটেল ক্যামেরা, মোবাইল ফোন ইত্যাদিতে সংরক্ষিত অডিও-ভিডিও তথ্যাদি। দ্বিতীয়োক্ত সিস্টেমের মাধ্যমে ব্যবহারকারী কম্পিউটারের ভেতর থেকে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল বের করে থাকেন। এ লক্ষ্যার্জনেও ব্যবহৃত হয় বিভিন্ন আউটপুট ডিভাইস যেমন: প্রিন্টার, ভিডিও ডিসপ্লে মনিটর, স্পিকার ইত্যাদি। প্রসেস হওয়া তথ্যাদি কম্পিউটারের সংরক্ষণ সিস্টেমে রাখা যায় পরবর্তীতে ব্যবহার কিংবা অন্যত্র বহন করার জন্য। আমরা দেখেছি এ যুগে বহুল-ব্যবহৃত ফ্ল্যাস-ড্রাইভ যন্ত্রটি। একে পেন-ড্রাইভও বলে। ১২৪ গিগাবাইট পর্যন্ত তথ্য ছোট্ট এরূপ একটি ড্রাইভে সংরক্ষণ সম্ভব।

আমার নিকট একটি ফ্ল্যাস-ড্রাইভ আছে যাতে ১৬ গিগাবাইট মেমোরী বিদ্যমান। এতে এক বিরাট লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত যাবতীয় গ্রন্থাদির লেখা সংরক্ষণ করা যাবে। সুতরাং কম্পিউটারের ব্যবহার কতো ব্যাপক তা আর বুঝিয়ে বলার উপেক্ষা রাখে না।

১০.খ. কঠিন যন্ত্রাংশ [hardware]

কম্পিউটারে যাকিছু আমরা দেখি- তা সবই কঠিন যন্ত্রাংশ বা হার্ডওয়্যার। তিনটি অংশে এটা বিভক্তঃ ১. মূল হিসাব-নিকাশ ইউনিট যাকে সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট [central processing unit - CPU] বলে, ২. মূল সংরক্ষণ ইউনিট যাকে বলে র‍্যান্ডম এক্সেস মেমোরী [random access memory - RAM] এবং ৩. অন্যান্য যন্ত্রাদি যেগুলো **'পেরিফেরলস্'** [peripherals] নামে পরিচিত। এবার এগুলো সম্পর্কে আরো জানার প্রয়োজন আছে।

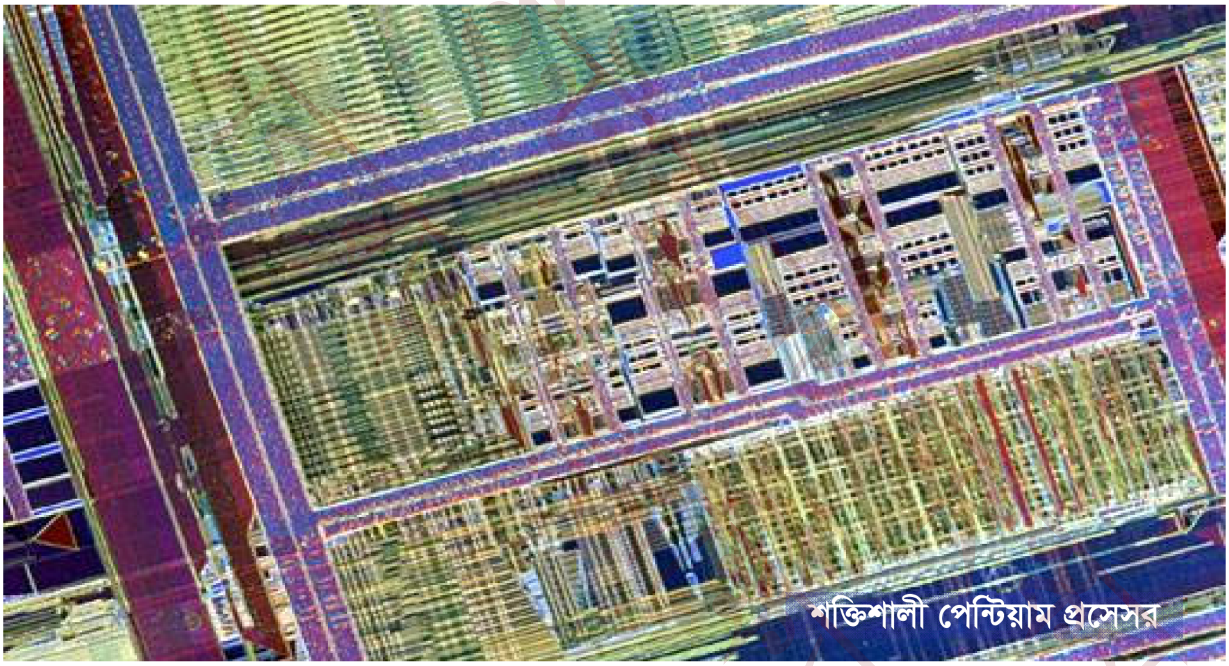


১. সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট [central processing unit - CPU]: কম্পিউটারের ব্রেন এ অংশটি। এটাই যাবতীয় তথ্য প্রসেস করে। সাধারণত একটি মাত্র মাইক্রপ্রসেসর ইউনিট এ কাজটি আঞ্জাম দেয়। সেমি-কন্ডাক্টিং পদার্থ **'সিলিকন'** [silicon - যে পদার্থ দ্বারা বালুকণা সৃষ্ট] এর তৈরী এই ইউনিটে থাকে কোটি কোটি অতি ক্ষুদ্রকায় ইলেকট্রিকেল যন্ত্রাদি। তবে আজকাল কম্পিউটারের সিপিইউ মানে একাধিক মাইক্রচীপ ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক যন্ত্রাদির সমন্বিত ইউনিটকে বুঝায়। সিপিইউ সফ্টওয়্যার নির্দেশনাবলী প্রাপ্ত হয়ে বেশ কিছু কাজে জড়িত হয়। যেমন: নির্দেশকে ইলেকট্রনিক্সভাবে বুঝা, সে হিসাবে প্রয়োজনীয় হিসাব-নিকাশ করা, লজিকেল বা যৌক্তিক সিদ্ধান্তগ্রহণ [অর্থাৎ সত্য-মিথ্যা নির্ণয় যা মূলত বূলিয়ান বীজগণিত নামক কম্পিউটার অঙ্কের উপর নির্ভরশীল], সাময়িকভাবে কম্পিউটারের অপর কোন অংশের জন্য তথ্য সংরক্ষণ করা, প্রোগ্রামের বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ সচেতন থাকা, সমগ্র কম্পিউটারের অন্যান্য যন্ত্রাদির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা ইত্যাদি। সিপিইউ মূলত একটি কালক্যুলেটার। তবে এটা অনেক বেশী শক্তিশালী। এর মূল কাজ হলো এ্যারিথমেটিকেল ও লজিকেল [arithmetical and logical] অপারেশন পরিচালনা। অপারেশনের মাল-মশলা বা তথ্যাদি আসে কম্পিউটারের মেমোরী কিংবা বিভিন্ন পেরিফেরল যন্ত্র থেকে- যেমন: কিবোর্ড, স্কানার, মাউস, জয়স্টিক ইত্যাদি। সিপিইউ নিয়ন্ত্রিত হয় সফ্টওয়্যার নির্দেশনাবলী দ্বারা, যার নাম কম্পিউটার প্রোগ্রাম। সকল সফ্টওয়্যার সংরক্ষিত থাকে হার্ড ডিস্ক, ফ্ল্যাস ড্রাইভ, সিডি রম ড্রাইভ, ডিভিডি, স্কানার ইত্যাদিতে। মেমোরী যন্ত্র থেকে নির্দেশনা প্রবেশ করে কম্পিউটারের মূল রান্ডম এক্সেস মেমোরীতে। সেখানে প্রতিটি নির্দেশকে একেকটি একক ঠিকানা বা সংরক্ষণ স্থান [address or memory location] নির্ধারিত করে দেওয়া হয়। সিপিইউ এসব লকেশন থেকে প্রয়োজনে যে কোন তথ্য তুলে নিতে পারে তথ্যের এড্রেসকে সনাক্ত করে।

ঠিক কিভাবে সিপিইউ তার ফাংশনগুলো সমাধা করে? এ প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে আমরা কম্পিউটারের প্রোগ্রাম থেকে শুরু করতে পারি। র‍্যাম মেমোরী থেকে তথ্যাদি **'বাস'** [bus] হয়ে পৌঁছে যায় সিপিইউতে। এখানে **'বাস'** অর্থ একাধিক তারের সৃষ্ট রিবোন। কম্পিউটারের বিভিন্ন অংশে তথ্যাদি এই বাসের মাধ্যমে চলাচল করে।

আগত তথ্য প্রথমে ডিকোড করতে হবে। এ কাজটি নির্দেশনা ডিকোডার ইউনিট সেরে দেয়। এবার তথ্য চলে যায় এ্যারিথমেটিক এন্ড লজিক ইউনিটে। এখানে অঙ্ক কষা ও লজিকেল অপারেশন শেষ হয়। প্রসেসকৃত তথ্য এএলইউ এর সাময়িক মেমোরী লকেশন **'রেজিস্টার'**-এ সংরক্ষিত থাকতে পারে। এখান থেকে খুব তাড়াতাড়ি তথ্য সংগ্রহ করা সফ্টওয়্যার নির্দেশনা দ্বারা সম্ভব। এএলইউ যোগ, বিয়োগ, ভাগ, পূরণসহ কন্ডিশনাল পরীক্ষা রেজিস্টার থেকে তথ্য সংগ্রহ করে আঞ্জাম দেয়। এরপর ফলাফল পুনরায় পাঠিয়ে দেয় র‍্যাম বা অন্য কোন সংরক্ষণ যন্ত্রের নিকট। এছাড়া প্রয়োজনে আবারো ব্যবহারের জন্য অন্য কোনো রেজিস্টারে সংরক্ষণও করতে পারে।

আমরা প্রায়ই শুনি, প্রসেসর গতির কথা। যেমন: ২ গিগাহার্টজ, ৩ গিগাহার্টজ সিপিইউ। এর অর্থ কী? মনে রাখা দরকার, কম্পিউটার মূলত কয়েকটি ইলেকট্রিকেল যন্ত্র। সিপিইউ এর সার্কেটে ইলেকট্রিকেল সিগনাল দ্রুত চলতে থাকে। আর এই ইলেকট্রিক সিগনালই হলো সফ্টওয়্যারের নির্দেশনা। প্রতি সেকেন্ডে সিপিইউ এর মধ্য দিয়ে ক'টি সিগনাল চলে যায়- তা-ই নির্ধারণ করে কতো গতিশীল এই যন্ত্রটি। সুতরাং ২ গিগাহার্টজ সিপিইউ মানে ২ বিলিয়ন সিগনাল বা **'ক্লক পাল্‌স'** [clock pulse] এর মধ্য দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে চলে যেথে সক্ষম।



শক্তিশালী পেন্টিয়াম প্রসেসর

২. র‍্যান্ডম এক্সেস মেমোরী [random access memory - RAM] ও রীড অনলি মেমোরী [read only memory - ROM]: দু'টি কাঠামোয় কম্পিউটারের মেমোরী সিস্টেমকে বিভক্ত করা যায়। এর প্রথমটি অভ্যন্তরীণ ও দ্বিতীয়টি বাইরের। অভ্যন্তরীণ মেমোরী সর্বোচ্চ গতিতে ব্যবহারযোগ্য এবং এটাই সিপিইউ কাজে লাগায়। ইলেকট্রনিক চীপে এই মেমোরী সংরক্ষিত থাকে। এই মেমোরীর অপর নাম **'র‍্যান্ডম এক্সেস মেমোরী'** [random access memory - RAM]। অপর আরেক অভ্যন্তরীণ মেমোরী আছে যাকে **'রীড অনলি মেমোরী'** [read only memory - ROM]' বলে। দ্বিতীয় ধরনের এই মেমেরী শুধুমাত্র পড়া যায়- যেমন কম্পেক্ট ডিস্ক মেমোরী [CD ROM]। র‍্যাম মেমোরীকে **'ডাইনামিক রান্ডম এক্সেস মেমোরী'** [dynamic random access memory - DRAM], **'সিংক্রোনাইজ্‌ড ডাইনামিক রান্ডম এক্সেস মেমোরী'** [synchronized dynamic random access memory - SDRAM] এবং **'স্টেটিক রান্ডম এক্সেস মেমোরী'** [static random access

memory - SRAM] ইত্যাদিও বলে। এসব মেমোরী ইউনিট একই কাজ তথা তথ্য সংরক্ষণ বিভিন্ন ভাবে করে থাকে।



রম মেমোরী র‍্যাম থেকে ভিন্ন। সাধারণত এই মেমোরী শুধুমাত্র সংরক্ষণের সুবিধার্থে ব্যবহৃত হয়। কম্পিউটারের অভ্যন্তরে এই মেমোরী অপারেটিং সিস্টেমকে চালু করতে ব্যবহৃত হয়। প্রত্যেক কম্পিউটারে অপারেটিং সিস্টেম চালনার একটি কাঠামো আছে যাকে **'বেসিক ইনপুট-আউটপুট সিস্টেম'** [basic input-output system - BIOS] বলে। এতে সংরক্ষিত নির্দেশনা কখনো মুছে যায় না- এমনকি কম্পিউটার সূইচ্ অফ থাকলেও এটি সংরক্ষিত থাকে। স্থায়ী মেমোরী বস্তুর মধ্যে **'সিডি রম'** [CD ROM- write protected or re-writeable], **'ফ্ল্যাস ড্রাইভ'** [FLASH drive], **'ডিজিটেল ভিডিও ডিস্ক'** [DVD] ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

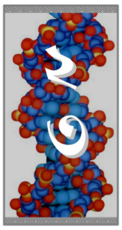
কম্পিউটারের হার্ড ড্রাইভ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এটা মূলত একটি মেগনেটিক মেমোরী ইউনিট। লেইজার আলোকরশ্মি দ্বারা এতে তথ্য চুম্বকীয় উপায়ে সংরক্ষণ করা হয়। কম্পিউটারের ফাইলগুলো এখানেই থাকে। এসব ফাইল বের করা, সংস্কার ও পুনরায় সংরক্ষণ, মুছে ফেলা, নতুন ফাইল বানিয়ে সংরক্ষণ ইত্যাদি এই হার্ড ড্রাইভের মাধ্যমে সম্ভব হয়। সুতরাং হার্ড ড্রাইভের মেমোরী ক্ষমতা যতো বেশী হবে ততো বেশী সুবিধাও ব্যবহারকারীর জন্য। বর্তমানে মেমোরী ইউনিট **'মেগাবাইট্স'** [1 megabytes=1000 kilobytes] হিসাবে মাপা হয়। আগের যুগে মেমোরী মাপা হতো, **'কিলোবাইট্স'** [১০০০ বাইটস্=1 kilobyte] দ্বারা। অদূর ভবিষ্যতে **'গিগাবাইট্স'** [1000 megabytes = 1 gigabytes] হিসাবে মাপা হবে। বাস্তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এখনোই তা হচ্ছে। আগের যুগে মেমোরী ইউনিটের দামও বেশী ছিলো। এখন অনেকটা সস্তা।

৩. প্রান্তিক কঠিন যন্ত্রাদি [peripheral]: একটা সিপিইউ অর্থহীন হবে যদি না এর দ্বারা প্রসেস তথ্যাদি উল্লেখযোগ্য কাজে ব্যবহার করা যায়। সুতরাং সিপিইউকে সত্যিকার অর্থে কল্যাণে ব্যবহারের জন্য কম্পিউটার সিস্টেমে বেশ কিছু প্রান্তিক কঠিন যন্ত্রাদি থাকে। এসব যন্ত্রকে কম্পিউটার বিজ্ঞানে, **'পেরিফেরল'** [peripheral] বা প্রান্তিক যন্ত্রাদি বলে। পেরিফেরল থেকে তথ্যাদি সিপিইউ এর সাথে কোনো না কোনোভাবে যোগাযোগ সৃষ্টি করে থাকে। যেমন: ডিস্ক ড্রাইভ, প্রিন্টার, মডেম, জয়স্টিক, মাউস, কিবোর্ড ইত্যাদি। এ সবই কম্পিউটারের সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত থাকে ইলেকট্রিক তারের মাধ্যমে। শব্দ ও চলচিত্র প্রসেসিং করতে যেয়ে আমরা ব্যবহার করতে পারি মাইক্রফোন ও ডিজিটেল ক্যামেরা। এ দু'টো পেরিফেরল সরাসরি কম্পিউটারের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে কিংবা না-ও থাকতে পারে। অর্থাৎ এগুলো ওয়েরলেস হতে পারে। আমরা এ প্রসঙ্গে যেসব পেরিফেরলের উপর আলোচনা করবো তাহলো: ১. ডিসপ্লে ইউনিট, ২. মাউস, ৩. কিবোর্ড, ৪. হার্ড ডিস্ক, ৫. জয়স্টিক, ৬. প্রিন্টার, ৭. ফ্ল্যাস ড্রাইভ, ৮. সিডি রম, ৯. মডেম, ১০. স্কানার ও ১১. লাইট পেন।

প্রিয় ছাত্রবন্ধুরা! আজকের লেকচারের ইতি টানছি এক্ষুণি। উপরে উল্লেখিত **১১**টি যন্ত্রের উপর পরবর্তী লেকচারে বিস্তারিত আলোচনার আশা রাখি। এর পরের লেকচারে কম্পিউটারের দ্বিতীয় **'লজিকেল'** অংশ তরল যন্ত্রাংশ বা সফ্টওয়্যারের উপর আমরা তথ্যানুসন্ধান চালাবো ইনশাআল্লাহ।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম





বক্তা: ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী, নেশন্যাল ডিপ্লোমা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ইংল্যান্ড।

স্থান: খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সুবিদ বাজার, সিলেট।

ঘ. বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক বিজ্ঞান

বক্তৃতা ২৩ : আধুনিক প্রযুক্তি

১০. ব্যক্তিগত কম্পিউটার [পিসি]

১০.খ. কঠিন যন্ত্রাংশ [hardware] : পেরিফেরলস্

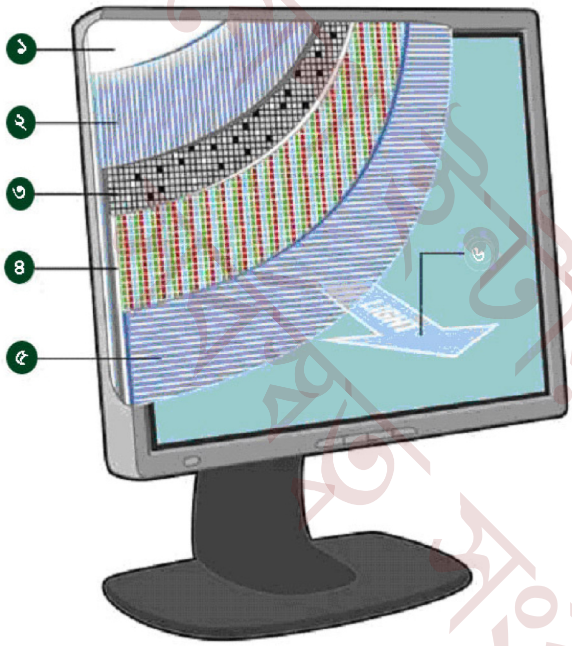
প্রিয় ছাত্র-বন্ধুরা! আধুনিক বিজ্ঞানের উপর এ লেকচারমালার ২৩তম সংযোজনে সবাই ওয়েলকাম! আমরা এ যুগের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তির উপর আলোচনা করছি। গত সংযোজনে শুরু হয়েছে কম্পিউটার নিয়ে বক্তব্য। এ লেকচারও একই বিষয়ের উপর সীমাবদ্ধ থাকবে। সম্ভবত আরো দু'তিনটি লেকচার সংযুক্ত করতে হবে কম্পিউটারের উপর বেসিক জ্ঞানার্জনের লক্ষ্যে। আর এটাই আমাদের উদ্দেশ্য। যাক, গত লেকচারে বলেছি, কম্পিউটারের হার্ডওয়্যারের অংশ হিসাবে ১১টি যন্ত্রের উপর আমরা আলোচনা করতে চাচ্ছি। এসব যন্ত্র মূল কঠিন যন্ত্রাংশ সিপিইউ এর সাথে সংযুক্ত থাকে। কম্পিউটার বিজ্ঞানের ভাষায় সামগ্রিকভাবে এ যন্ত্রগুলোকে **'পেরিফেরলস্'** [peripherals] বলে। এসব মূলত **'ইনপুট/আউটপুট'** [input/output] যন্ত্র। অর্থাৎ তথ্য প্রবেশ/বেরকরণ উপায়-অবলম্বনের যন্ত্রাদি। এবার আমরা একে একে এ যন্ত্রগুলোর উপর বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়ার প্রয়াস পাচ্ছি।

১. ডিসপ্লে ইউনিট [প্রদর্শন যন্ত্র]

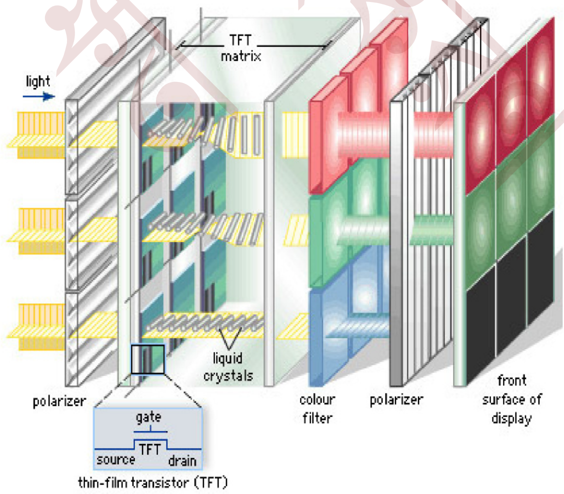
কম্পিউটারের ডিসপ্লে ইউনিট কয়েক ধরনের আছে। আজকাল সে যুগের **'সিআরটি'** [CRT] মনিটরের ব্যবহার দিন দিন মুছে যাচ্ছে। CRT- এ অক্ষরগুলোর অর্থ হলো: cathode-ray-tube। আপনারা দেখেছেন

কিছু কিছু লম্বা মনিটর আছে, সিআরটি ওগুলোই। এ প্রসঙ্গে সিআরটি সম্পর্কে আলোচনায় যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না। তা আদৌ প্রয়োজন বলেও মনে করি না। তবে এ যুগের যেসব মনিটর জনপ্রিয় হয়ে ওঠেছে, সেগুলোর উপর তো জানতেই হয়।

১.ক. ‘টিটিএফ’ [thin film transistor - TFT] এলসিডি [light emitting diode -LED] মনিটর: অফিস-আদালত, ব্যাংক-বীমা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে আকর্ষণীয় এ ডিসপ্লে ইউনিট দেখতে পাওয়া যায়। নিম্নে আমরা একটি টিটিএফ মনিটরের ছবি দিয়েছি। তাতে ৬টি সংখ্যা আছে। মনিটরের ফাংশন বুঝাতে যেয়ে আমরা এসব সংখ্যার দিকে ইঙ্গিত করবো।



মনিটর প্যানেলের পেছনে থাকে **‘ফ্লুরেসেন্ট’** [fluorescent] আলোকসূত্র। এটা এমন ধরনের আলো যা জ্বলে ওঠার পর কিছুক্ষণ স্থায়ী থাকে। চিত্রে সংখ্যা ১ দ্বারা তা সম্বোধন করেছি। আজকাল এই **‘পেছনের আলোকসূত্র’** [backlight source] লাইট প্রদানকারী ডাইওড [LED] থেকেও আসতে পারে কোনো কোনো মডেলে। এই পেছন-প্যানেলে আছে দু’টি কাচের-তৈরী **‘পোলারাইজিং ফিল্টার’** [polarizing filter]। আলোকসূত্রের তরঙ্গ অপরদিকে চলে যেতে পারবে কি না, তা নিয়ন্ত্রণ করে এই ফিল্টার। ছবিতে সংখ্যা ২ এবং ৫ দ্বারা তা দেখানো হয়েছে। ফিল্টারগুলো একে অন্য থেকে কিছুটা দূরে স্থাপিত। মাঝখানে আছে কিছু তরল ক্রিস্টেল মলিকিউল [liquid-crystal molecules]। চিত্রে সংখ্যা ৩ দ্বারা দেখানো হয়েছে এ অংশটি। তরল ক্রিস্টেল স্বভাবতই কিছু বিশেষ ভঙ্গিমায় থাকতে ভালোবাসে যা বিজ্ঞানীদের জানা। ফিল্টারের মধ্যে আছে গর্ত। ক্রিস্টেল এগুলোর সাথে সমান্তরালভাবে থাকে। অতিরিক্ত মলিকিউল নিজেদেরকে ফিল্টারের মধ্যস্থ ক্ষুদ্রকায় স্থান দখল করে নেয়। নিজেদেরকে তারা **‘হিলিক্স’** [helix] আকার ধারণ করে বসে থাকে। হিলিক্সের অর্থ সর্পিল। যখন আলোকরশ্মি পেছন থেকে এসে এসব সর্পিল ক্রিস্টেলে পতিত হয় তখন আলোকের গতি সঠিক দিকে কিছুটা মুচড়ে পড়ে। এর কারণ হলো সামনের পোলারাইজ ফিল্টার ভেদ করা। সুতরাং মনিটরের সামনে বসা আমাদের চোখে এসে এই আলোকরশ্মি পতিত হয়। অপরদিকে আলোকরশ্মি যদি মুচড়ে না যায়, তাহলে সামনের ফিল্টার একে সম্পূর্ণরূপে কিংবা আংশিকভাবে ব্লক করে দেবে। দেখুন ডানের চিত্রটি।



উপরে টিটিএফ-এলসিডি মনিটরের গঠনপ্রণালী সম্পর্কে কিছুটা অবগত হয়েছি আমরা। এ ব্যাপারে আরো একটু বাড়িয়ে বলতে হবে। অন্যথায় হারিয়ে যেতে পারি অজানা এক দেশে! আপনার কম্পিউটারের মূল সার্কেটবোর্ডের নাম **'মাদারবোর্ড'** [motherboard]। নীচের চিত্রটি দেখুন। এখানেই থাকে সকল গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ। মাদারবোর্ডে **'ডিসপ্লে কন্ট্রোলার'** [display controller] নামক একটি ইউনিট আছে। একে বাংলায় প্রদর্শন নিয়ন্ত্রক বলা যায়। ভিডিও এডাপ্টার থেকে এই প্রদর্শন ইউনিটে ইলেকট্রিকেল সিগনাল আসে। ভিডিও এডাপ্টারের কাজ হলো মনিটরে প্রদর্শিত হবে এরূপ ইলেকট্রিক সিগনালকে ধরে প্রদর্শনের জন্য প্রস্তুত করা ও কন্ট্রোলারের নিকট পাঠানো। যেমন আপনি যদি টাইপ করেন, তাহলে প্রতিটি অক্ষর সঠিকভাবে মনিটরে প্রদর্শিত হতে হবে। কিবোর্ড থেকে ভিডিও এডাপ্টার ইলেকট্রিক সিগনাল হিসাবে প্রতিটি কি-স্ট্রোক গ্রহণ করে নেয় এবং পাঠিয়ে দেয় মাদারবোর্ডে স্থাপিত কন্ট্রোলারের নিকট। ডিসপ্লে কন্ট্রোলার দু'টি জিনিস নিয়ন্ত্রণ করে: **১. তরল ক্রিস্টেলে প্রেরিত ইলেকট্রিক সিগনাল** ও **২. পেছনের আলো**। শুরুতে প্রথম কাচের ভেতর দিয়ে পেছনের আলো চলে যেতে সুযোগ সৃষ্টি করে ডিসপ্লে কন্ট্রোলার। একই সময় সে তরল ক্রিস্টেলে পাঠিয়ে দেয় ইলেকট্রিকেল কারেন্ট- যা এসেছে ভিডিও এডাপ্টার থেকে। ফলে বিভিন্ন ধরনের ঔজ্জ্বল্যপূর্ণ আলো চলে যায় শেষের কাচে, যাতে সৃষ্টি হয় কাঙ্ক্ষিত **'ছবি'** স্ক্রীনের উপর। রঙিন মনিটরে প্রতিটি **'পিক্সেল'** [pixel] লাল, নীল ও সবুজ এই তিনটি ক্রিস্টেল কোষের তৈরী। এসব রঙিন পিক্সেলে আলোকরশ্মির তারতম্য থেকে সৃষ্টি করে কোটি কোটি রঙিন ছায়া। আর তা-ই আমাদের চোখে অক্ষর, ছবি ইত্যাদি হিসাবে ধরা দেয়।

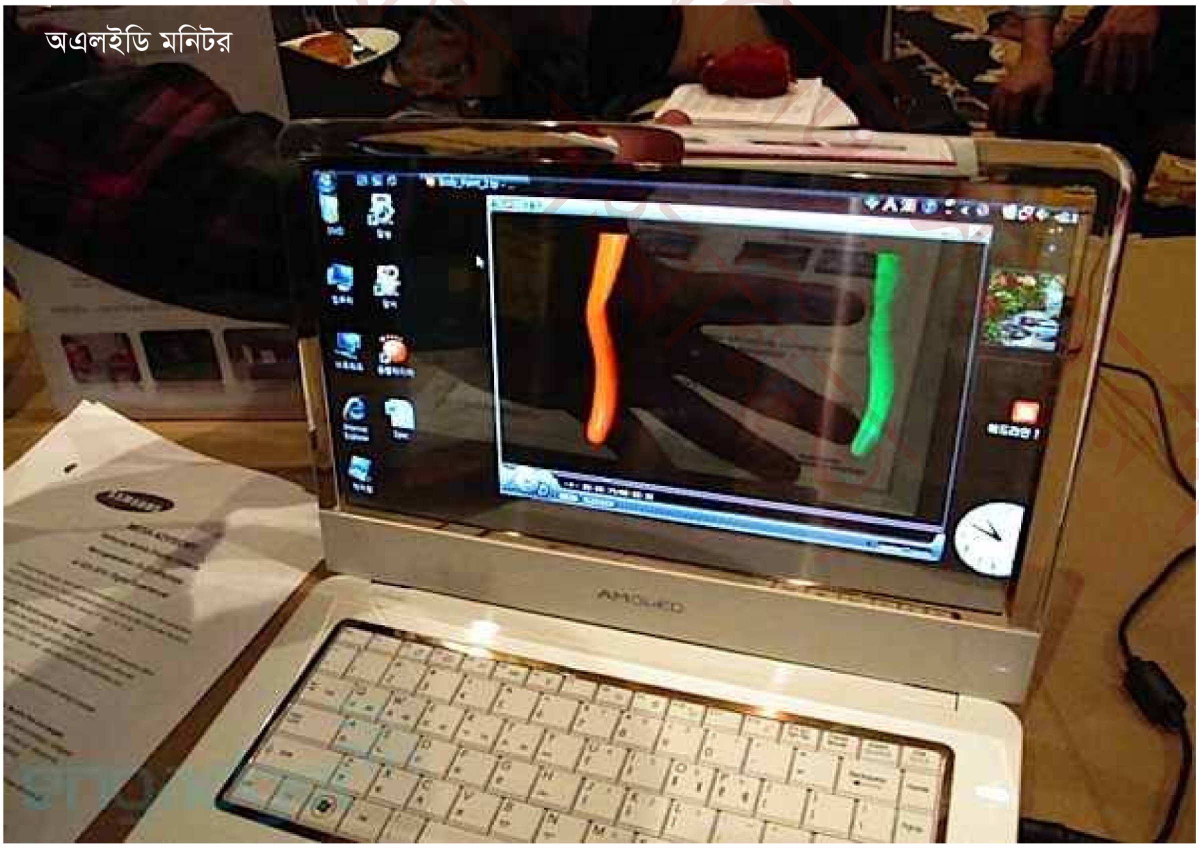


১. খ. আধুনিক মনিটর: কম্পিউটার এবং টিভি'র মনিটর হিসাবে নতুন দু'টি টেকনোলজি দিন দিন জনপ্রিয় হচ্ছে। এর প্রথমটি হলো **'প্লাজমা মনিটর'** [plasma monitor]। দ্বিতীয়টির নাম **'অরগ্যানিক লাইট-এমিটিং ডাইওড মনিটর'** [organic light-emitting diode monitor], একে সংক্ষেপে **'অএলইডি মনিটর'**ও [OLED monitor] বলে। প্লাজমা প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য হলো, ছবি সৃষ্টির পিক্সেল তৈরীতে ব্যবহৃত হয় অতি ক্ষুদ্রকায় রঙিন ফ্লুরেসেন্ট আলো। প্রতিটি পিক্সেলে থাকে তিনটি রঙ: **লাল, সবুজ ও নীল**। প্লাজমা ডিসপ্লেতে আরো ব্যবহৃত হয় **'জিনোন'** [xenon] ও **'নিওন'** [neon] গ্যাস। এসব গ্যাসে মুক্তভাবে ইলেকট্রন ও আয়োন [চার্জ হওয়া কণা] চলন্ত থাকে। যখন ইলেকট্রিকেল

কারেন্ট চলে এই গ্যাসের মধ্য দিয়ে, তখন ঋণাত্মকভাবে চার্জ হওয়া কণাগুলো ধনাত্মকভাবে চার্জ-হওয়া কণার দিকে আকর্ষিত হয়। এর ফলে উভয় কণায় সৃষ্টি হয় ঘর্ষণ। এতে গ্যাসের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসে এনার্জি আলো হিসাবে। যাকে **'ফটোন'** বলে। নিশ্চয় শ্রোতাবন্ধুরা ফটোন কি তা জানেন। আমরা ফিজিক্সের উপর আলোচনাকালে এদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। কম্পিউটারের সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট [CPU] থেকে প্লাজমা মনিটরে সিগনাল আসলেই এরূপ আলোর সৃষ্টি হয় যা সামনের স্ক্রীনে ভেসে আসে ছবি হিসাবে।

অএলইডি মনিটর হলো সর্বাধুনিক প্রযুক্তি। নামের মধ্যেই এই প্রযুক্তির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অরগ্যানিক বা জৈবিক পদার্থ যেমন কার্বন, প্লাস্টিক বা পলিমার ইত্যাদি ব্যবহৃত হয় এই মনিটরে। ইলেকট্রিক কারেন্ট এসব বস্তুতে চলন্ত হলে সৃষ্টি হয় ফটোন বা লাইট। খুব ক্ষুদ্র এলইডি [LED] সরাসরি ব্যবহৃত হয় ছবি সৃষ্টিতে। ফলে মনিটরের জন্য কোনো পেছন আলোকরশ্মির প্রয়োজন হয় না। পেছনের আলো না থাকায় এসব মনিটরের পাওয়ার কনজামশন কম এবং এগুলো বেশ পাতলাও। দ্রুত ছবিসৃষ্টি, চওড়া দৃশ্যসৃষ্টি, উন্নত কন্ট্রাস্ট লেবেল এবং সঠিক ঔজ্জ্বল্য থাকায় অএলইডি ডিসপ্লে ভবিষ্যতের মনিটর হবে নিশ্চয়ই।

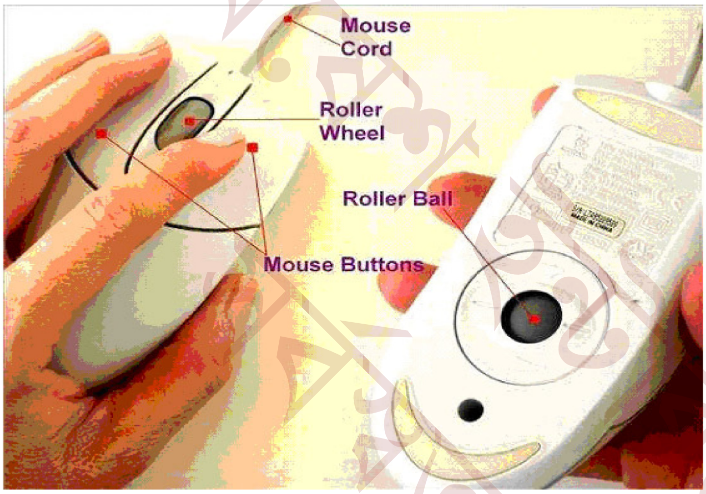

প্লাজমা মনিটর


অএলইডি মনিটর

মনিটর টেকনোলজির উপর আর বেশী কিছু আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। যা হয়েছে, তা থেকেই এই গুরুত্বপূর্ণ কম্পিউটার পেরিফেরল সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা জন্মেছে বলে আমি আশা করি।

২. মাউস

হ্যাঁ, মাউস অর্থ- ইঁদুর! আর এটা ছাড়া কম্পিউটার চলে না! যদিও ল্যাপটপ মাউস ছাড়া চালনা সম্ভব। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে মাউস ছাড়া কিছুটা অস্বস্তিবোধ করি। কম্পিউটারের পেরিফেরল হিসাবে মাউস একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। এবার দেখে নিই এটি ঠিক কিভাবে কাজ করে।



কম্পিউটারে সাধারণত দু'ধরনের মাউস ব্যবহৃত হয়: **১. রোলার বল মেকানিকেল মাউস ও ২. অপটিকেল ডিজিটেল মাউস**। আরো যেসব মাউস ইদানিং মার্কেটে আসছে তাদের মধ্যে লেইজার ও কর্ডলেস মাউস উল্লেখযোগ্য। আমরা প্রথমোক্ত দু'টির উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো।

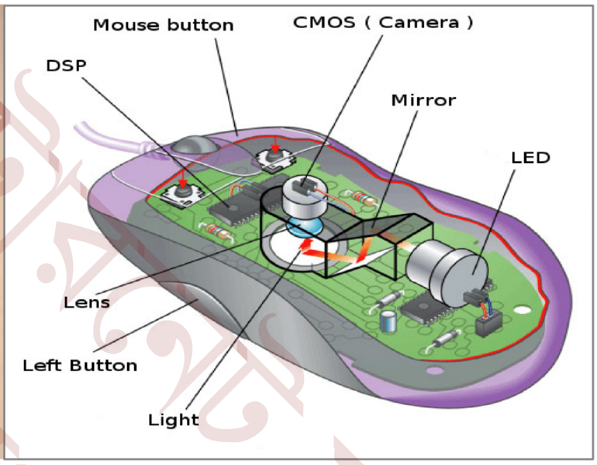
১. রোলার বল মাউস: এসব মাউসের মৌলিক কাজ হলো কয়েকটি গতিশীল অংশের এনার্জিকে ডিজিটেল সিগনালে পরিবর্তন করা। যারা রোলার বল মাউস ব্যবহার করেছেন তারা জানেন এতে আছে চারটি চলন্ত অংশ: নীচে একটি রোলার বল, উপরে ডানে ও বামে একেকটি সুইচ এবং মাঝে একটি রোলার চাকা। মাউসের সামনে থাকে কম্পিউটারের ইউএসবি পোর্টের [USB port] সঙ্গে যুক্ত করার একটি কোর্ড তার [cord wire]। উপরের চিত্রটি দেখুন।

মাউসের ভেতরে কী আছে? রোলার বলকে আরো দু'টি চাকা ঘিরে রেখেছে। এগুলো একটা আরেকটা পারপেন্ডিকুলার [৯০ ডিগ্রী ভিন্ন দিকে] অবস্থায় স্থাপিত। ফলে রোলারটি সামন-পেছন ও ডানে-বামে ঘুরতে পারে। মাউস পয়েন্টারকে [স্ক্রীনের তীরকে] চতুর্দিকে ঘুরানো সহজ করার জন্য এই ব্যবস্থা। বলের গতিকে ইলেকট্রিক সিগনালে পরিবর্তন করতে হবে। এ কাজটি আঞ্জাম দেয় দু'টি **'এনকোডার ডিস্ক'** [encoder disk]। এগুলো চলন্ত চাকা। উভয়টির বাইরের দিকে অসংখ্য ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে। অপরদিকে স্থাপিত ইনফ্রারেড [লাল তরঙ্গের] আলোক নির্গতকারী ডাইওড [IR LED] থেকে সৃষ্ট সিগনাল এসব ছিদ্রে সর্বদা পতিত হয়। ফলে রোলার বলের গতি থেকে সৃষ্টি হয় সিগনালের মধ্যে তারতম্য যা ইলেকট্রিকেল সার্কেট কম্পিউটার কোডে [code] পরিবর্তন করে। এভাবে মাউস পয়েন্টার কোথায় থাকবে তা নির্ণিত হয়। এ কাজটি যতক্ষণ কম্পিউটার চলন্ত থাকবে ততক্ষণই অব্যাহতভাবে চলবে।

সুইচ ও রোলার চাকা থেকে যেসব সিগনাল প্রেরণ করা হয় তা-ই নির্ধারণ করে ইউনডো বা জানালা খোলা না বন্ধ হবে। ফাইল খুলবে না বন্ধ হবে ইত্যাদি। মোটকথা, মাউসের প্রযুক্তি খুব সাধারণ, অথচ বেশ কার্যকরী। এক যুগ ছিলো যখন কম্পিউটার পরিচালনার জন্য অনেকদিন ট্রেনিং নিতে হতো। কারণ, তখনকার দিনে কম্পিউটারকে নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশেষ কমান্ড কিবোর্ড থেকে প্রেরণ করা জরুরী ছিলো। মাউসের উদ্ভাবন হেতু, সত্যিই কম্পিউটার হয়ে ওঠেছে সবার জন্য ব্যবহারযোগ্য একটি মেশিনে। আজকাল ৩ বৎসরের একটি শিশুও কম্পিউটার চালাতে পারে। আমরা এবার অপটিকেল মাউসের উপর কিছুটা আলোচনার প্রয়াস পাচ্ছি।

২. অপটিকেল ডিজিটেল মাউস: একবিংশ শতকের শুরুতে নতুন এই মাউস বাজারে আবির্ভুত হয়। সে-ই থেকে এ ডিভাইসটির জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়তে থাকে। আজকের যুগে প্রায় সবাই অপটিকেল ডিজিটেল মাউস ব্যবহার করে থাকেন। এই মাউস চালাতে কোনো বিশেষ ধরনের প্যাড তথা মাউস প্যাডের প্রয়োজন হয় না। এটি পরিষ্কার, অধিক সঠিক ও দীর্ঘদিন কার্যকরী। এই মাউস টেকনোলজির মূল হচ্ছে ছোট্ট একটি ক্যামেরা। মাউসের নীচের দিকে এটা স্থাপিত। প্রতি সেকেন্ড হাজার হাজার ছবি তুলে এ ক্যামেরা। আপনি যে বস্তুর উপর মাউসটি চালনা করবেন, ঐ ক্যামেরা অনবরত সে বস্তুর ছবি তুলে একটি সেন্সর দ্বারা **'ডিজিটেল সিগনাল প্রসেসর'** [Digital Signal Processor - DSP] নামক চীপে প্রেরণ করে। ডিএসপি'র কাজ হলো আগের মুহূর্তের ছবির সঙ্গে বর্তমানটির পার্থক্য নির্ণয়। এরপর নির্ধারণ করা মাউসটি কোন্‌দিকে কতটুকু পরিমাণ দূরে সরে গেছে। এই তথ্যের উপর নির্ভর করে স্ক্রীনের মাউস পয়েন্টার চলন্ত হয়। ক্লিক, রোলার ইত্যাদি ঠিক উপরে বর্ণিত রোলার বল মাউসের মতোই কাজ করে। নীচের চিত্র দু'টো দেখুন।





৩. কিবোর্ড

কম্পিউটারের কিবোর্ড মূলত মাউসের মতোই কাজ করে। অনেক মাউসের ক্রিয়া কিবোর্ড [shortcut] দ্বারা সম্ভব। পুরো কিবোর্ডব্যাপী অনেক বোতাম আছে। এর প্রতিটি এককেটি বিশেষ কার্য আঞ্জাম দেয় ইলেকট্রনিকেলী। আসলে প্রত্যেকটি বোতামই এককেটি সুইচ। টিপ দিলেই অভ্যন্তরের সার্কেট বোর্ডে সিগনাল প্রেরিত হয়। প্রথমে আমরা কিবোর্ডের বিভিন্ন বোতাম সম্পর্কে আরো কিছু জেনে নেবো। এরপর টেকনিকেল ব্যাপারটি তুলে ধরবো।



ফাংশন কীজ [function keys]: বোর্ডের উপরের সারিতে আছে এসব ফাংশন বোতাম। প্রতিটির মধ্যে ইংরেজী অক্ষর 'F', সেসঙ্গে সংখ্যা লেখা আছে। কোনো কোনো কিবোর্ডে ১ থেকে ১২ পর্যন্ত সংখ্যা দেখতে পাওয়া যায়। সফ্‌টওয়্যার ডিজাইনাররা এসব বোতাম বিভিন্ন কাজে [ফাংশনে] লাগান। আপনি সফ্‌টওয়্যার ব্যবহারকারী এসব ফাংশন ব্যবহার করতে পারেন শুধুমাত্র ওসব বোতামে টিপ দিয়ে।

নাম্বার বোতাম [number keys]: বড় কিবোর্ডের ডানে একটি অংশ আছে। সেখানে থাকে ০ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যা বোতাম কীপ্যাড। এতে আরো আছে *, +, -, / ও 'Enter' বোতাম। এগুলো দ্বারা অঙ্ক কষা হয়। আরেকটি 'Number Lock' নামক কী আছে। এটির দ্বারা কীপ্যাড সক্রিয় বা অকেজো করা হয়।

তীর বোতাম [Arrow Keys]: ডান সাইডে এসব কী বিদ্যমান। উপর, নীচ, ডান ও বামে কারসর [cursor] চালনার জন্য এসব কী ব্যবহৃত হয়। এদের অপর নাম **'ন্যাভিগেশন কী'** [Navigation kyes]। এদের আরেক নাম **'ডাইরেকশন কী'** [direction keys]।

টাইপরাইটার বোতাম [typewriter keys]: মধ্যখানে স্থাপিত এ টু জেড অক্ষরসহ **'স্পেইস বার'** [space bar] ও সংখ্যা আছে এই অংশে। আপনি এই অংশেই বেশীরভাগ ক্ষেত্রে অঙ্গুলি চালনা করে থাকেন।

বিশেষ বোতাম [special keys]: এসব বোতামের মধ্যে আছে 'Esc', 'Tab', 'Caps Lock', 'Shift', 'Return', 'Backspace', 'Control', 'Alt', 'End', 'Page On', 'Page Up', 'Home', 'Delete', 'Insert', 'Print Scrn', 'Num Lk / Scroll Lk' ইত্যাদি।

উপরোক্ত প্রতিটি বোতামের একেকটি ফাংশন বা কাজ আছে। তবে অধিকাংশ বোতাম আপনি ব্যবহার করবেন না। কিছু আছে ইন্টারনেটের জন্য, আর এক দু'টো আছে যা সফ্‌টওয়্যার নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত হয়। যেমন 'Esc' বোমাতটি। যে কোন অপারেশন কেন্‌সেল করতে এটি টিপ দিতে হয়।



কিবোর্ড প্রযুক্তি: এবার খুব সংক্ষেপে কিবোর্ড কিভাবে কাজ করে তা বুঝিয়ে বলার চেষ্টা চালাবো। আগেই বলেছি প্রতিটি বোতাম মূলত একেকটি সুইচ। যে মুহূর্তে আপনি কোনো কী'তে চাপ দিবেন তখোনি একটি ইলেকট্রিকেল সিগনাল সৃষ্টি হয়ে চলে যায় কম্পিউটারের প্রসেসরে। কিবোর্ডের সার্কেট **'বন্ধ'** [close] হয় যখন চাপ দেবেন। অন্যথায় সর্বদাই তা **'খোলা'** [open]। প্রসেসরের মধ্যে ইলেকট্রনিকভাবে সংরক্ষিত আছে একটি **'কীম্যাপ'**

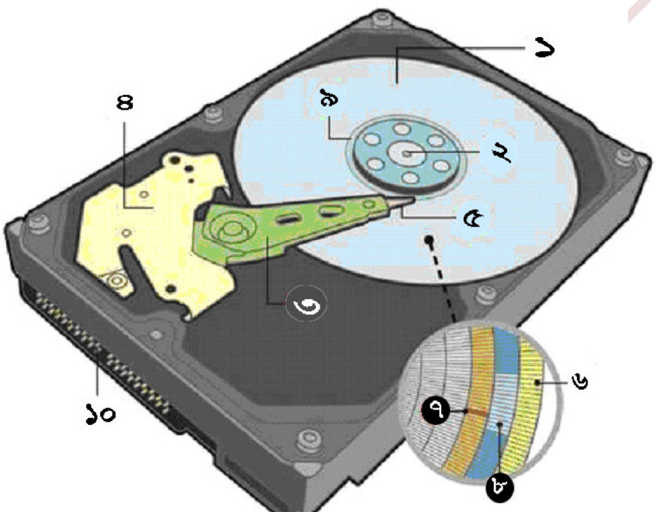
[keymap]। এর অপর নাম **‘ক্যারাক্টার ম্যাপ’** [character map]। বন্ধ অবস্থায় প্রসেসর বুঝতে পারে কোন্ বোতামটি টিপ দেওয়া হয়েছে। কম্পিউটারের অপরেটিং সিস্টেম এই কীম্যাপ প্রসেসরে আগে থেকেই সংরক্ষণ করে রাখে। সুতরাং কিবোর্ড **‘রিডিং’** প্রসেসরের জন্য অতি সহজ ব্যাপার। যে বোতামেই চাপ পড়বে সে বোতামের ফাংশন অনুযায়ী প্রসেসর তার কাজ চালাবে এবং প্রয়োজনে স্ক্রীনে [অর্থাৎ উইন্ডোতে] প্রদর্শন করবে।



ল্যাপটপ ছাড়া টাওয়ার ও অন্যান্য কম্পিউটারে কিবোর্ড ইউএসবি পোর্টের মাধ্যমে সংযুক্ত করতে হয়। কিবোর্ড ও কম্পিউটারের মধ্যে সর্বদা যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। এই যোগাযোগ প্রক্রিয়া মূলত উভয় দিকে হয়ে থাকে। একে বলে **‘বাই-ডাইরেকশনেল কমিউনিকেশন’** [bi-directional communication]। এর অর্থ কম্পিউটার ও কিবোর্ড একই সঙ্গে তথ্য আদান-প্রদান করতে সমর্থ। কিবোর্ডের সিগনাল কম্পিউটার গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত কি না তা আগে জানার দরকার। যতক্ষণ পর্যন্ত কম্পিউটার তথ্য গ্রহণ করতে প্রস্তুত হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত কিবোর্ড সিগনাল ধরে রাখবে। এভাবে কম্পিউটারের কিবোর্ড থেকে তথ্য প্রসেসরে যায়।

৪. হার্ড ডিস্ক

ইতোমধ্যে আমরা এ পেরিফেরল সম্পর্কে একাধিকবার উল্লেখ করেছি। একটি কম্পিউটারের গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র এটি। কম্পিউটারের অভ্যন্তরে এই হার্ড ডিস্ক থাকে। অবশ্য প্রয়োজনে বাইরে রেখেও তারের মাধ্যমে সংযুক্ত করে চালনা সম্ভব। আজকাল হার্ড ড্রাইভ বা ডিস্ক মোবাইল স্টোরেজ যন্ত্র হিসাবে আর ব্যবহৃত হচ্ছে না। এখন ব্যবহৃত হয় সিডি রম, ডিভিডি ও ফ্ল্যাস ড্রাইভ। আমরা এগুলোর উপর আলোচনা পরবর্তীতে করবো।



বায়ের চিত্রে আমরা ডিস্কের বিভিন্ন অংশ দেখতে পাচ্ছি। এখন এসব অংশের উপর অতিরিক্ত ব্যাখ্যা একে একে তুলে ধরছি। আয়নার মতো এলুমিনিয়াম কিংবা কাচের তৈরী প্লাটার [platter] কম্পিউটার **‘অন’** [ON] অবস্থায় অনবরত ঘুরতে থাকে। চিত্রে সংখ্যা ১ দ্রঃ। প্লাটার একটি মসৃণভাবে চলন্ত স্পিন্ডলের [spindle] উপর স্থাপিত [চিত্রে সংখ্যা ২]। এটার ঘূর্ণন সহজ করা হয়েছে পিচ্ছিল তৈল-পরিপূর্ণ বিয়ারিংয়ের মাধ্যমে। স্পিন্ডলকে ঘুরানোর জন্য আছে খুব

দ্রুতগতিসম্পন্ন একটি মোটর। প্লাটার হিসাবে কাচের ব্যবহার নোটবুক বা ল্যাপটপে বেশ উপযোগী। এতে হার্ড ড্রাইভের প্রস্থ অনেকটা পাতলা করা সম্ভব, যা এ ধরনের কম্পিউটারের জন্য জরুরী। অপরদিকে অপেক্ষাকৃত গাঢ় এলুমিনিয়াম প্লাটার শক্ত, তাই টাওয়ার কম্পিউটারে এরূপ প্লাটারের ব্যবহার দেখা যায়।

চিত্রে সংখ্যা ৩ দ্বারা দেখানো হয়েছে পাতলা **'একশূয়েটার আর্ম'** [actuator arm]। প্লাটারের অপরদিকেও এরূপ একটি হাত আছে। এগুলো স্থাপিত হয়েছে **'পিভট মেকানিজমের'** [pivot mechanism] উপর [চিত্রে সংখ্যা ৪]। হাতের মাথায় স্থাপিত আছে **'ড্রাইভ হেড'** [drive head], চিত্রে সংখ্যা ৫। এই ড্রাইভ মাথার ডিজাইন এমন যে, যখন প্লাটার দ্রুত গতিতে ঘুরতে থাকে তখন এটা একটু উপরে ওঠে আসে এবং উড়ন্ত অবস্থায় থাকে। যে থিওরীর উপর ভিত্তি করে এটি ডিজাইন হয়েছে তাকে বলে **'বেরনোলি'জ প্রিন্সিপাল'** [Bernoulli's principle]। এই থিওরীর অর্থ হলো দ্রুত ঘুর্ণনের ফলে উপরের দিকে বাতাসে চাপের সৃষ্টি হয়। এই চাপের ফলে আর্মের মাথা সামান্য উপরের দিকে উঠে আসে।

প্লাটারের উপরিভাগ খুব পাতলা ফিল্ম দ্বারা লেপা আছে। চুম্বকীয়ভাবে প্রতিক্রিয়াশীল কণায় পরিপূর্ণ থাকে পুরো ডিস্কটি। ঐ পাতলা ফিল্ম এগুলোকে স্থিত রাখে। চুম্বকীয় এসব কণাই ডাটা সংরক্ষণের কাজ আঞ্জাম দেয়। পজিটিভ ও নেগিটিভ চার্জসম্পন্ন কণা তথ্য সংরক্ষণের মূল। ঠিক যেভাবে টেপ রেকর্ডারের ক্যাসেটে চুম্বকীয়ভাবে তথ্য [শব্দ] সংরক্ষিত থাকে। তথ্য **'লোখার'** অর্থ হলো কয়েলের মধ্যে কারেন্ট চালনা করে এসব কণার চার্জ পরিবর্তন করা। মূলত ড্রাইভের মাথা কণাগুলো প্রয়োজনমাফিক **'ওলটপালট'** করে মাত্র।

এ পর্যন্ত আলোচনা থেকে হার্ড ডিস্কে তথ্য **'লিখে'** রাখার উপর আমাদের কিছুটা ধারণা হলো। এখন জেনে নিই ঠিক কোন্ উপায়ে উপরে বর্ণিত ওলটপালট কাজটি সংঘটিত হয়। ডিস্ককে ফরমেট করতে হয় প্রথমে। এর অর্থ সবকিছু মুছে নতুন তথ্য লিখার জন্য প্রস্তুত করা। এটা কম্পিউটার এসেম্বলীর সময় করা হয়ে থাকে। ফরমেট করা প্লাটার অসংখ্য **'ট্রাক'**এ [track] ভাগ করা হয়। চিত্রে সংখ্যা ৬ দ্রঃ। এছাড়া অসংখ্য **'সেক্টরে'** [sector] ভাগ করা জরুরী [চিত্রে সংখ্যা ৭]। ফরমেটিংয়ের সময় **'উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম'** [windows operating system] এসব ট্রাক সেক্টরকে অনেকগুলো দলে বিভক্ত করে। এগুলোকে বলে **'ক্লাস্টার'** [cluster]- চিত্রে সংখ্যা ৮ দ্রঃ। যে কোনো ফাইল সর্বনিম্ন কী পরিমাণ স্থান দখল করবে এই ক্লাস্টার দ্বারা তা নির্ধারিত হয়। এতে এটাই বুঝা যায়, ক্লাস্টার সাইজ যতো কম হবে মেমোরীর স্থান ততো কম অকেজো থাকবে। প্লাটারের আরেক এলাকার নাম **'ল্যান্ডিং এরিয়া'** [landing area]। চিত্রে সংখ্যা ৯ দ্বারা এটা দেখানো হয়েছে। কেন্দ্রের হাবের নিকটে এ স্থানটির জায়গা। এখানে নিষ্ক্রিয় থাকাবস্থায় লেখার মাথা অবস্থান করে। এ এলাকা **'পার্কিং স্থান'** হিসাবে ধরে নিতে পারি আমরা। এখানে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় **'পড়ার হাতে'**র মাথা **'পার্ক'** করা থাকে।



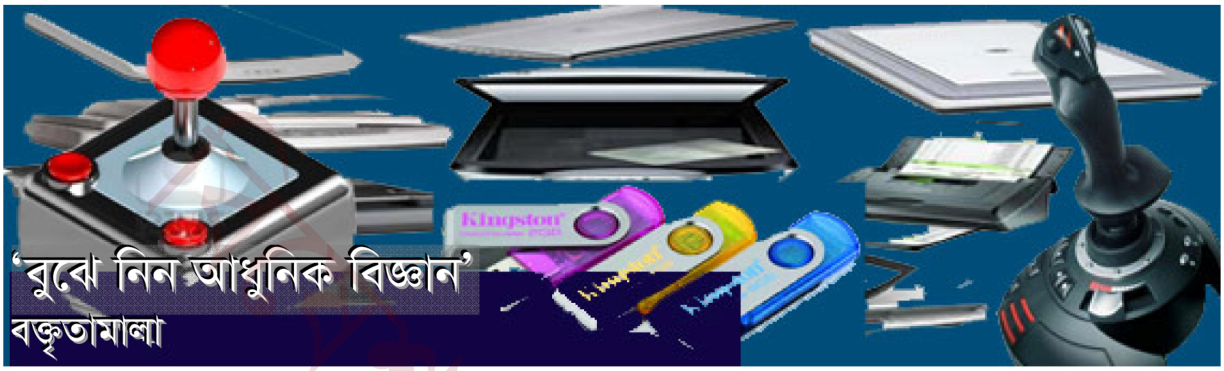
কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেম (এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তী একটি লেকচারে হবে) কর্তৃক নির্দেশ মুতাবিক উপরোক্ত 'actuator arm' বা তথ্য পড়া-লেখার হাত তার কাজে লেগে যায়। উপরের [প্রথম] চিত্রে এই যোগাযোগ সূত্র ১০ সংখ্যা দ্বারা দেখানো

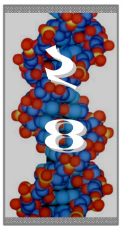
হয়েছে। একে বলে **'ইন্টারফেইস'** [interface]। ঠিক কিভাবে হাতটি নির্দেশ মান্য করে?

ধরুন আপনি মাইক্রসফ্‌ট ওয়ার্ডে একটি ফাইল লিখে তা সংরক্ষণের জন্য **'সেইভ'** [save] করবেন। আপনি সংরক্ষণের নির্দেশ দেওয়ার পরই একটি **'লিখো'** [write] কমান্ড তথ্যসহ অপারেটিং সিস্টেম প্রেরণ করবে ইন্টারফেইসের মাধ্যমে লিখার হাতে। এটা ঘুরে চলে যাবে এই ফাইলের [যদি আগেই সংরক্ষণ হয়ে থাকে] ট্র্যাকে। ডিস্ক আর্মের নীচে ঘুরে আসলেই লিখে নেবে। ডিস্কের যাবতীয় ফাইল **'ডাইরেক্টরী টেবিল'** [directory table] নামক একটি ডাইরিতে সংরক্ষিত থাকে যাতেকরে সহজে তা বের করা সম্ভব হয়। কোনো **'পড়ো'** [read] নির্দেশ আসলে ড্রাইভ এই টেবিলে খোঁজ করে তা পড়ার জন্য হাতকে জানায়। হাত সেখানে পৌঁছে তা পড়ে অপারেটিং সিস্টেমের মাধ্যমে সফ্‌টওয়্যারে পাঠিয়ে দেয়- যা এই তথ্য ব্যবহার, প্রদর্শন ইত্যাদি করে। আর এভাবেই তথ্য সংরক্ষণকারী ডিস্ক, অপারেটিং সিস্টেম ও সফ্‌টওয়্যারের মধ্যে সংরক্ষিত ডাটা আদান-প্রদান হয়।

প্রিয় ছাত্রবন্ধুরা! আজকের লেকচারে আমরা কম্পিউটারের গুরুত্বপূর্ণ চারটি পেরিফেরল তথা ডিসপ্লে ইউনিট, মাউস, কিবোর্ড ও হার্ড ডিস্কের উপর বেশ কিছু আলোচনা করলাম। আমি আশারাখি এ থেকে সকলেই উপকৃত হয়েছেন। এক্সপার্ট তো হন নি- তবে অন্তত আগের থেকে এখন আপনারা কম্পিউটারের এসব কঠিন যন্ত্রাংশ সম্পর্কে অনেকটা বেশী ওয়াকিফহাল- এটুকু বলা যায়। ঠিক না? যাক, আগামী লেকচারে আরো ক'টি পেরিফেরল সম্পর্কে আলোচনার আশা ব্যক্ত করে আজকের লেকচার শেষ করছি। আল্লাহ হাফিজ।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম





বক্তাঃ ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী, নেশন্যাল ডিপ্লোমা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ইংল্যান্ড।

স্থানঃ খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সুবিদ বাজার, সিলেট।

ঘ. বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক বিজ্ঞান

বক্তৃতা ২৪ : আধুনিক প্রযুক্তি

১০. ব্যক্তিগত কম্পিউটার [পিসি]

১০.খ. কঠিন যন্ত্রাংশ [hardware] : পেরিফেরল্স্

আধুনিক বিজ্ঞানের উপর পরিচিতিমূলক লেকচারের ২৪তম সংযোজনে সবাইকে জানাচ্ছি উষ্ণ স্বাগত। কম্পিউটার প্রযুক্তির উপর আমরা গেল দু'টি লেকচারে অনেক বলেছি। তবে আরো বাকী আছে! কম্পিউটারের মূল যন্ত্রাংশের নাম **'মাদারবোর্ড'** [motherboard]। এর সঙ্গে বিভিন্নভাবে সংযুক্ত হয়ে কাজ করে এমন অনেক যন্ত্র আছে যাদেরকে কম্পিউটার বিজ্ঞানীরা **'পেরিফেরল'** [peripherals] বলে সম্বোধন করেন। আমরা ইতোমধ্যে চারটি পেরিফেরল সম্পর্কে কিছুটা তথ্য তুলে ধরেছি। এখন আরো কয়েকটির উপর আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

৫. জয়স্টিক

আপনাদের অনেকেই হয়তো এই বিশেষ পেরিফেরল সম্পর্কে অবগত নন- থাকার কথাও নয়। এটি মূলত কম্পিউটারে **'গেম্স'** খেলার একটি যন্ত্র। আপনাদের তুলনায় অল্প বয়স্কদের নিকট অবশ্যই **'জয়স্টিক'** [joystick] বলতে কি বুঝায় তা ভালোভাবে জানা আছে। কম্পিউটারের গেম্স একটি **'নেশা'** হিসাবে ধরে নিয়েছেন অনেকে। ছোট থেকে বড়দের অনেকেই এই নেশা থেকে মুক্ত নন- অন্তত পশ্চিমা দেশের সর্বত্র এ কথাটি সত্য হিসাবে বিবেচিত ও প্রমাণিত। যাক জয়স্টিকের কাজ অনেকটা মাউসের মতোই। তবে এই যন্ত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রাফিক্যাল

বস্তু যেমন গাড়ি, মোটরসাইকেল, মহাকাশযান, গোলা-বারুদ, বন্দুক, মেশিনগান, বিমান পরিচালনা, বোমা নিক্ষেপ, ফুটবল, টেনিস বল, ক্রিকেট বল ইত্যাদি চলন্ত জিনিসকে নিয়ন্ত্রণ করা অনেকটা সহজ। কিভাবে? এক্ষুণি এ প্রশ্নের উত্তর আমরা জেনে নেবো।



কয়েকটি জয়স্টিক

মৌলিক ডিজাইন: উপরের চিত্রে কয়েক ধরনের জয়স্টিক দেখানো হয়েছে। ব্যবহারকারীর নিকট উপরের দৃশ্যত অংশটি জরুরী- যেমন, একটি মোটা লাঠি ও এর মধ্যস্থ বোতামগুলো। এগুলো নাড়াচাড়া ও টিপ দিয়ে সামনের ডিসপ্লে ইউনিট বা মনিটরে দৃশ্যমান গ্রাফিক্স নিয়ন্ত্রণ করা হয়। তবে আসল প্রযুক্তি লুকানো থাকে বাক্সের অভ্যন্তরে। সেখানে আছে একাধিক **'ইলেকট্রনিক সার্কেট'** [electronic circuit]। কারেন্ট কোন্ দিকে কি পরিমাণ কতক্ষণ চলমান আছে বা নেই- তাই নির্ধারণ করে দৃশ্যত বস্তুটি [যা জয়স্টিক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত] কোন্ দিকে কোন্ গতিতে কতো সময় চলবে। যখন লাঠি স্থির থাকে তখন কোনো কারেন্ট চলে না। সুতরাং জয়স্টিকের নিয়ন্ত্রণে থাকা বস্তুটিও স্থির থাকবে। গেম্‌স ডিজাইনাররা জয়স্টিকের বিভিন্ন বোতামের ফাংশন কাজে লাগান। যেমন বায়ের লাল বোতামের অর্থ বন্দুকের গুলি, সবুজটির অর্থ গাড়ির ব্রেক কষা, নীলটি মানে উচ্চগতিতে চলা ইত্যাদি। জয়স্টিক সাধারণত ইউএসবি তারের মাধ্যমে কম্পিউটারের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। নীচে আরো একটি জয়স্টিকের ছবি তুলে ধরেছি।



৬. প্রিন্টার

কম্পিউটারের এই পেরিফেরলটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনার লেখা, আর্টওয়ার্ক, ডিজাইন ইত্যাদি **'বাইরে'** প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম হলো এই প্রিন্টার যন্ত্রটি। এছাড়া বই, পুস্তকসহ, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি **'প্রিন্টেড মিডিয়া'** [printed media] বলতে যা-ই বুঝায় তা সবই এই প্রিন্টারের উপর নির্ভরশীল। আর আজকাল **'যাবতীয় প্রিন্টেড মিডিয়া'** মূলত কম্পোজ ও ডিজাইন হয় কম্পিউটারের মাধ্যমে। তিন ধরনের প্রিন্টার আছে: **১.** পুরাতন ডট-মেট্রিক্স, ২. আধুনিক ইঙ্কজেট ও **৩.** সর্বাধুনিক লেইজার।



ডট-মেট্রিক্স প্রিন্টারের ব্যবহার আজকাল নেই বললেই চলে। প্রাথমিক যুগে এগুলো ব্যবহৃত হতো। প্রিন্টাররা সাধারণত প্রিন্ট-হেড নামক অংশ দ্বারা প্রিন্ট করার কাজটি করে থাকে। এই প্রিন্ট-হেডে ৭-পিন, ৯-পিন, ২৪-পিন ইত্যাদি সংখ্যক পিন বা সূঁই ব্যবহৃত হতো এসব প্রিন্টারে। নীচের চিত্রের দিকে খিয়াল করলে বিষয়টি বুঝা যাবে সহজে। এসব প্রিন্টার নীচে কাপড়ের তৈরী কালিমাখা রিবোনের উপর দ্রুত আঘাত হেনে কাগজে ছাপ দিয়ে অক্ষর, ছবি ইত্যাদি প্রিন্ট করতো।

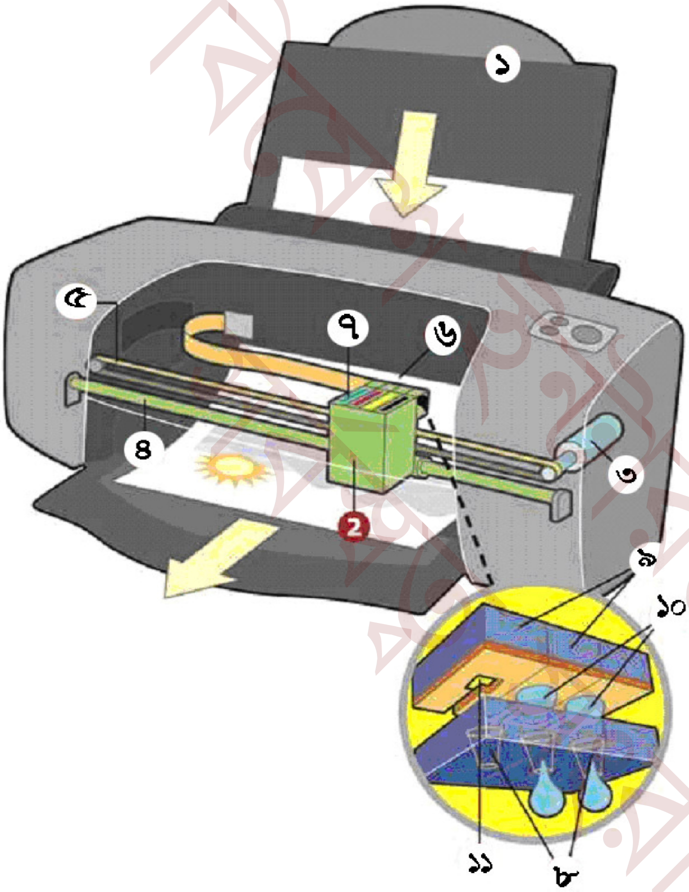
ডানের ছবিতে আমরা তিন ধরনের **'প্রিন্ট-কুয়ালিটি'** [print quality] দেখতে পাচ্ছি। লক্ষ্য করুন সর্বাধুনিক লেইজার প্রিন্ট কুয়ালিটি কতো উচ্চ মানের।

This is an example
of dot-matrix printed
text (9-pin).

This is an example
of dot-matrix printed
text (24-pin).

This is an example of text
printed on a Ricoh PC Laser
6000 laser printer.

আধুনিক ইঙ্কজেট প্রিন্টার: আধুনিক যুগে সর্বাধিক ব্যবহৃত এই গতিশীল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন উচ্চমানের প্রিন্টারের উপর আমরা যেটুকু সম্ভব তথ্যাদি তুলে ধরার ইচ্ছা রাখি। এ লক্ষ্যর্জনে শিক্ষার্থীদের প্রতি অনুরোধ, নিম্নোক্ত ছবিটির প্রতি খিয়াল রাখবেন পরবর্তী লেখাটুকু পাঠের সময়। ছবিতে ১ থেকে ১২ পর্যন্ত ইংরেজী সংখ্যা দ্বারা প্রিন্টারের বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করা হয়েছে। আমরা একে একে এসব অংশের কাজ কি তা জেনে নেবো।

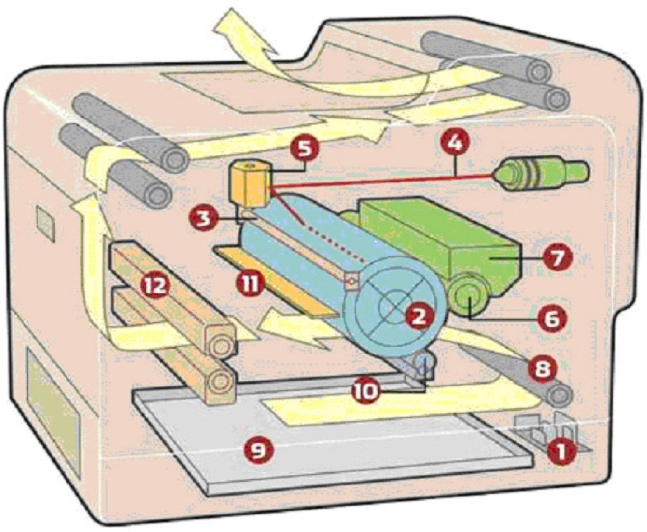


আপনার পিসি'তে **'প্রিন্টার ড্রাইভার'** [print driver] নামক একটি সফ্টওয়্যার আছে। আপনি যখন কোনো ডকুমেন্ট প্রিন্ট করতে ইচ্ছে করেন, এই ড্রাইভার তথ্য প্রেরণ করে দেয় প্রিন্টারে। উপরের চিত্রাঙ্কনে আমরা ইঙ্কজেট প্রিন্টারের **১১**টি অংশ চিহ্নিত করেছি। প্রয়োজনে এগুলোর ব্যাখ্যা তুলে ধরবো আলোচনাকালে। প্রিন্টারের অভ্যন্তরস্থ ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রাদি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত প্রিন্টিং কাজ শুরুর সময় **'পেপার ট্রে'** [paper tray -চিত্রে সংখ্যা ১ দ্বারা চিহ্নিত] থেকে রোলার একটি কাগজ টেনে নিয়ে যায়। যে মূল যন্ত্রাংশ প্রিন্টিং কাজটি করে থাকে তার নাম **'প্রিন্ট হেড'** [print head]। এর অপর নাম **'ক্যাট্রিজ এসেম্বলী'** [cartridge assembly] - চিত্রে সংখ্যা ২। রোলার কাগজকে নিয়ে যায় ক্যাট্রিজের নীচে। সাথে সাথে **'প্রিন্ট হেড স্টেপার মটর'** [print head stepper motor] তার কার্য শুরু করে। সে প্রিন্টহেডকে একটি **'স্লাইডিং রড'** [sliding rod -চিত্রে সংখ্যা ৩ দ্বারা চিহ্নিত] এর উপর দিয়ে চলন্ত করে নিয়ে যায় তার শুরুর অবস্থানে। এই কাজে সাহায্য করে একটি **'বেল্ট'** [belt] - চিত্রে সংখ্যা ৪।

মূল প্রিন্টিং যন্ত্র **'প্রিন্ট হেড'** [print head -চিত্রে সংখ্যা ৬ দ্বারা চিহ্নিত] অত্যাশ্চর্য ক্ষুদ্রাকার প্রযুক্তি [miniaturization technology]। এই ছোট্ট যন্ত্রাংশই আসল প্রিন্টিং কাজটি করে থাকে। কোনো কোনো প্রিন্টারে প্রিন্টহেড ও **'ইঙ্ক ক্যাট্রিজ'** [ink cartridge -চিত্রে সংখ্যা ৭ দ্বারা চিহ্নিত] একই ইউনিটে যুক্ত থাকে। প্রিন্টহেডের ক্ষুদ্রকায় **'নজোল্‌স'** [nozzles -চিত্রে সংখ্যা ৮] দিয়ে বেরিয়ে আসে কালি। নজোলের সংখ্যা কয়েক ডজেন থেকে হাজার হাজার পর্যন্ত হতে পারে- যা নির্ভর করবে আপনার প্রিন্টার মডেলটির উপর। খুব ছোট্ট **'ইঙ্ক চেম্বার'** [ink chamber -চিত্রে সংখ্যা ৯] থেকে কালি নজোলের মাধ্যমে বেরিয়ে এসে কাগজে পতিত হয়। এসব ক্ষুদ্রকায় চেম্বারে কালি সরবরাহ হয় ক্যাট্রিজের সংরক্ষিত জায়গা থেকে। সেখানে কালি জমা থাকে। একে ৎবংবৎাড়রৎ বলে। খুব ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রকায় কালির ফোটা [microscopic droplets -চিত্রে সংখ্যা ১০] যাদের আয়তন এক লিটারের কোটি কোটি অংশের একাংশ মাত্র উক্ত নজোলের মাধ্যমে বেরিয়ে আসে। কিন্তু কিভাবে? পাম্প দ্বারা এরূপ কাজ সম্ভব নয়।

একমাত্র **'এপসন'** [Epson] প্রিন্টার তৈরীর কোম্পানী ছাড়া অধিকাংশ প্রিন্টার প্রস্তুতকারক যে প্রযুক্তির মাধ্যমে উপর্যুক্ত কাজটি সারেন তাকে বলে **'থারমেল টেকনোলজি'** [thermal technology]। এ প্রযুক্তির মূলে আছে কালির চেম্বারে স্থাপিত একটি ছোট্ট ইলেকট্রিকেল **'রেজিস্টার'** [register -চিত্রে সংখ্যা ১১]। প্রয়োজনে কারেন্ট দ্বারা এতে সৃষ্টি করা হয় পাল্‌স [স্পন্দন]। এর ফলে উচ্চ তাপে কালি ভীষণভাবে গরম হয়ে ওঠে। কালির ফোটার একাংশ বাষ্পে পরিণত হয়। এতে সৃষ্টি হয় চাপ, যার ফলে কালি বাধ্য হয়ে বেরিয়ে এসে আপনার কাগজে পতিত হয়। একই কাজ আঞ্জাম দিতে এপসন কোম্পানী ভিন্ন একটি প্রযুক্তি ব্যবহার করে থাকে। এই প্রযুক্তির নাম **'পিজোইলেকট্রিক এফেক্ট'** [piezoelectric effect]। কালির চেম্বারে রাখা থাকে একটি ক্রিস্টেল। প্রয়োজনে এর মধ্য দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত করা হয়। এতে শুরু হয় কম্পন, যার পরিণতিতে কালি নজোল দিয়ে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়। এভাবে কাগজে কম্পিউটারের লেখা, ছবি, গ্রাফিক্স ইত্যাদি সঠিকভাবে রঙ্গিন [বা সাদা-কালো] কালিতে অঙ্কিত হয়। কোথায় কোন্ স্থানে কতটুকু কোন্ রঙের কালি অঙ্কিত হবে তা ড্রাইভার সফ্টওয়্যার, প্রিন্টারের প্রিন্টহেড ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক সার্কেট নিয়ন্ত্রণ করে।

লেইজার প্রিন্টার: এই অত্যাধুনিক দ্রুত গতিশীল প্রিন্টার সম্পর্কে আলোচনাকালে শিক্ষার্থীরা নীচের ড্রইংটির দিকে দৃষ্টি রাখবেন- এটুকু অনুরোধ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপনার কম্পিউটার লেইজার প্রিন্টারের **'কন্ট্রোলার সার্কেট'** [controller circuit -চিত্রে সংখ্যা ১ দ্বারা চিহ্নিত] এর সঙ্গে কথা বলে থাকে। কম্পিউটারের **'প্রিন্টার ড্রাইভার'** [printer driver] থেকে প্রাপ্ত ছবি, চিত্র ও লেখা তথ্যাদি **'রাস্টার ইমেজ প্রসেসর- আরআইপি'** [raster image processor - RIP] চীপ পরিবর্তন করে খুব ক্ষুদ্রকায় বিন্দুতে পরিণত করে। ঠিক কোথায় কতটুকু কি পরিমাণ কালি কাগজে ছাপতে হবে সে তথ্যও আরআইপি সরবরাহ করে থাকে। তবে যন্ত্রাংশ দ্বারা ছবি অঙ্কিত হবে সেটা হলো **'ফটো কন্ডাক্টিং ড্রাম'** [photo conducting drum -চিত্রে সংখ্যা ২]। এটা একটি বিশেষভাবে লেপা সিলিন্ডার। একটি **'চার্জিং রোলার'** [charging roller -চিত্রে সংখ্যা ৩ দ্বারা চিহ্নিত] থেকে ফটোকন্ডাক্টিং ড্রামে ধণাত্মক কিংবা ঋণাত্মক [positive or negative] চার্জ আসে। এদিকে একটি **'লেইজার অংশুজাল'** [laser beam -চিত্রে সংখ্যা ৪] এক টুকরো ঘুর্ণনরত আয়না [spinning mirror -চিত্রে সংখ্যা ৫] থেকে প্রতিবিম্ব হয়ে খুব দ্রুত অন/অফ হতে থাকে। এর দ্বারা ড্রামের চার্জগুলো **'স্কান'** [scan] হয়। যখন অংশুজাল অন হয় তখন ড্রামের চার্জকৃত ক্ষুদ্র বিন্দুকে বিপরীত [negative] করে দেয়। এতে এটাই বুঝাচ্ছে, এই বিন্দুটি কালো হবে। আর অফ থাকলে সে বিন্দুটি হবে সাদা। এভাবে পুরো একটি লাইন লেইজার দ্বারা দ্রুত স্ক্যান হওয়ার পর একটি **'স্টেপার মটর'** [stepper roller] ড্রামকে এগিয়ে নেয়। লেইজার এবার পুরো ক্রিয়া পুনরায় শুরু করে। এভাবে সম্পূর্ণ ইমেজ স্ক্যান হয়ে যায়- আর তা হবে খুব দ্রুত।



এবার ড্রামের লেইজার-চুমুক অংশটুকু **'ডেভোলাপার রোলার'** [developer roller -চিত্রে সংখ্যা ৬ দ্বারা চিহ্নিত] এর সঙ্গে একত্রিত হয়। এই রোলারে লেপা থাকে ক্যাট্রিজের **'টৌনার হপার'** [toner hopper -চিত্রে সংখ্যা ৭] নামক অংশ থেকে প্রাপ্ত চার্জহওয়া কণা [কালি]। ড্রামের অ-চার্জসম্পন্ন এলাকায় এসব চার্জহওয়া টৌনার

কণাগুলো **'আটকে'** থাকে। এর দ্বারাই সৃষ্টি হয় আপনার লেখা, চিত্র বা ছবি।

অপরদিকে, একই সময় একটি **'বেল্ট'** বা **'রোলার এসেম্বলী'** [roller assembly -চিত্রে সংখ্যা ৮ দ্বারা চিহ্নিত] এক টুকরো কাগজ **'পেপার ট্রে'** [paper tray -চিত্রে সংখ্যা ৯] থেকে তুলে নিয়ে আসে। কাগজ টুকরো ওঠে আসার সময় **'ট্রান্সফার রোলার'** [transfer roller] বা **'চার্জিং ওয়ের'** [charging wire -চিত্রে সংখ্যা ১০] হয়ে আসে। এই রোলার বা ওয়েরের কাজ হলো টৌনারের বিপরীতধর্মী চার্জ দ্বারা কাগজকে চার্জসম্পন্ন করা। এখন কাগজটি ড্রামের সঙ্গে মিলিত হওয়ার সময়। ড্রামের টৌনার এবার কাগজে চিত্র, লেখা ও ছবি হিসাবে প্রতিস্থাপন হবে। এরপর একটি **'ক্লিনিং ব্লেড'** [cleaning blade -চিত্রে সংখ্যা ১১ দ্বারা চিহ্নিত] সক্রিয় হয়ে ড্রামকে পরিষ্কার করে নেয়। সুতরাং পরবর্তী ইমেজ প্রিন্টিং পুনরায় শুরু হতে পারে। পুরো প্রসেসটি একটি সুষ্ঠু চক্রাকার উপায়ে সংঘটিত হয়। এভাবেই লেইজার প্রিন্টার তার কাজ সারে। রঙিন লেইজার প্রিন্টারও অনুরূপ কাজ করে। সে ক্ষেত্রে কাগজ টুকরো চারটি ভিন্ন ড্রাম থেকে ইমেজ সংগ্রহ করতে হবে। চার রঙ মিলেই পূর্ণ রঙিন প্রিন্ট হয়ে থাকে। নীচে একটি রঙিন লেইজার প্রিন্টারের ছবি তুলে ধরেছি।

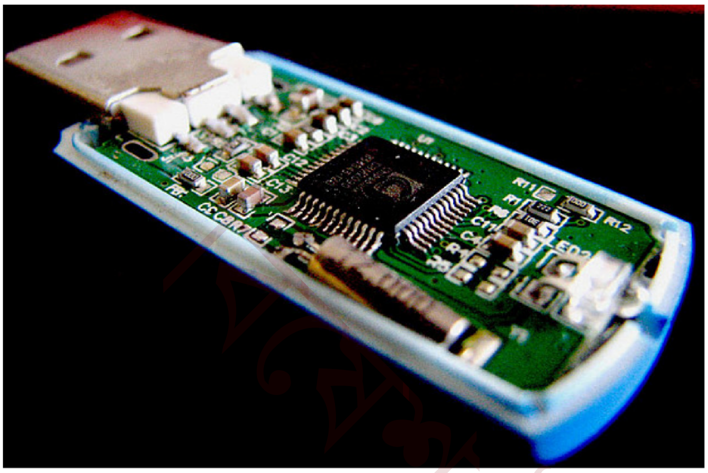


৭. ফ্ল্যাস ড্রাইভ

আজকের লেকচারের ইতি এখানে টানতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু এখনও আরো ৫টি পেরিফেরল নিয়ে আলোচনার দরকার। এগুলো হলো ফ্ল্যাস ড্রাইভ, সিডি রম, মডেম, স্কানার ও লাইট পেন। আজকের লেকচারে এর প্রথমটি নিয়ে যাকিছু প্রয়োজন তথ্যাদি তুলে ধরা জরুরী মনে করছি। আগামী লেকচারে বাকীগুলোর উপর বলবো ইনশাআল্লাহ।

আজকাল ফ্ল্যাস মেমোরী যন্ত্র সর্বত্র ব্যবহৃত হচ্ছেঃ ভিডিও গেইম থেকে ডিজিটেল ক্যামেরায়। উচ্চ গতি, ক্ষুদ্র আয়তন ও স্থির শক্ত যন্ত্রাংশ এবং সেসাথে মূল্যের স্বল্পতা হেতু ফ্ল্যাস মেমোরী হয়ে ওঠছে বেশি থেকে বেশি জনপ্রিয়। ফ্ল্যাস টেকনোলজির এই অভূতপূর্ব সফলতা এক যোগে জনপ্রিয় ফ্লপি ড্রাইভকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছে। এখন এ যন্ত্রটি আর কেউ ব্যবহার করেন না। আর চলন্ত কোন অংশ না থাকায় ফ্ল্যাস মেমোরী যন্ত্র **'ইউএসবি ড্রাইভ'** [USB drive] কম্পিউটার বিজ্ঞানের ভাষায় একটি **'সলিড-স্টেট স্টোরেজ মিডিয়াম'** [solid-state storage device] হিসাবে স্বীকৃত। অর্থাৎ কঠিন অবস্থাসম্পন্ন সংরক্ষণ মাধ্যম।





বায়ের চিত্রে ইউসএসবি ড্রাইভের অভ্যন্তর দেখা যাচ্ছে। এসব ড্রাইভের মধ্যে চারটি মৌলিক অংশ আছে। এগুলো হলো: ১ **'ইউএসবি কানেক্টার'** [USB connector] - ইউনিভার্সাল সেরিয়েল বাস সংযুক্তি। এই যন্ত্রাংশের মাধ্যমে ড্রাইভটি সরাসরি কম্পিউটারের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ২. **'ইউএসবি ম্যাস স্টোরেজ কন্ট্রোলার'** [USB mass storage controller] - তথ্য নিয়ন্ত্রক। এতে আছে রম ও র‌্যাম [ROM and RAM] চীপ। ৩. তথ্য সংরক্ষণের জন্য **'এনএএনডি ফ্ল্যাস মেমোরী চীপ'** [NAND Flash memory chip] - কম্পিউটারের লজিকেল অপারেটর যার বৈশিষ্ট্য হলো শুধুমাত্র আউটপুট সিগনাল সৃষ্টি করা এরূপ একটি চীপ। NAND অর্থ 'not+and'। কম্পিউটার বিজ্ঞানের লজিকেল অপারেটরের গুরুত্ব অপরিসীম। পরবর্তীতে আমরা সফ্‌টওয়্যার নিয়ে আলোচনাকালে এ সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য তুলে ধরবো। ৪. একটি **'ক্রিস্টেল অসিলেটর'** [crystal oscillator]। এর কাজ হলো ড্রাইভ থেকে বেরিয়ে আসা [আউটপুট] তথ্যাদি নিয়ন্ত্রণ করা।

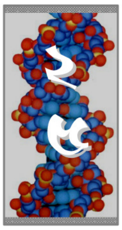
ফ্ল্যাস মেমোরীর মূলে আছে গ্রিড [কলাম ও সারি] ডিজাইন। যেমনটি আপনি দেখতে পান, আর্টওয়ার্ক ডিজাইন প্রোগ্রামে। প্রত্যেক গ্রিডের মিলনস্থলে [ইন্টারসেকশনে] আছে দু'টি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ট্রানজিস্টার। এগুলো মূলত ইলেকট্রনিক সূইচ। এ দু'টোকে যথাক্রমে **'ফ্লোটিং গেইট'** [floating gate] এবং **'কন্ট্রোল গেইট'** [control gate] বলে। এসব কম্পিউটার বিজ্ঞানের শব্দের অর্থ এ মুহূর্তে আপনার আমার জানার দরকার নেই। কথা প্রসঙ্গে বললাম মাত্র। তবে এই উভয় ট্রানজিস্টারের মধ্যখানে আছে একটি পাতলা **'অক্সাইড লেয়ার'** [oxide layer]। সূইচিংয়ে যাতে সর্ট-সর্কেট না ঘটে তা-ই এ ব্যবস্থা।

ফ্ল্যাস ড্রাইভে থাকে ইইপিআরঅএম [Electronically Erasable Programmable Read-Only Memory - EEPROM] চীপ। এটাতেই উপরোক্ত গ্রিড ডিজাইন ব্যবহৃত হয়। উউচজঙগ-এ সংরক্ষিত তথ্য ব্লকে ব্লকে মুছে ফেলা যায় এবং নতুনভাবে সংরক্ষণও সম্ভব। ফ্ল্যাস ড্রাইভ থেকে যে কোন ফাইল সরাসরি পরিচালনাও সম্ভব- ঠিক যেভাবে আপনার কম্পিউটারের হার্ড ড্রাইভ থেকে হয়ে থাকে। ফাইলে সংরক্ষিত **'সিগনেচার'** [signature] বা স্বাক্ষরিত তথ্য থেকে কম্পিউটারে সংরক্ষিত ফাইলের সঙ্গে সম্পৃক্ত **'সফ্‌টওয়্যার প্রোগ্রাম'** এমনিতেই খুলে যায় ও তা পরিচালনা করে। মোটকথা, ইউএসবি ফ্ল্যাস ড্রাইভ- যার অপর নাম পেন ড্রাইভ একটি সুযোগসম্পন্ন সংরক্ষণ যন্ত্র। তবে প্রাথমিক যুগে এই যন্ত্রের মাধ্যমে **'কম্পিউটার ভাইরাস'** [computer virus] অতি সহজে ট্রান্সফার হতো। আজকাল অবশ্য উন্নতমানের যন্ত্র বেরিয়েছে। আর এ্যান্টি-ভাইরাস সফ্‌টওয়্যার দ্বারা কম্পিউটার নিরাপদ রাখারও ব্যবস্থা সর্বত্র ব্যবহৃত হচ্ছে। সুতরাং ফ্ল্যাস ড্রাইভ সহজে বাজার থেকে নিশ্চিহ্ন হবার নয়। প্রাথমিক যুগে এক, দুই গিগাবাইট পর্যন্ত মেমোরী এগুলোতে সংরক্ষণ করা যেতো। আজকাল ১২০ গিগাবাইট সংরক্ষণ ক্ষমতাসম্পন্ন ড্রাইভ বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। ভবিষ্যতে বেশী থেকে বেশী মেমোরী সংরক্ষণ ক্ষমতাসম্পন্ন ফ্ল্যাস ড্রাইভ বাজারে আসবে- এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

আগামী লেকচারে সবার সাথে আবার দেখা হবে- এটুকু আশা রেখে আজকের এই দীর্ঘ আলোচনার ইতি টানছি। আল্লাহ হাফিজ।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম





বক্তা: ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী, নেশন্যাল ডিপ্লোমা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ইংল্যান্ড।

স্থান: খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সুবিদ বাজার, সিলেট।

ঘ. বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক বিজ্ঞান

বক্তৃতা ২৫ : আধুনিক প্রযুক্তি

১০. ব্যক্তিগত কম্পিউটার [পিসি]

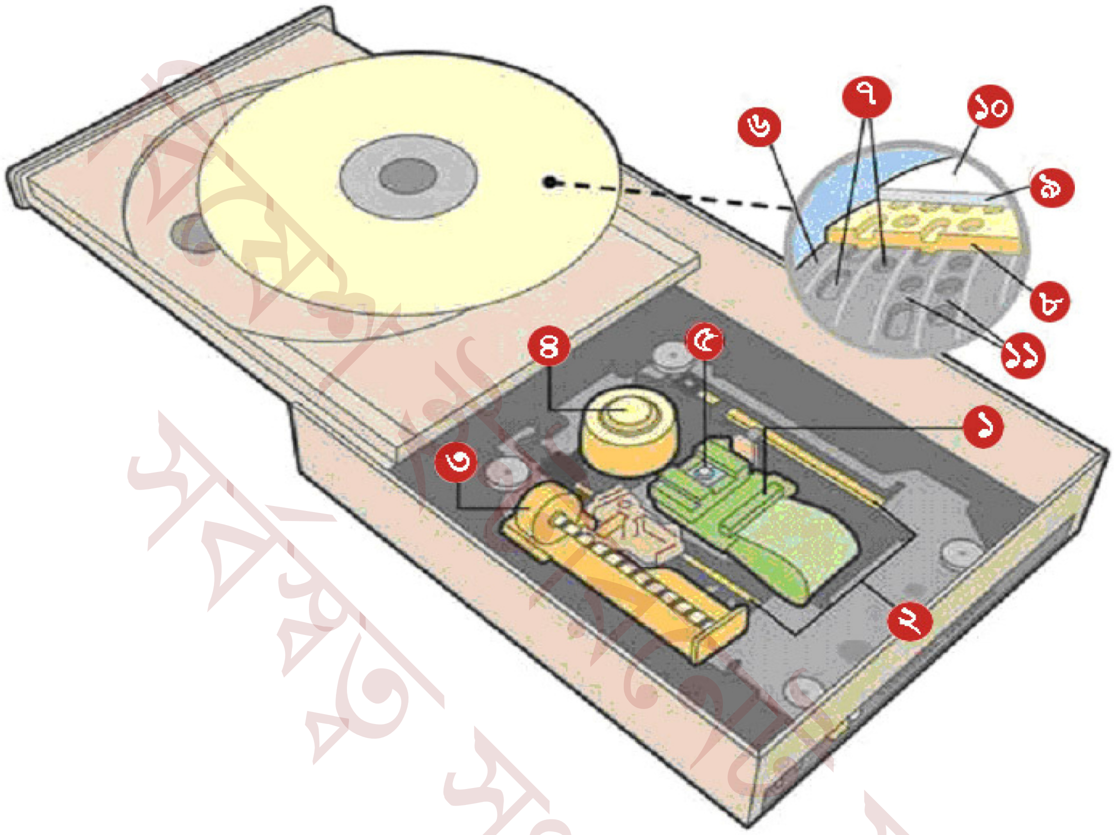
১০.খ. কঠিন যন্ত্রাংশ [hardware] : পেরিফেরলস্

বুঝে নিন আধুনিক বিজ্ঞান শীর্ষক বক্তৃতামালার এই ২৫তম সংযোজনে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। ইতোমধ্যে আমরা বেশ ক'টি লেকচার আধুনিক যুগের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র কম্পিউটারের উপর প্রদান করে আসছি। আজো করবো। আধুনিক যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বপ্রধান যন্ত্র এটি, তাই আমরা এ সম্পর্কে যেটুকু সম্ভব জ্ঞানার্জন করার চেষ্টা চালাচ্ছি। আশারাখি এ পর্যন্ত যা আলোচনা হয়েছে তা থেকে সকলেই কিছুটা হলেও উপকৃত হয়েছেন। তবে কম্পিউটার বিজ্ঞান একটি বিরাট বিষয়। আজকাল শুধু এই বিষয়ের উপর উচ্চতর ডিগ্রী ক্লাস হচ্ছে পৃথিবীর অসংখ্য কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে। যাক, কম্পিউটারের হার্ডওয়্যারের অংশ হিসাবে ১১টি যন্ত্র নিয়ে আলোচনা করছি। এগুলোকে বলে পেরিফেরল। ইতোমধ্যে ৭টি যন্ত্রের উপর বক্তৃতা শেষ হয়েছে। আজকের লেকচারে বাকী ৪টি সম্পর্কে আলোচনা করে শেষ করার আশা রাখি।

৮. সিডি রম

'সিডি রম' [compact disk read only memory -CD ROM] সিস্টেম মূলত তথ্য সংরক্ষণের একটি উপায়। যে ড্রাইভের দ্বারা সিডি পরিচালিত হয় তার নাম **'সিডি রম ড্রাইভ'** [CD ROM Drive]। ঠিক

কিভাবে এই ড্রাইভটি কাজ করে তা জানা দরকার। শিক্ষার্থীরা নীচের চিত্রের প্রতি খিয়াল রাখবেন। বিভিন্ন যন্ত্রাংশকে সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করেছি সহজে বুঝার উদ্দেশ্যে।



প্রতিটি একবার মাত্র লেখা যায় এমন সিডি [writable CD] কিংবা বার বার লেখা যায় সে ধরনের সিডি [rewritable CD] জ্বালাতে [burn] হয়। এখানে জ্বালানো মানে পুড়ে ফেলা নয় অবশ্যই! তথ্যকে সিডিতে সংরক্ষণের প্রসেসকে বলে জ্বালানো। এ কাজটি আঞ্জাম দিতে ব্যবহৃত হয় একটি **'লেইজার স্লেড'** [laser sled -চিত্রে সংখ্যা ১], যা চলন্ত থাকে **'স্লাইডিং রেল'** [sliding rails -চিত্রে সংখ্যা ২] এর উপর। এটাকে চলন্ত করা হয় অবশ্য একটি **'মটর'** [motor -চিত্রে সংখ্যা ৩] দ্বারা। **'ডিস্ক হাব'** [disk hub -চিত্রে সংখ্যা ৪ দ্বারা চিহ্নিত] এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এটা চলন্ত থাকে। অপর আরেক পরিবর্তনশীল গতিসম্পন্ন একটি মটর থাকে হাবের নীচে। সেই মটর ডিস্ককে ঘুরানোর কাজটি সারে। লেইজার সূত্রে একটি লাইট প্রদানকারী ডাইওড [LED] আছে। এর কাজ হলো, একটি সূক্ষ্ম লেইজার অংশুজাল সৃষ্টি করা। এই অংশুজালকে একটি **'লেন্স'** [lens -চিত্রে সংখ্যা ৫] দ্বারা ফোকাস করা হয়। লেইজারের ক্ষমতাকে বিভিন্ন লেবেলে নিয়ে ড্রাইভ দ্বারা তথ্যাদি **'পড়া'** [যার জন্য প্রয়োজন নিম্ন লেবেলের পাওয়ার সেটিং] এবং **'লেখা'** [যার জন্য দরকার উচ্চ পাওয়ার সেটিং] সম্ভব হয়।

এখন, ডিস্ক তো আপনারা সবাই দেখেছেন। এটি কিসের তৈরী? প্রথমত **'পলিকার্বোনেট'** [polycarbonate -চিত্রে সংখ্যা ৬ দ্বারা চিহ্নিত] নামক শক্ত প্লাস্টিক দ্বারা এটি তৈরী করা হয়। ডিস্কের যেদিকে তথ্য সংরক্ষণ হবে তা আমাদের চোখে খুব মসৃণ মনে হলেও, আসলে তাতে আছে অতি ক্ষুদ্রকায় অসংখ্য **'পিট'** [pits -চিত্রে সংখ্যা ৭]। এসব গর্তই তথ্য। ঠিক আগের যুগের লং প্লে রেকর্ডের মতো এগুলো খোদাই করা থাকে চক্রাকারে। এখানে উল্লেখ্য

যে, একই উপায়ে **‘ডিভিডি রম’** [DVD ROM] তৈরী হয়ে থাকে। কিন্তু তাদের গর্ত অনেকটা বেশী জড়ানো তাই তাতে সংরক্ষণ হয় অনেক বেশী পরিমাণ তথ্য। পলিকার্বোনেট সারফেসের উপর অতি পাতলা আরেকটি লেপ আছে। এ লেপ হতে হবে প্রতিবিম্ব গুণসম্পন্ন- তাই একে বলে **‘রিফ্লেক্টিব মেটেরিয়েল’** [reflective material - চিত্রে সংখ্যা ৮ দ্বারা চিহ্নিত]। সাধারণত এটি এলুমিনিয়াম, রূপা কিংবা স্বর্ণের তৈরী হয়ে থাকে। এর উপরে আরেকটি **‘প্রটেক্টিভ কোটিং’** [protective coating -চিত্রে সংখ্যা ৯] ও **‘লেবেল সারফেস’** [label surface - চিত্রে সংখ্যা ১০] দেওয়া হয়।

ডিস্ক থেকে তথ্য **‘পড়া’** [read]- এর অর্থ হলো লেইজার বীম ডিস্কের উপরিভাগে পতিত হয়ে ফিরে আসা। কিন্তু যদি এই আলোকরশ্মি মসৃণ অংশ তথা **‘ল্যান্ড’** [land -চিত্রে সংখ্যা **১১** দ্বারা চিহ্নিত] এর মধ্য থেকে ফিরে আসে তাহলে তা থাকবে সম্পূর্ণ পরিষ্কার ও অপরিবর্তিত। অপরদিকে তা যদি কোন **‘পিট’** [pit] বা গর্তে পড়ে তাহলে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বে। সুতরাং এভাবেই ড্রাইভের ইলেকট্রনিক্স এই **‘পিট-বনাম-ল্যাংড’** তথ্যকে বাইনারি কোডে [০ ও ১ হলো বাইনারি কোড - কম্পিউটার এ দু’টি সংখ্যা বুঝে যথাক্রমে সূইচ ‘অন’ বা ‘অফ’ হিসাবে] রূপান্তর করে দেয়।

শিক্ষার্থীরা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, তথ্য **‘লেখা’** মানে ঐ গর্তগুলো লেইজার আলোকরশ্মি দ্বারা তৈরীর নামান্তর। যে মুহূর্তে আপনি একটি ডিস্ক ড্রাইভে ঢুকাবেন, সাথে সাথে ড্রাইভের সফ্টওয়্যার ডিস্কের ধরন সনাক্ত করবে। যদি এটা তথ্যশূন্য লেখার যোগ্য ডিস্ক হয় তাহলে লেইজার দ্বারা লেখার জন্য তা প্রস্তুত হবে। অপরদিকে যদি ডিস্কটিতে লেখা তথ্যাদি থাকে তাহলে তা ব্যবহারের জন্য আপনি কপি করে কম্পিউটারে নিয়ে আসতে পারেন কিংবা সরাসরি তা **‘চালনা’** [run] করতেও পারবেন।

৯. মডেম

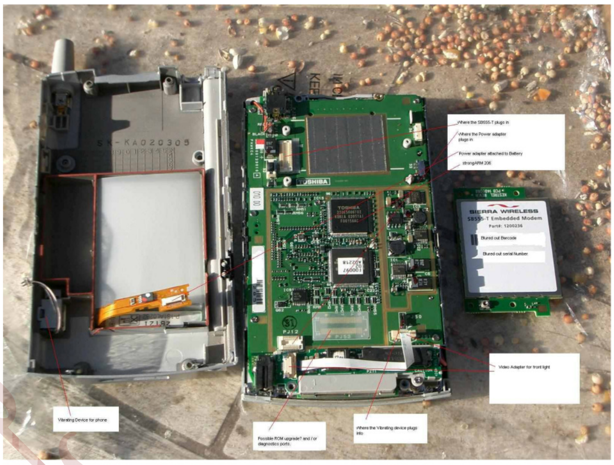
আপনারা সবাই নিশ্চয়ই **‘মডেম’** [modem] কী তা জানেন। ইংরেজী ‘modem’ শব্দটি মূলত দু’টি শব্দের সমন্বয়ে গঠিতঃ modulate এবং demodulate। মডেমের কাজ ইন্টারনেটের সঙ্গে আপনার কম্পিউটারকে যুক্ত করা। ইন্টারনেটে যে তথ্য-সিগনাল থাকে তা আপনার **‘ডিজিটেল’** কম্পিউটার সরাসরি বুঝতে পারে না। অপরদিকে আপনার পাঠানো কোনো **‘ডিজিটেল’** সিগনাল ইন্টারনেটে যেয়ে পৌঁছবে না যদি না তা প্রথমে Analog সিগনালে পরিবর্তন করা না হয়। সুতরাং ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত সিগনালকে ধরে তা **‘ডিজিটেল’** [digital] সিগনালে পরিবর্তন করা এবং কম্পিউটার থেকে ডিজিটেল সিগনালকে **‘এ্যানালগ’** [analog] সিগনালে পরিবর্তন করে তা পাঠানো হলো মডেমের কাজ।



প্রত্যেক কম্পিউটারে হয় অভ্যন্তরীণ না হয় বহিঃস্থ একটি মডেম থাকতে হবে ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্য। আজকাল প্রায় সব কম্পিউটারের অভ্যন্তরে মডেম যুক্ত থাকে। তবে কোনো টাওয়ার সিস্টেমে এখনও বহিঃস্থ মডেম যুক্ত থাকতে দেখা যায়। যাক, মডেম সম্পর্কে আর বেশী কিছু বলার নেই। শুধু এটুকু পুনর্বার ব্যক্ত করবো, মডেম হলো ইন্টারনেটের সঙ্গে যে কোনো কম্পিউটার যুক্ত করার মাধ্যম। ল্যান্ড টেলিফোন বা মোবাইল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে যেসব তথ্য ইন্টারনেট থেকে

আসা-যাওয়া করে তা ডিজিটেল ও এ্যানালগ সিগনালে পরিবর্তন করাই এর কাজ। আমরা এখন আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কম্পিউটার পেরিফেরল নিয়ে আলোচনা করবো। এ যন্ত্রের নাম স্কানার।





১০. স্কানার

স্কানার [scanner] হলো ওসব হার্ডওয়্যার পেরিফেরল যার মাধ্যমে কাগজে ছাপাকৃত ছবি, লেখা ইত্যাদি চিত্র হিসাবে কম্পিউটারে নিয়ে যাওয়া হয়। কম্পিউটারে যে স্কানার ব্যবহৃত হয় তার নাম **'ফ্ল্যাটবেড স্কানার'** [flatbed scanner]। নিম্নে এরূপ একটি স্কানারের ছবি দিয়েছি।



ফ্ল্যাটবেড স্কানারের কয়েকটি অংশ আছে: **১. গ্লাস [glass], ২. আলোকসূত্র [light-source], ৩. সেন্সর [sensor]** ও **৪. ক্যারিয়ার [carrier]**। আমরা একে একে এগুলো উপর আলোচনা করবো।

১. গ্লাস [glass]: ফ্ল্যাটবেড স্কানারের প্রথম উপাদান এটি। স্কানার খুলে এই কাচের উপর উপুড় করে ডকুমেন্ট রাখতে হবে। স্কানার ভেতর থেকে আলোকরশ্মি দ্বারা কাগজের চিত্র-লেখার ছবি প্রতিবিম্ব করে নিয়ে যায়। সুতরাং কাচের মান যতো ভালো হবে স্কানকরা ডকুমেন্টের ছবিও ততো উন্নত হবে।

২. আলোকসূত্র [light-source]: লাইট-এমিটিং ডাইওড বা এলইডি [LED] সম্পর্কে আমরা ইতোমধ্যে আলোচনা করেছি। অধিকাংশ স্কানারের আলোকসূত্র মূলত এলইডি। তবে কিছু স্কানারে ফ্লুরোসেন্ট [fluorescent] বাল্বও ব্যবহৃত হয়। আমরা এরূপ আলোক সম্পর্কেও ইতোমধ্যে আলোচনা করেছি। স্কানারের ভেতরে **'ভল্টেজ রেগুলেটর'** [voltage regulator] বা ভল্টেজ নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা আছে। ফলে স্কানের সময় আলোকরশ্মির সামঞ্জস্যতা ও মাত্রা সঠিক থাকে।

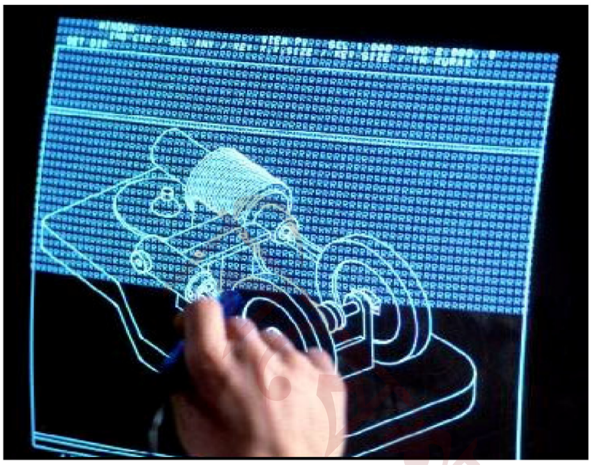
৩. সেন্সর [sensor]: আলোক রশ্মি দ্বারা ছবি প্রতিবিম্ব হয় ডকুমেন্ট থেকে। এই প্রতিবিম্বিত ছবি **'পড়তে'** হবে। অন্য কথায় আলো-আঁধারকে সনাক্ত করে কম্পিউটারে প্রেরণের দরকার। যে যন্ত্রের মাধ্যমে এই কাজটি আঞ্জাম দেওয়া হয় তার নাম **'চার্জ কাপ্ল্ড ডিভাইস'** [charge coupled device -CCD]। এ যন্ত্রটির উপরও আমরা ইতোমধ্যে অন্যত্র আলোচনা করেছি। এ যন্ত্রের মূল কাজ হলো প্রাপ্ত **'এ্যানালগ'** [analog] আলোক সিগনালকে **'ডিজিটেল'** [digital] সিগনালে রূপান্তর করা। রঙিন স্কানারে থাকে তিন সারিসর্বস্ব সিসিডি। একটি লাল, আরেকটি নীল ও অপরটি সবুজ রঙকে ডিজিটেল সিগনালে পরিণত করে। এ পর্যন্ত যা বললাম তাহলো, কাচের উপর রেখে আলোকরশ্মি দ্বারা ছবির প্রতিবিম্ব সিসিডিতে নিয়ে তা কম্পিউটারে বুঝে এরূপ সিগনালে তথা **'ডিজিটেল'** তথ্যে রূপান্তর। এবার এই তথ্য কম্পিউটারে যেতে হবে।

৪. ক্যারিয়ার [carrier]: একটি মটর দ্বারা সেন্সর ও লাইটসূত্র ক্যারি করতে হবে। এই ক্যারিয়ারের কাজ হলো স্কানারের পুরো দৈর্ঘ্য পর্যন্ত উভয় বস্তুকে [অর্থাৎ সেন্সর ও লাইটসূত্রকে] ধীরে ধীরে চলন্ত রাখা।

স্কান ছবি কম্পিউটারে প্রেরণ: উপরোক্ত উপায়ে ডকুমেন্ট স্কান হওয়ার পর সিসিডি যন্ত্র তা ডিজিটেল সিগনালে পরিবর্তন করে পাঠিয়ে দেবে কম্পিউটারে। আজকাল ইউএসবি [USB] তারের সংযুক্তির মাধ্যমে এ কাজটি হয়ে থাকে। স্কানকৃত ছবি [বা ডকুমেন্ট] সাধারণত স্কানারের সাথে যে **'সফ্টওয়্যার'** [software] আসে তার দ্বারা প্রসেস শেষে কম্পিউটারের স্ক্রীনে প্রদর্শন করা হয়। এরপর একে আপনি সেইভ করে রাখতে পারেন। অধিকাংশ স্কানারের সাথে **'অপটিকেল ক্যারাক্টার রিকোগনিশন -অসিআর'** [optical character recognition] সফ্টওয়্যার আসে। এই সফ্টওয়্যারের কাজ হলো, ডকুমেন্টে [ইংরেজী] লেখাটুকু ফন্টে পরিণত করা। অর্থাৎ ছবিকে ফন্টে পরিণত করা যাতে করে তা কোনো ওয়ার্ড প্রসেসরে নিয়ে এডিট বা সম্পাদন করা সম্ভব হয়। গুরুত্বপূর্ণ এই সফ্টওয়্যার উদ্ভাবনের ফলে ইংরেজী ও বাংলা ছাড়া আরো বিভিন্ন ভাষায় লিখিত বই-পুস্তক ইত্যাদির লেখা টাইপ করার প্রয়োজন পড়ে না। এখনো বাংলা ভাষায় অসিআর সফ্টওয়্যার হয়েছে বলে আমার জানা নাই। যারা সফ্টওয়্যার তৈরি করের তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এ ব্যাপারে রিসার্চ করার জন্য। পৃথিবীর প্রায় সব ভাষায় অসিআর টেকনোলজি আছে। বাংলায়ও তা করা সম্ভব বলে আমি মনে করি।

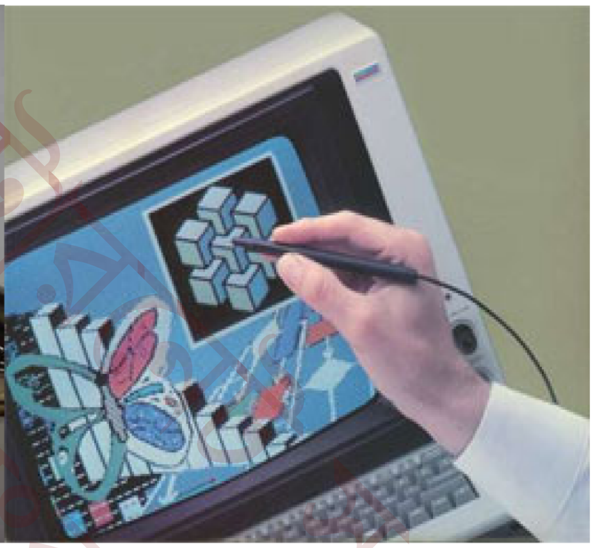
১১. লাইট পেন

লাইট পেন [light pen] একটি কম্পিউটার ইনপুট [input] যন্ত্র। অর্থাৎ এই পেরিফেরল দ্বারা কম্পিউটারে তথ্য প্রেরণ করা হয়। আমরা ইতোমধ্যে বেশ ক'টি ইনপুট যন্ত্রের উপর আলোচনা করেছি। এগুলো প্রায় সকলেই ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু লাইট পেনের ব্যবহার সচরাচর দেখা যায় না। এরপরও এই যন্ত্রটির গুরুত্ব অপরিসীম। বিশেষ করে **'কম্পিউটার এইডেড ডিজাইন'** [computer aided design - CAD] এর ক্ষেত্রে লাইট পেন দ্বারা সরাসরি স্ক্রীনের মধ্যে চিত্রাঙ্কন একান্ত উপকারী। এটি দ্বারা আপনি স্ক্রীনের যে কেনো বস্তুকে **'ধরা'** কিংবা অঙ্কন করতেও পারেন। নীচের চিত্রটি দেখুন। যন্ত্রটি **'টাচ্ স্ক্রীন'** [touch screen] প্রযুক্তির মতো কাজ করে। তবে এটা কোনো বস্তুকে নির্দিষ্ট করে ধরা বা ছবি আঁকার ক্ষেত্রে অনেক বেশী সঠিক।



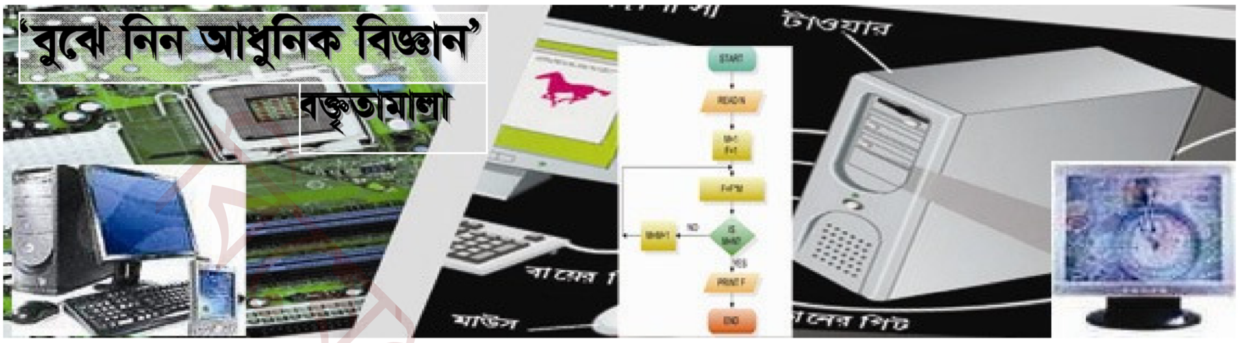
লাইট পেন স্ক্রীনের আলোকরশ্মি রদবদলকে সনাক্তকরণের মাধ্যমে কাজ করে। স্ক্রীনের আলোকরশ্মির মধ্যে সর্বদাই দ্রুত গতিতে ঔজ্জ্বল্যতার পরিবর্তন ঘটে থাকে- যা আমাদের চোখে ধরা দেয় না। বাস্তবে এরূপ রদবদলের মাধ্যমেই স্ক্রীনে বিভিন্ন বস্তু দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। লাইট পেন এই রদবদল থেকে যে তথ্য সংগ্রহ করে তা-ই নির্ধারণ করে স্ক্রীনের কোন পয়েন্টে এটা যে কোনো মুহূর্তে অবস্থান করছে। নীচে আমরা লাইট পেনের ব্যবহারের আরেকটি চিত্র তুলে ধরলাম।

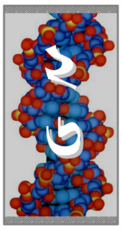




আলহামদুলিল্লাহ! শিক্ষার্থী ক্ষুদে বিজ্ঞানীরা! কম্পিউটার প্রযুক্তির উপর দু'টি অংশের প্রথমটি তথা **'হার্ডওয়্যার'** [hardware] এর উপর আলোচনা শেষ করে নিয়েছি। কিন্তু একটি কম্পিউটার শুধু হার্ডওয়্যার নিয়ে কার্যকর নয়। কম্পিউটারের তরল যন্ত্রাংশ বা **'সফ্‌টওয়্যার'** [software] ছাড়া ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রাদিসর্বস্ব যাবতীয় হার্ডওয়্যার সম্পূর্ণ অর্থহীন ও অকেজো। আমরা আজকের লেকচারের ইতি টানছি এক্ষুণি। তবে আগামী একাধিক লেকচারের ফোকাস থাকবে কম্পিউটারের এই তরল যন্ত্রাংশ নিয়ে।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম





বক্তা: ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী, নেশন্যাল ডিপ্লোমা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ইংল্যান্ড।

স্থান: খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সুবিদ বাজার, সিলেট।

ঘ. বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক বিজ্ঞান

বক্তৃতা ২৬ : আধুনিক প্রযুক্তি

১০. ব্যক্তিগত কম্পিউটার [পিসি]

১০.গ. কম্পিউটারের তরল যন্ত্রাংশ: সফ্টওয়্যার [software]

'বুঝে নিন আধুনিক বিজ্ঞান' শীর্ষক বক্তৃতামালার ২৬তম সংযোজনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। গেল বেশ ক'টি লেকচার হয়েছে আধুনিক যুগের সর্বাপেক্ষা অত্যাশ্চর্য ও গুরুত্বহ প্রযৌক্তিক মার্বেল **'কম্পিউটার'** নিয়ে। আজকের লেকচারও এই যন্ত্রের উপর। ইতোমধ্যে আমরা কম্পিউটারের কঠিন যন্ত্রাংশ বা হার্ডওয়্যার [hardware] সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এবার তথ্য তুলে ধরছি দ্বিতীয় অংশ সফ্টওয়্যার সম্পর্কে।

১. কম্পিউটারের ভাষা

আমরা সবাই একে অন্যের সঙ্গে মনের খিয়াল বা ভাবকে সেয়ার করি ভাষার মাধ্যমে। অনুরূপ কম্পিউটারের সঙ্গে ইন্টারেকশন বা যোগাযোগ সৃষ্টির উপায় হিসাবে বিজ্ঞানীরা একাধিক **'সফ্টওয়্যার ল্যাঙ্গুয়েজ'** [software language] উদ্ভাবন করেছেন। তবে কম্পিউটার একটি মাত্র ভাষা বুঝে- তাহলো **'মেশিন ল্যাংগুয়েজ'** [machine language]। আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন, কম্পিউটার একটি **'ইলেকট্রনিক মেশিন'** [electronic machine] মাত্র। সত্যিকার অর্থে এর ভেতরের মূল যন্ত্রাংশ **'সেন্ট্রেল প্রসেসিং ইউনিট'** [central processing unit -CPU] তৈরি হয়েছে লক্ষ লক্ষ **'ট্রানজিস্টার'** [transistor] দ্বারা। এগুলো আসলে একেকটি ইলেকট্রিক সুইচ। এসব সুইচ

হয় **‘অন’** না হয় **‘অফ’** থাকবে। অন অবস্থাকে সংখ্যা **‘১’** এবং অফ অবস্থাকে সংখ্যা **‘০’** দ্বারা সম্বোধন করা হয়। এই দু’টি মাত্র সংখ্যাকে ছোট্ট থেকে অতি দীর্ঘ মিশ্রণ [combination] দ্বারা যে কোন লেখা, গ্রাফিক্স, ট্যাক্স, সংখ্যা ইত্যাদি সবকিছু **‘রেপ্রেজেন্ট’** [represent] করা যেতে পারে। সিপিইউ এর **‘এ্যারিথমেটিক এন্ড লজিক ইউনিট’** [arithmetic and logic unit -ALU] প্রোগ্রাম দ্বারা প্রেরিত **‘ইন্সট্রাকশন’** [instruction] বা নির্দেশনা মুতাবিক **‘বুলিয়ান আলজেবরা’** [Boolean algebra] নামক একটি **‘লজিক্যাল মেথেমেটিক্স’** [logical mathematics] ব্যবহার করে ফলাফল সে-ই বাইনারি সংখ্যায় দিয়ে থাকে। সুতরাং আমরা সফ্টওয়্যারের মাধ্যমে কাজ সারার জন্য নির্দেশনা দিলাম একভাবে এবং তা প্রসেস হয়ে বেরিয়ে আসলো অন্যভাবে। এই উভয় **‘ভাব’** কিন্তু বাইনারি কোডে ভেতরে যাবে ও ফিরে আসবে। কম্পিউটার বিজ্ঞানীরা বাইনারি কোডে রূপান্তরের জন্য সফ্টওয়্যার তৈরি করেছেন। আমাদের বোধগম্য এসব সফ্টওয়্যারের মূলে একটি **‘ইন্টারপ্রিটার’** [interpreter] কিংবা **‘কম্পাইলার’** [compiler] থাকে। এদের কাজ হলো বোধগম্য প্রোগ্রামকে বাইনারি বা মেশিন কোডে রূপান্তর করা যাতেকরে তা কম্পিউটারের জন্য বোধগম্য হয়ে ওঠে।

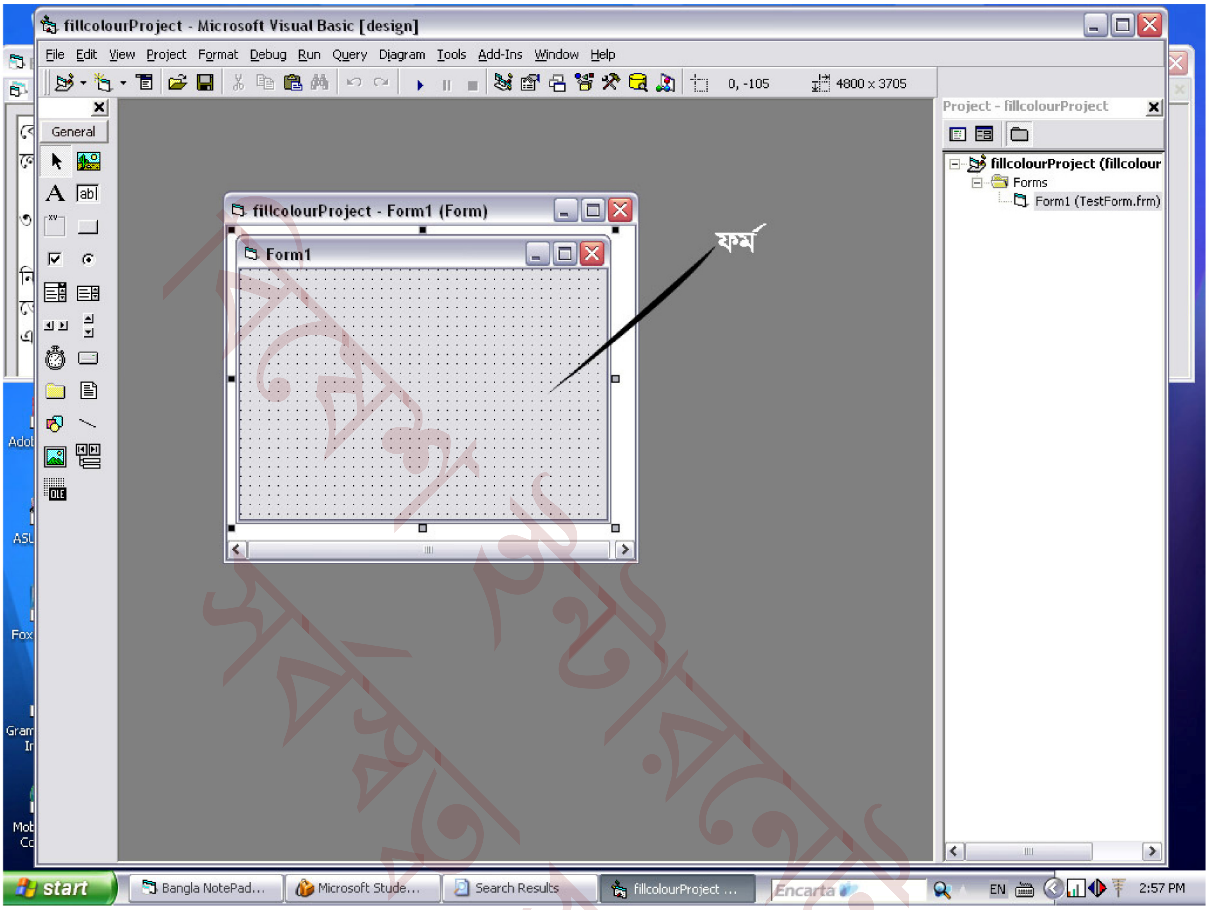
কম্পিউটার বিজ্ঞানীরা বেশ কয়েকটি **‘প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ’** [programming language] সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্যে **‘বেসিক’** [BASIC], **‘সি’** [C] এবং **‘পাসকাল’** [PASCAL] ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। প্রোগ্রামিং ভাষা হতে পারে **‘লো লেবেল’** [low-level] কিংবা **‘হাই লেবেল’** [high-level]। নিম্ন লেবেলের ভাষাকে বলে **‘মেশিন ল্যাংগুয়েজ’** [machine language]। এ ভাষায় সবাই লিখতে পারেন না- এটা কঠিন। তবে উচ্চ স্তরের ভাষা শিখা ও লেখা অনেকটা সহজ। অবশ্য কম্পাইলার ও ইন্টারপ্রিটার ছাড়া উচ্চ স্তরের ভাষা কম্পিউটার বুঝবে না। কম্পিউটারের সফ্টওয়্যার সম্পর্কে এসব প্রাথমিক সংজ্ঞা প্রদানের পর এবার আমরা বিভিন্ন ভাষা নিয়ে আলোচনায় যেতে পারি।

২. মেশিন ল্যাংগুয়েজ [machine language]

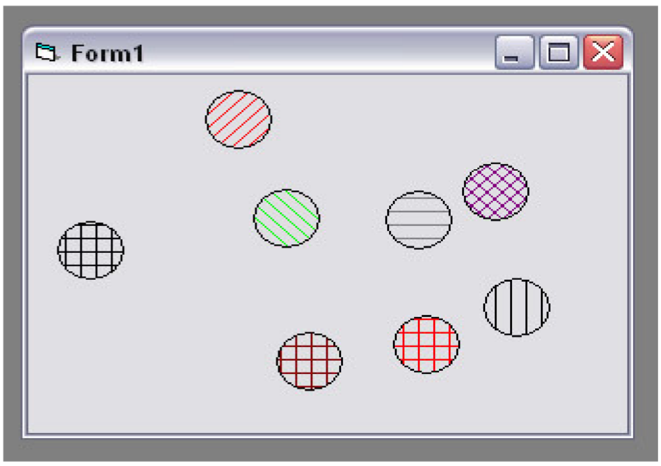
মেশিন ভাষায় নির্দেশনা লেখা হয় ১ কিংবা ০ সংখ্যা দ্বারা। এগুলোকে **‘বিট’** [bit] বলে। আগেই বলেছি এরূপ বাইনারি সংখ্যা কম্পিউটার যথাক্রমে **‘অন’** ও **‘অফ’** হিসাবে সরাসরি বুঝতে সক্ষম হয়। মেশিন ভাষায় নির্দেশনার মধ্যে মৌলিক চারটি বিষয় আছে: ক. কম্পিউটারের **‘র‌্যাম’** [RAM]-এ সংরক্ষিত তথ্য ঠিক কোথায় আছে তা নির্দিষ্ট করা। খ. এই তথ্যের উপর অঙ্ক কষা যেমন, যোগ, বিয়োগ ইত্যাদি। গ. ফলাফল মূল সংরক্ষণ অংশের কোথায় রাখা হবে। ঘ. পরবর্তী নির্দেশ কোথায় পাওয়া যাবে তা জানা। মেশিন কোডে আজকাল খুব অল্পই সফ্টওয়্যার লেখা হয়ে থাকে। এর মূল কারণ হলো, কাঠিন্যতা। যেমন এই কোডটি দেখুন: ১০০১০ ১১০০ ১০১১ - এর অর্থ রেজিস্টার **‘A’** ও **‘B’**-তে সংরক্ষিত তথ্য যোগ করো।

৩. উচ্চ লেবেল ভাষা [high-level language]

আমাদের বোধগম্য এসব ভাষায় অধিকাংশ সফ্টওয়্যার তৈরি হয়। মাইক্রসফ্টের **‘ভিজ্যুয়েল বেসিক’** [Visual Basic] একটি উচ্চ লেবেল জনপ্রিয় ভাষা। নিম্নে [আমার নিজের লিখিত] এ ভাষার একটি অতি সাধারণ **‘সফ্টওয়্যার প্রোগ্রাম’** এর একাংশ নিয়ে কিছুটা তথ্য তুলে ধরছি। আশাকরি এ থেকে শিক্ষার্থীরা বুঝতে সক্ষম হবেন **‘সফ্টওয়্যার’** বলতে কি বুঝায় এবং কিভাবে তা উদ্ভাবন হয়।



উপরের ছবিতে মাইক্রসফটের ভিজ্যুয়েল বেসিক আইডিই [Integrated development environment - IDE] দেখাচ্ছে। সেখানে একটি **'ফর্ম'** [form] আছে। এই ফর্ম যখন **'রান'** [run] করা হবে তখন আমরা স্ক্রীনে যা দেখবো তার একটি ছবি নীচে দিয়েছি। এতে আছে কয়েকটি ভিন্ন রঙের বৃত্ত। ফর্মের যে কোনো স্থানে মাউস দ্বারা ক্লিক করলেই এসব বৃত্ত অঙ্কিত হবে। এই প্রোগ্রামের কাজই এটা- ভিন্ন রঙের ছোট ছোট বৃত্ত আঁকা প্রতিটি মাউস ক্লিকের সঙ্গে।



ঠিক কিভাবে এই প্রোগ্রামটা করলাম? নিম্নে মূল প্রোগ্রামটি তুলে ধরেছি। চলন্ত থাকাবস্থায় ফর্মের উপর মাউস দ্বারা ক্লিকের অপেক্ষায় থাকে প্রোগ্রামটি। যে মুহূর্তে ক্লিক পড়বে ফর্মের যে কোন স্থানে সাথে সাথে সেখানে একটি বৃত্ত অঙ্কিত হবে। এবার প্রোগ্রামের প্রতিটি লাইন বুঝিয়ে বলছি। আশা করি এ থেকে সকলেই প্রোগ্রামের কার্যকারিতা সম্পর্কে অনেকটা ওয়াকিফহাল হবেন।

```
Private Sub Form_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
  FillColor = QBColor(Int(Rnd * 15))   ' Choose random FillColor.
  FillStyle = Int(Rnd * 8)   ' Choose random FillStyle.
  Circle (X, Y), 250   ' Draw a circle.
End Sub
```

উপরের প্রোগ্রাম কোডটি ফর্মের **'মাউসডাউন ইভেন্ট'** [mouseDown Event] অংশে লেখা থাকতে হবে। মাউসডাউন অর্থ ফর্মের কোথাও মাউসকে ক্লিক করার মুহূর্ত। অপারেটিং সিস্টেম সেই মুহূর্তে একটি **'মাউসডাউন'** [MouseDown] ঘটনা [event] প্রেরণ করে কম্পিউটারের অভ্যন্তরে। এই ঘটনাকে আমরা প্রোগ্রামের মাধ্যমে **'ধরে'** নিজেদের ইচ্ছে-মাফিক কাজ করাতে পারি। সুতরাং প্রথম লাইন: Private Sub Form_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single) - এর অর্থ হলো মাউসডাউন ইভেন্টকে ধরা। এবার আমরা কাজ করতে পারি।

আমরা প্রথমেই বলছি: FillColor = QBColor(Int(Rnd * 15))- এর অর্থ বৃত্তের অভ্যন্তরে কোন্ রঙ হবে তা অনির্দিষ্টভাবে [randomly] নির্ধারণ করা। সমীকরণ চিহ্নের বায়ের দিকের কথাটি [FillColor] মূলত ভিজ্যুয়েল বেসিক ভাষার একটি মৌলিক নির্দেশ। এর দ্বারা এটাই বলা হচ্ছে বৃত্তের রঙ এতে সংরক্ষিত তথ্য দ্বারা পরিপূর্ণ করা হবে। সমীকরণ সাইনের ডান দিকের অংশ এই রঙের তথ্য দেবে।

পরবর্তী লাইনে লিখা আছে: FillStyle = Int(Rnd * 8) - এর অর্থও প্রথম লাইনের অনুরূপ। এখানে সমীকরণের বায়ের কথাটি [FillStyle] দ্বারা বুঝানো হচ্ছে কোন্ স্টাইলে রঙটি অঙ্কিত হবে। এ শব্দটিও ভিজ্যুয়েল বেসিকের মৌলিক ভাষার মধ্যে একটি।

তৃতীয় লাইনে লিখা আছে: Circle (X, Y), 350। এর প্রথম শব্দ [Circle] দ্বারা বলা হচ্ছে একটি বৃত্ত আঁকতে যার আয়তন হবে ৩৫০ পিক্সেল। এখানে লক্ষ্য করুন (X,Y) দ্বারা বুঝানো হচ্ছে বৃত্তের স্থান। যে জায়গায় ক্লিক করা হবে সেটাই এই স্থান। এটাকে ইংরেজীতে **'কো-অরডিনেট সিস্টেম'** [co-ordinate system] বলে। **'X'** অর্থ স্ক্রীনের [বা জানালার] সর্বশেষ পয়েন্ট বা শূন্য থেকে কতটি পিক্সেল ডানে ঐ পয়েন্টটি আছে তা-ই বুঝাচ্ছে। অর্থাৎ ক্লিক যে স্থানে করা হচ্ছে তার **'X'**-পজিশন নির্দিষ্টকরণ। অনুরূপ স্ক্রীনের [বা জানালার] উপর থেকে কত পিক্সেল দূরে ক্লিকের স্থানটি আছে তা-ই হলো **Y**-পজিশন। সুতরাং ক্লিক করলেই কম্পিউটার উক্ত কোডের মাধ্যমে ঠিক যে স্থানে বৃত্তের কেন্দ্র হবে তা জেনে নেবে ও সাথে সাথে **'Circle'** অঙ্কন করবে। এভাবে যতোবারই ক্লিক করা হবে জানালার ভেতর ততোবারই ঐ স্থানে বৃত্ত অঙ্কিত হবে।

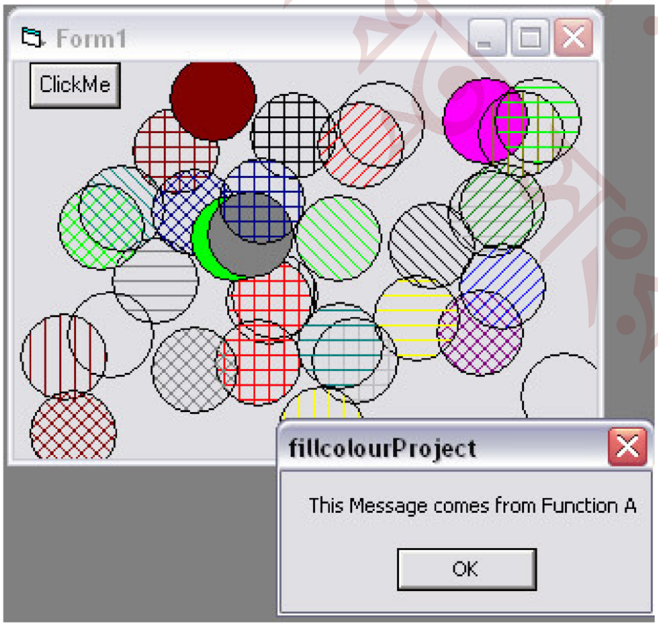
প্রোগ্রামটি অনির্দিষ্ট কালের জন্য চলতে থাকবে। অবশ্যই প্রতিটি ক্লিক ইভেন্টের কাজ শেষ হয়েছে বলে নির্দেশ দিতে হবে। এটা করা হয় শেষের লাইন: End Sub - দ্বারা। লক্ষ্য করুন আমরা শুরু করেছি: Private Sub- লিখে। এখানে **'Sub'** শব্দটির অর্থ **'Subroutine'**। এটা হলো প্রত্যেক প্রোগ্রামের আলাদা এককে অংশের নাম। অন্য আরেক নামেও অংশ আছে। একে বলে **'ফাংশন'** [function]। সাবরুটিন দ্বারা কিছু বিশেষ কাজ আঞ্জাম দেওয়া হয়- যেমনটি আমরা উপরে দেখেছি। অপরদিকে ফাংশন কোন একটা ভেল্যু [ফলাফল] দেয় মাত্র। সাবরুটিন থেকে ফাংশনকে **'কল'** [call] করতে হয়। যেমন, আমরা **'ক্লিকমি'** [ClickMe] নামক একটি ছোট্ট বোতাম ফর্মের মধ্যে যোগ করলাম ও এর **'ক্লিক ইভেন্ট'** [click event] কোডটিতে লিখলাম:

```
Private Sub Command1_Click()
   A 'call the Function Named A
End Sub
```

উপরোক্ত সাবরুটিন দ্বারা এটাই বুঝাচ্ছে যে, বোতামে ক্লিক করলেই ‘A’ নামক একটি **‘ফাংশন’** [function] আছে সেখানে লাফ মারো। এই ফাংশনটি কোড লেখার ট্যাক্স এডিটরে যে কোন স্থানে লিখা যায়। কোডটি এই [অবশ্য ইচ্ছে মাফিক যে কোন কোড লিখা যাবে]:

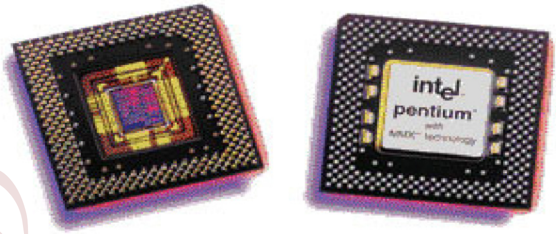
```
Function A()
    MsgBox ("This Message comes from Function A")
End Function
```

লক্ষ্য করুন, ক্লিক ইভেন্টের কোড থেকে এখানে লাফ মেরে মেসেজ বক্স প্রদর্শন করা হবে। কারণ আমরা এই ফাংশন কল দ্বারা তা-ই প্রদর্শনের কোড লিখেছি। এরপর ‘End Function’ লাইন ফাংশনের কাজ শেষ করে ফিরে যাবে ক্লিক ইভেন্ট সাবরুটিনে। এদিকে ম্যাসেজ বাক্সে ‘OK’ বোতামে চাপ না দেওয়া পর্যন্ত তা বন্ধ হবে না। বন্ধ করে দিলেই কিন্তু ক্লিক ইভেন্ট সাবরুটিনের কাজ শেষ হয়ে যাবে। এরপর আমরা যদি আরেকটি ফাংশন বা সাবরুটিন তৈরি করে মূল কোডের সঙ্গে সংযুক্ত করতে চাই তা-ও পারবো। আসলে ঠিক এভাবেই বড় বড় কম্পিউটার সফ্টওয়্যার গড়ে ওঠে। এরূপ কোড করা অনেকটা সহজ। পরবর্তীতে কোড ম্যানেজ করাও বেশ সুবিধাজনক হয়। লক্ষ্য করুন সবুজ ফন্টে লেখাটুকু প্রোগ্রামের অংশ নয়। এগুলো হলো বুঝার জন্য মন্তব্য মাত্র।



যাক, উচ্চ লেবেলের কম্পিউটার প্রোগ্রাম কী তার একটু ধারণা দিলাম মাত্র। শিক্ষার্থীদের যারা ভিজ্যুয়েল বেসিক নামক জনপ্রিয় সফ্টওয়্যার তৈরির ভাষা শিখতে আগ্রহী তারা যোগাযোগ করবেন! কম্পিউটার সফ্টওয়্যার সম্পর্কে এ প্রসঙ্গে আর বেশী কিছু বলার আদৌ প্রয়োজন নেই। বিষয়টি আসলে বেশ কঠিন। সফ্টওয়্যার ইঞ্জিনিয়াররা দীর্ঘদিন পড়ালেখা করে বিষয়ের উপর অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। আমি নিজেও আসলে সফ্টওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার নয়। তবে সে-যুগে আমাদেরকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপর অধ্যয়নকালে কম্পিউটার বিজ্ঞানের উপর গবেষণা করতে হয়েছিল। ফলে এ যুগে এসেও ভিজ্যুয়েল বেসিক দ্বারা বানান পরীক্ষকসহ একটি বাংলা লেখার ওয়ার্ড প্রসেসর প্রোগ্রাম তৈরি করতে সক্ষম হয়েছি। আপনাদের সামনের এই লেকচার নোট সম্পূর্ণটাই সেই **‘বাংলা নোট্স’** নামক প্রোগ্রাম দ্বারা লিখেছি ও বানান পরীক্ষা করেছি। এছাড়া বাংলা কালক্যুলেটার, আযান ঘড়ি ইত্যাদি আরো এক দু’টো সফ্টওয়্যারও উদ্ভাবন করেছি।

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা! কম্পিউটার প্রযুক্তির ওপর আলোচনার ইতি টানবো শীঘ্রই। কম্পিউটারের মেমোরী সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য তুলে ধরা জরুরী মনে করছি। আপনারা নিশ্চয় মেগাবাইট, গিগাবাইট ইত্যাদি শুনেছেন। এগুলো আসলে কী? নিম্নের টেবিলে মেমোরী সংক্রান্ত এসব ব্যাপারে কয়েকটি টেবিল তুলে ধরলাম। এছাড়া শেষের টেবিলে পৃথিবী বিখ্যাত **‘পেন্টিয়াম প্রসেসর’** সম্পর্কিত কিছু তথ্য দিয়েছি।



Term/Byte [পদ/বাইট]	Abbreviation [শব্দসংক্ষেপ]	Value [মাত্রা]
Bit [বিট]	none [কিছুই নয়]	0 or 1 [০ বা ১]
Byte [বাইট]	B	8 [৮]
Kilo [কিলোবাইট]	K, KB	1,024 bytes [১,০২৪ বাইট]
Mega [মেগাবাইট]	M, MB, Meg	1,048,576 bytes (Million) [১০,৪৮,৫৭৬ বাইট]
Giga [গাইগা / গিগাবাইট]	G, GB, Giga	1,073,741,824 bytes (Billion) [দশ কোটি বাইট]
Tera [টেরাবাইট]	T, TB, Tera	1,099,511,628,000 bytes (Trillion) [দশ হাজার কোটি]

টেবিল -১ : যেভাবে মেমোরী মাপা হয়

উপরোক্ত টেবিলকে আরো সংক্ষেপ করে এবার লেখা যায়:

8 bits = 1 byte [৪ বিটে হয় ১ বাইট]
1000 bytes = 1 kilobyte [হাজার বাইটে হয় ১ কিলোবাইট]
1000 kilobytes = 1 megabyte [হাজার কিলোবাইটে হয় ১ মেগাবাইট]
1000 megabytes = 1 gigabyte [হাজার মেগাবাইটে হয় ১ গিগাবাইট/গাইগাবাইট]
1000 gigabytes = 1 terabyte [হাজার গিগাবাইট/গাইগাবাইটে হয় ১ টেরাবাইট]

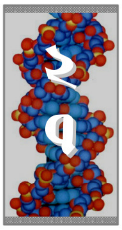
Processor [প্রসেসর]	No. of Transistors [ট্রানজিস্টার সংখ্যা]	Bus Width [বাসের ব্যাস]
80286	134,000	16 bit
80386	275,000	32 bit
80486	1,600,000	32 bit
Pentium	3,300,000	64 bit external/32 bit internal
Pentium Pro	5,500,000	64 bit
Pentium w/ MMX	4,500,000	64 bit external/32 bit internal
Pentium II	7,500,000	64 bit

টেবিল -২ : পেন্টিয়ামের বিভিন্ন প্রসেসর

প্রযুক্তির উপর আলোচনার অংশ হিসাবে কম্পিউটার বিজ্ঞানের উপর তথ্যানুসন্ধানের এখানেই শেষ। আগামী লেকচারে আমরা অন্য আরেকটি বিষয়ের উপর আলোচনা করবো। আশারাখি সকলে পরবর্তী লেকচারে উপস্থিত হবেন। আল্লাহ হাফিজ।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম





বক্তা: ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী, নেশন্যাল ডিপ্লোমা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ইংল্যান্ড।

স্থান: খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সুবিদ বাজার, সিলেট।

ঘ. বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক বিজ্ঞান

বক্তৃতা ২৭ : আধুনিক প্রযুক্তি

১১. ইন্টারনেট [internet]

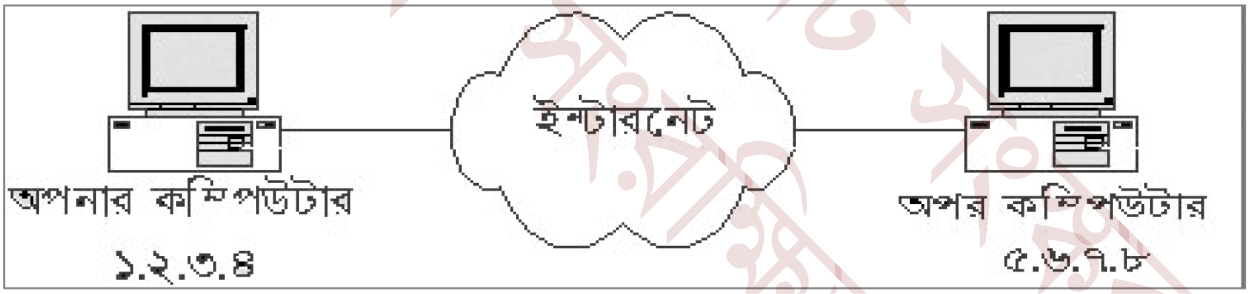
প্রিয় ছাত্রবন্ধুরা! বিজ্ঞানের নির্যাস বলে খ্যাত প্রযুক্তির উপর আলোচনা করতে যেয়ে কম্পিউটার সম্পর্কে বেশ ক'টি লেকচার উপস্থাপন করেছি। আজকের প্রযুক্তির এই অত্যাশ্চর্য যন্ত্রটির উপর আলোচনা কিন্তু সম্পূর্ণরূপে শেষ হয় নি! তথ্য প্রযুক্তির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এ যুগের মহাবিপ্লব **'ইন্টারনেট'**। আর এই তথ্যবিপ্লবের মূল যন্ত্রটি হলো কম্পিউটার যার মাধ্যমে ঘরে ঘরে খুব দ্রুত সমগ্র বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে তথ্যাদি এসে আমাদের অনুসন্ধিৎসার খোরাক দিচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। এছাড়া উন্নত থেকে উন্নতমানের মোবাইল সেটও আজকাল হয়ে ওঠেছে ইন্টারনেটের মাধ্যম। বস্তুত ঐ উন্নতমানের এ সেটও কিন্তু একটি কম্পিউটার। আজকের লেকচারে আমরা ইন্টারনেট সম্পর্কে আলোচনা করবো। আমরা জেনে নেবো কোন্ উপায়ে এটি কাজ করে।

ইন্টারনেট একটি গ্লোবাল নেটওয়ার্কের নাম [global network]। আপনার কম্পিউটার ও পৃথিবীব্যাপী কোটি কোটি অন্যান্য কম্পিউটার ইন্টারনেটের মাধ্যমে সংযুক্ত থাকে। এই সংযুক্তির ফলে আপনার কম্পিউটারের ফাইল অপরের সঙ্গে সেয়ার করতে পারেন। পাঁচ মহাদেশের যে কোনো স্থানে সংরক্ষিত তথ্য মুহূর্তে চলে আসতে পারে আপনার কম্পিউটারের স্ক্রীনে সঙ্গীত, লেখা, ভিডিও, ছবি ইত্যাদি হিসাবে। আপনি যে কোনো ফাইল কয়েক মিনিটের মধ্যে **'ডাউনলোড'** [download] করে নিয়ে আসতে পারেন আপনার কম্পিউটারে সংরক্ষণের জন্য। পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য নিউজ নেটওয়ার্ক থেকে পেতে পারেন সংবাদ যা ঘটে গেছে মাত্র মিনিট খানেক

পূর্বে। এমনকি লাইভ [সরাসরি] দেখতে পারেন আপনার ফেভারিট খেলা, টিভি রিপোর্ট, প্রোগ্রাম, সংবাদ ইত্যাদি। বিভিন্ন সর্ভারে পড়ে আছে অসংখ্য গ্রন্থাদি, অডিও-ভিডিও, প্রবন্ধ-নিবন্ধ ইত্যাদি। আপনি কয়েক মিনিটের মধ্যে পছন্দেরটি ডাউনলোড করতে পারেন নিজের কম্পিউটারে পরবর্তীতে পাঠের বা দেখার জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। মোট কথা ইন্টারনেট হলো, **'সব ধরনের মাধ্যমের এক বিশ্ব-পাঠাগার ও সংবাদ মাধ্যম'** যেখানে সংরক্ষিত আছে আপনার পছন্দসই যে কোন তথ্য। আজকের বিশ্বে ইন্টারনেটের মতো এতো শক্তিশালী মিডিয়া আর কিছু নেই। ইন্টারনেটের পাওয়ার অপরিসীম। ঠিক কিভাবে এটা কাজ করে?

১১.ক. ইন্টারনেট ঠিকানা

কম্পিউটারের পেরিফেরল নিয়ে আলোচনাকালে বলেছি, ইন্টারনেটের সঙ্গে সংযুক্তির উপায় হলো মডেম। তবে শুধু মডেম যথেষ্ট নয়। আপনি যে কোন **'ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার'** [internet service provider] থেকে নির্দিষ্টকালের জন্য ইন্টারনেট এক্সেস [internet access] প্যাকেজ কিনে নিতে হবে। আজকাল অবশ্য কোনো কোনো প্রোভাইডার যেমন মোবাইল কোম্পানি বিনামূল্যেও সার্ভিস দিয়ে থাকে। তবে মোবাইল যোগাযোগ সৃষ্টির জন্য প্রতি মিনিট কিছু টাকা কেটে নেবেই। যাক, এবার আমাদেরকে বুঝতে হবে নেটওয়ার্কে আপনার কম্পিউটারের পরিচিতি কিভাবে নিশ্চিত হয়। বাস্তবে পুরো নেটওয়ার্কে যতো কম্পিউটারই যে কোন মুহূর্তে সংযুক্ত থাক না কেনো [আর তা কোটি কোটি হতে পারে], প্রত্যেকটির একক **'ঠিকানা'** থাকা জরুরী। কম্পিউটার বিজ্ঞানীরা এই ঠিকানাকে চারটি সংখ্যা দ্বারা নির্দিষ্ট করেছেন যার প্রত্যেকটিতে আছে তিনটি পর্যন্ত ডিজিট [সংখ্যা]: এএএ.এএএ.এএএ.এএএ। প্রতিটি এএএ হতে হবে ০ থেকে ২৫৫। সুতরাং ১২৩.১৬৩.২০১.২৫৫ একটি ইন্টারনেট ঠিকানা। এই ঠিকানাকে বলে **'আইপি এডরেস'** [IP address] -এখানে আইপি অর্থ **'ইন্টারনেট প্রটোকল'** [Internet Protocol]।



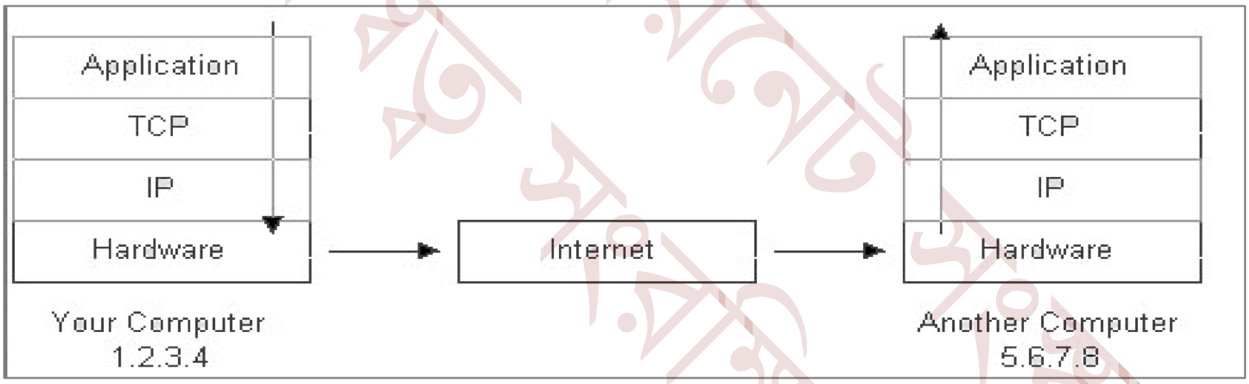
উপরের চিত্রে আপনার কম্পিউটার যার ঠিকানা ১.২.৩.৪ ইন্টারনেটের মাধ্যমে অপর কম্পিউটার যার ঠিকানা ৫.৬.৭.৮ সংযুক্ত আছে দেখিয়েছি। এখানে **'ইন্টারনেট'** অংশটি মূলত মূর্ত ধারণা মাত্র। অবশ্য পরবর্তীতে এই মূর্ত ধারণার উপর বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরবো। সাধারণত আপনি ইতোমধ্যে উল্লেখিত ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারের [ISP] মাধ্যমে ইন্টারনেটে যোগ দেবেন। প্রত্যেক-বারই আপনার কম্পিউটারকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি অস্থায়ী ঠিকানা দেওয়া হবে। এই ঠিকানা বিলুপ্ত হবে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হবার পরই।

১১.খ. প্রটোকল [protocol]

এ শব্দটি উল্লেখ করেছি ইতোমধ্যে। মনে করুন, আপনার কম্পিউটার একক ঠিকানাসহ ইন্টারনেটে সংযুক্ত আছে। এখন ঠিক কিভাবে আপনার কম্পিউটার ইন্টারনেটে সংযুক্ত অন্যান্যগুলোর সঙ্গে **'কথা বলবে'?** মনে করুন, আপনার আইপি ঠিকানা হলো, ১.২.৩.৪। আপনার ইচ্ছা হলো যে কম্পিউটারের ঠিকানা ৫.৬.৭.৮ তাতে একটি

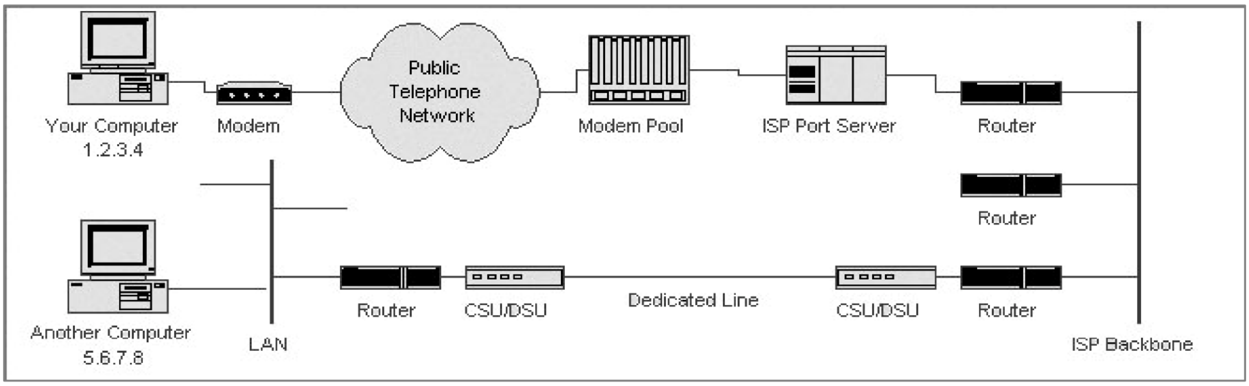
মেসেজ পাঠাবেন। আপনি বলবেন, **"হ্যালো কম্পিউটার ৫.৬.৭.৮!"** এই মেসেজটি মোবাইল কিংবা ল্যান্ড ফোনের [মডেমের] মাধ্যমে যেতে হবে। প্রথমে মেসেজকে ডিজিটেল থেকে ইলেকট্রনিক্স সিগনালে [এ্যানালগে] পরিবর্তন করা দরকার। অন্যথায় মোবাইল বা ল্যান্ড ফোনের মাধ্যমে প্রেরণ সম্ভব নয়। অপর কম্পিউটারে পৌঁছার পর তা আবার ডিজিটেল সিগনালে পরিবর্তন করতে হবে। ঠিক কিভাবে এই কাজগুলো সম্পাদন হয়? এখানেই আসে **প্রটোকল** [Protocol -চুক্তি]। প্রত্যেক কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেমে এই প্রটোকল সংরক্ষিত আছে। আপনার উইন্ডোজ সিস্টেমে এই প্রটোকল **টিসিপি/আইপি** [TCP/IP] নামে পরিচিত। এগুলো মূলত সফ্টওয়্যার। আপনার ই-মেইল, FTP, www যোগাযোগের জন্য আছে **'এপ্লিকেশন প্রটোকল'** [application protocol -AP]। পোর্ট নাম্বারের মাধ্যমে যে সফ্টওয়্যার তথ্য প্যাকেট প্রেরণ করে অপর কম্পিউটারে, তার নাম **'ট্রান্সমিশন কন্ট্রোল প্রটোকল'** [transmission control protocol -TCP]। কোনো বিশেষ কম্পিউটারে তথ্য প্রেরণ করার আরেক সফ্টওয়্যার হলো **'ইন্টারনেট প্রটোকল'** [internet protocol - IP]। সবশেষে আরেকটি হার্ডওয়্যার আছে যার কাজ বাইনারি তথ্যকে [যা আপনি কম্পিউটারের স্ক্রীনে দেখেন] মোবাইল বা ল্যান্ড টেলিফোনের মাধ্যমে প্রেরণের জন্য প্রস্তুত করা। অর্থাৎ তথ্যকে এ্যানালগ সিগনালে পরিবর্তন করে পাঠানো। এ কাজটি আঞ্জাম দেয় অবশ্য **মডেম** [Modem] নামক একটি পেরিফেরল যার উপর বিস্তারিত আলোচনা ইতোমধ্যে হয়েছে।

এখন, **'হ্যালো কম্পিউটার ৫.৬.৭.৮!'** -এ মেসেজটি ৫.৬.৭.৮ আইপি ঠিকানাসম্পন্ন কম্পিউটারে পাঠানো হবে ঠিক কিভাবে? নীচের চিত্রে এ ক্রিয়াটি তুলে ধরেছি।



১১.গ. নেটওয়ার্ক অবকাঠামো [network infrastructure]

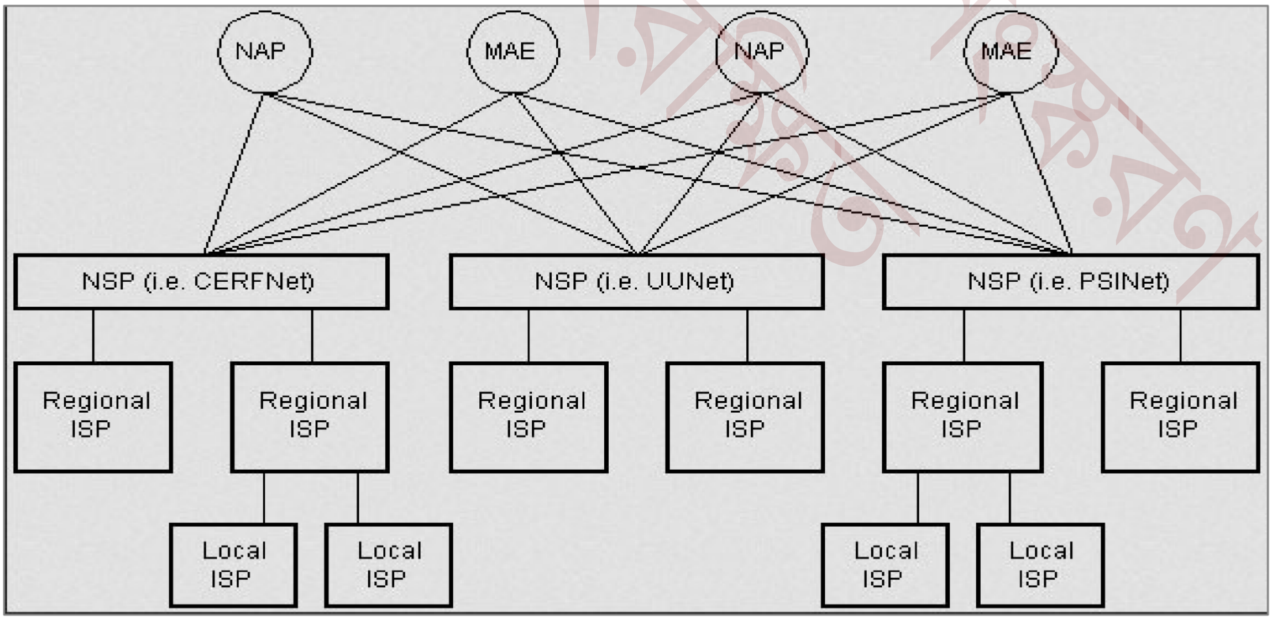
ইন্টারনেটের **'সারফার'** [surfer] আমার শ্রোতাবন্ধুরা! এখন আপনারা অবগত হলেন, তথ্য প্যাকেট কিভাবে ইন্টারনেটের মাধ্যমে অপর কম্পিউটারে যেয়ে পৌঁছে। কিন্তু মাধ্যম **'ইন্টারনেট'** আসলে কি? এখানে কী আছে? এ প্রশ্নের জবাব খুঁজতে যেয়ে আমরা আরেকটি চিত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারি:



লক্ষ্য করুণ আপনার কম্পিউটার থেকে মেসেজটি প্রথমে আপনার নিজের মডেমে যাবে। সেখান থেকে [এ্যানালগ সিগনাল হিসাবে] তা [টেলিফোন কোম্পানির মাধ্যমে] চলে যাবে আপনার সার্ভিস প্রোভাইডারের সার্ভারে [ISP port server]। আইএসপি সার্ভার অবশ্য শুধুমাত্র আপনার সিগনাল প্রসেস করবে না। একই সময় বহু সিগনাল আসবে তাই সেই সার্ভারে থাকতে হবে একাধিক মডেম [modem pool]। আইএসপি সার্ভারের আছে একটি মেরুদণ্ড [ISP backbone]। এতে অনেক পথনির্দেশক [router] আছে। এদের কাজ হলো সঠিক রাস্তায় মেসেজ পাঠানো। সঠিক রুটার আপনার মেসেজ চিহ্নিত করে অন্যান্য সার্ভার, রুটার ইত্যাদির মাধ্যমে পাঠিয়ে দেবে কাঙ্ক্ষিত [অর্থাৎ ৫.৬.৭.৮ ঠিকানাসম্পন্ন] কম্পিউটারে। এখানে খুব সহজে বিষয়টি বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। বাস্তবে ইন্টারনেট আরো জটিল ব্যাপার- তাতো সবাই বুঝতেই পারছেন! ওহ, উপরোক্ত চিত্র ‘LAN’ একটি শব্দ আছে। এর অর্থ ‘Local Area Network’। এই নেটওয়ার্কের মাধ্যমেও ইন্টারনেটে সংযুক্ত হওয়া যায়।

১১.ঘ. ইন্টারনেট অবকাঠামো [internet infrastructure]

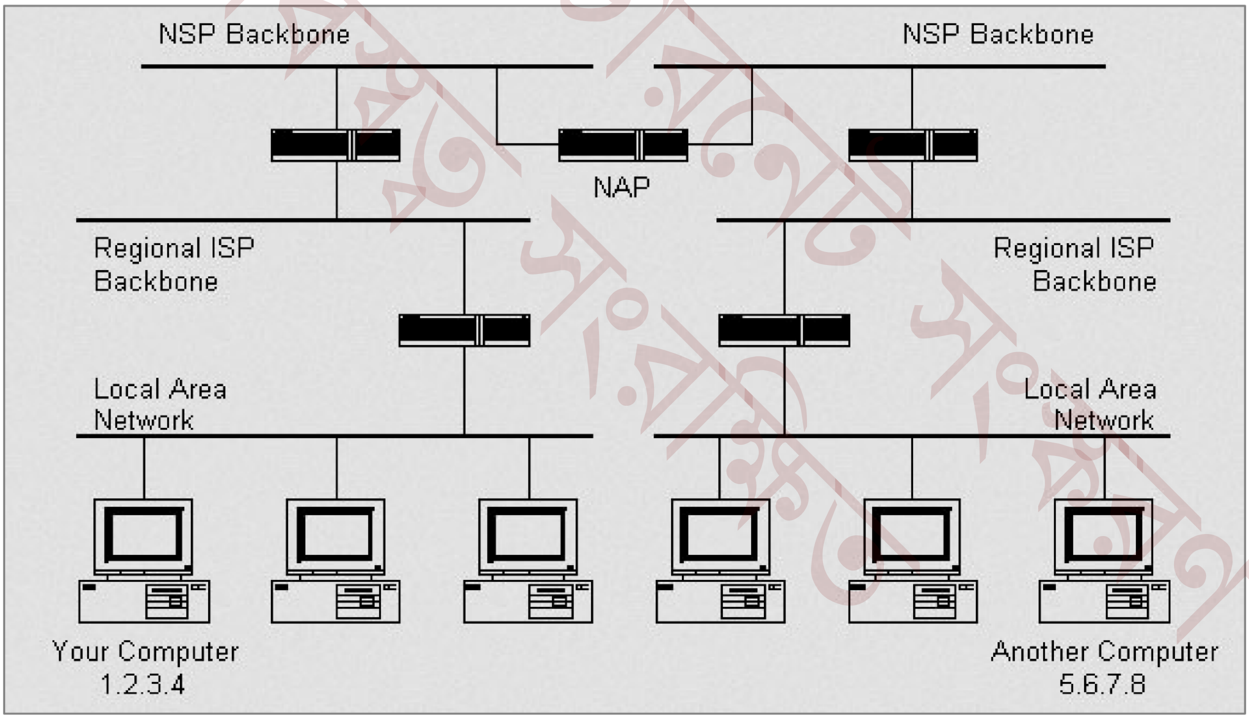
অনেক বড়ো বড়ো নেটওয়ার্কের সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে ইন্টারনেটের মেরুদণ্ড। এসব বড়ো নেটওয়ার্ক সিস্টেমকেই বলে **‘নেটওয়ার্ক সার্ভিস প্রোভাইডার্স’** [Network Service Providers]। এদের মধ্যে বড়ো ক’টি হলো ইউইউনেট [UUNET], সার্ফনেট [SERFNET], আইবিএম [IBM], বিবিএন প্লানেট [BBN Planet], স্প্রিংনেট [SPRINGNET], পিএসআইনেট [PSINET] ইত্যাদি। এগুলো একে অন্যের সঙ্গে সংযুক্ত আছে। তারা প্রতি মুহূর্তে তথ্য-প্যাকেট সেয়ার করছে। প্রত্যেক নেটওয়ার্ক সার্ভিস প্রোভাইডারকে [ISP-কে] সর্বনিম্ন ৩টি **‘নেটওয়ার্ক এক্সেস পয়েন্ট’** [Network Access Point] -এর সঙ্গে যুক্ত হতে হবে। এনএসপি আরো একটি সার্ভারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে। এই সার্ভারকে বলে **‘মেট্রোপলিটান এরিয়া এক্সেঞ্জ’** [Metropolitan Area Exchange]। এগুলো ঠিক এনএসপি এর মতোই কাজ করে, কিন্তু তা ব্যক্তি মালিকানাধীন। এভাবেই পুরো ইন্টারনেট অবকাঠামো তৈরি হয়েছে। নীচের চিত্রে বিষয়টি সহজভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।



১১.ঙ. ইন্টারনেট পথনির্দেশ উর্ধ্ব-পরম্পরা [internet routing hierarchy]

আমরা এ পর্যন্ত যা বলেছি তা থেকে ইন্টারনেটের নেটওয়ার্কটি ঠিক কিভাবে গঠিত তার ইঙ্গিত পেলাম মাত্র। আরো কিছু ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। আমাদের প্রশ্ন, ঠিক কিভাবে তথ্যের প্যাকেট ইন্টারনেটে তার রাস্তা খুঁজে পায়? আমি বার বার প্যাকেট শব্দটি ব্যবহার করছি। এর কারণ হলো, যোগাযোগের সুবিধার্থে বেশ কিছু তথ্য একত্রে **'প্যাকেট'** [packet] করে পাঠানো হয়। আরো প্রশ্ন, ইন্টারনেটে সংযুক্ত প্রতিটি কম্পিউটার কি জানে অপর প্রতিটি কম্পিউটার কোথায় আছে [বা তাদের ঠিকানা কি]? শেষ প্রশ্ন, প্রতিটি প্যাকেট কি টিভি'র সিগনালের মতো ইন্টারনেটে **'সম্প্রচার'** হয়? শেষোক্ত দু'টি প্রশ্নের উত্তর হলো **'না'**! কোনো কম্পিউটারই জানে না অপর কোনো এক বা একাধিক কম্পিউটার কোথায় আছে। আর কম্পিউটারের মাধ্যমে প্রেরিত তথ্য-প্যাকেট মোটেই সম্প্রচার হয় না টিভি'র সিগনালের মতো। যে গন্তব্যস্থলে প্যাকেট যাবে তার তথ্য সংরক্ষিত থাকে রুটিং টেবিলে। ইন্টারনেটে সংযুক্ত প্রত্যেক রুটারে এরূপ টেবিল আছে।

রুটার [router] প্যাকেট সুইচ ছাড়া আর কিছু নয়। তার কাজ হলো নেটওয়ার্কের তথ্যাদি বিভিন্ন রাস্তায় প্রেরণ করা। প্রত্যেক রুটার তার সাব-নেটওয়ার্ক ও তাদের দ্বারা ব্যবহৃত আইপি ঠিকানা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। নীচের চিত্রে রুটারের কাজ তুলে ধরার চেষ্টা চালিয়েছি।



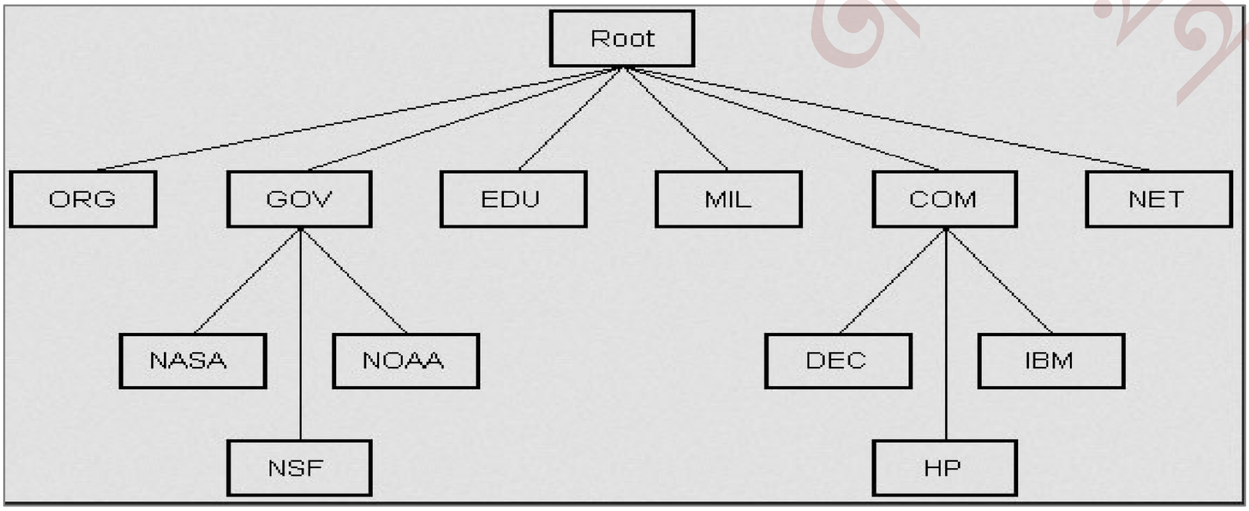
লক্ষ্য করুন উপরের চিত্রে কালো বাক্সগুলো হলো রুটার। এগুলো বিভিন্ন মেরুদণ্ডে সংযুক্ত। যেমন: নেটওয়ার্ক সার্ভিস প্রোভাইডার [NSP], নেটওয়ার্ক এক্সেস পয়েন্ট [NAP], রিজিওনেল ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার [RISP] মেরুদণ্ড, লকেল এরিয়া নেটওয়ার্ক [LAN] ইত্যাদি। উচ্চ পর্যায়ের এনএসপি মেরুদণ্ড থেকে নিম্নে দু'টি লকেল এরিয়া নেটওয়ার্ক পর্যন্ত রুটারের ক্রিয়া বিস্তৃত। নিম্নে আছে আপনার ও অপরের কম্পিউটার।

যে মুহূর্তে একটি প্যাকেট আসবে, প্রথমেই রুটার তার ঠিকানা পরীক্ষা করবে, যা সংরক্ষিত আছে তার আইপি প্রটোকল স্তরে। রুটার তার পথনির্দেশক টেবিলটি পরীক্ষা করবে। আইপি ঠিকানাসম্বলিত নেটওয়ার্ক পাওয়া গেলে প্যাকেটটি সেই নেটওয়ার্কে প্রেরিত হবে। আর না পাওয়া গেলে পরবর্তী রুটারে পাঠাবে। এখানে পাওয়া গেলে ভালো কথা। প্যাকেট তার ঠিকানায় প্রেরিত হবে। কিন্তু পাওয়া না গেলে পরবর্তী রুটারে যাবে এবং সেখানে অনুসন্ধান চলবে। এভাবে পুরো নেটওয়ার্ক রুটারের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হবে। ঠিকানা পাওয়ার আগ পর্যন্ত এ কাজ চলবে। কিন্তু সব জায়গায় অনুসন্ধান পরেও ঠিকানা না পাওয়া গেলে বুঝতে হবে ঠিকানায় কোনো ভুল আছে। সাধারণত ভুল আছে বলে একটি নোটিশ দেওয়া হবে প্রেরণকারী কম্পিউটারের ব্রাউজার [browser] সফ্টওয়্যারের জানালায়।

১১.চ. ডমেন নাম ও ঠিকানা নির্দিষ্টকরণ [domain name and address resolution]

আমি ইতোমধ্যে ব্রাউজার সফ্টওয়্যারের কথা বলেছি। ব্রাউজার একটি বিশেষ সফ্টওয়্যার যার মাধ্যমে ইন্টারনেটের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। আমি এ সম্পর্কে নিশ্চিত, যাদের কম্পিউটার আছে তারা সকলেই ব্রাউজার কি জিনিষ তা জানেন। ইন্টারনেটের মাধ্যমে অপর কম্পিউটারে মেসেজ প্রেরণ আদৌ সম্ভব নয় আপনি তার আইপি ঠিকানা না জানলে। এ ক্ষেত্রে একটি উপায় হলো ব্রাউজারে 'www.othercomputer.com' ঠিকানা লিখতে পারেন। অবশ্য কাঙ্ক্ষিত **'ওয়েবসাইট'** [website] এর ঠিকানা আপনি **'সার্চ ইঞ্জিন'** দ্বারাও বের করতে পারেন। যেমন: **গুগল [Google], ইয়াহু [Yahoo], বিং [BING]** ইত্যাদি। কিন্তু ঠিক কিভাবে এই ঠিকানা থেকে আপনার ওয়েভ ব্রাউজার অপর কম্পিউটার বা সার্ভারের ওয়েভ পৃষ্ঠাটি সনাক্ত করে?

উপরোক্ত প্রশ্নের জবাব হলো **'ডমেন নেইম সর্ভিস'** [Domain Name Service -DNS] সিস্টেম। এটা একটি বিস্তৃত ও প্রচারিত **'ডাটাবেইজ'** [database]। এতে সংরক্ষিত আছে ইন্টারনেটে সংযুক্ত কম্পিউটারের নাম ও আইপি ঠিকানাসমূহ। ডিএনএস ডাটাবেইজসহ ইন্টারনেটে সংযুক্ত অনেক কম্পিউটার আছে। এগুলোকে বলে ডিএনএস সার্ভার [DNS Server]। তবে কোনো একটিতে যাবতীয় ডাটা সংরক্ষিত থাকে না। ঠিকানা নিজের ডাটাবেইজে না পাওয়া গেলে অপর ডিএনএস সার্ভারে [DNS Server] তা প্রেরিত হবে। এভাবে ঠিকানা সনাক্ত না হওয়া পর্যন্ত ডিএনএস সার্ভার থেকে সার্ভারে রিকুয়েস্ট প্রেরিত হতে থাকবে। নীচের চিত্রে এ বিষয়টি বুঝানোর চেষ্টা চালিয়েছি।



লক্ষ্য করুন, উপরের চিত্রে ORG, GOV, EDU, MIL, COM, NET এই পাঁচটি শব্দ দেওয়া আছে। আপনি হয়তো দেখেছেন, যে কোনো ইন্টারনেটের ঠিকানার শেষে একটি ডট বা বিন্দু [.] পরে উপরোক্ত তিন অক্ষরের যে কোনো একটি শব্দ থাকে। এই শব্দগুলো দ্বারাই ডিএনএস কোন্ সার্ভারে আছে তা নির্দিষ্ট হয়। চিত্রে অন্যান্য সংক্ষেপকরণ শব্দাবলী হলোঃ NASA [National Astronautics and Space Administration], NOAA [National Oceanic and Atmospheric Administration], NSF। এ তিনটি গভর্নমেন্ট সার্ভারের নিয়ন্ত্রণাধীন। অবশ্য আরো অনেক আছে- ওগুলো এখানে দেখানো হয় নি। DEC, IBM, HP ইত্যাদি **.কম** এর নিয়ন্ত্রণাধীন। এখানেও সবগুলো দেখানো হয় নি অবশ্যই।

১১.জ. কিভাবে ব্রাউজার উইন্ডোতে ওয়েভপেইজ আসে

আপনাদের যারা ইন্টারনেট ব্যবহার করেন তারা জানেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিভিন্ন ওয়েভপেইজ ভিজিট করতে হয় **'ওয়াল্ড ওয়াইড ওয়েভ'** [world wide web -www] সার্ভিসের মাধ্যমে। যে প্রটোকলের মাধ্যমে আপনার **'ব্রাউজার সফ্‌টওয়্যার'** [browser software] এ সার্ভিসটি কাজে লাগায় তার নাম **'হাইপারটেক্স ট্রান্সফার প্রটোকল'** [Hypertext Transfer Protocol - HTTP]। মনে রাখবেন, **'হাইপারটেক্স মার্কাপ ল্যাংগুয়েজ'** [Hypertext Markup Language -HTML] ভিন্ন জিনিস- এটা হলো ওয়েভ পৃষ্ঠা লেখার একটি ভাষা মাত্র। এইচটিটিপি প্রটোকলের মাধ্যমে ওয়েভ ব্রাউজার [যেমন ফায়ারফক্স [Firefox], সাফারি [Safari], এক্সপ্লোরার [Explorer] ইত্যাদি] ও সার্ভারের মধ্যে ইন্টারনেটে যোগাযোগ সৃষ্টি হয়। এটা সফ্‌টওয়্যার লেবেলে কাজ করে। এখন জেনে নেই আপনার অনুরোধকৃত ওয়েভ পেইজটি ঠিক কিভাবে কম্পিউটারের স্ক্রীনে ভেসে ওঠে।

১. আপনি ব্রাউজারের ঠিকানা লেখার স্থানে একটি ওয়েভ ঠিকানা লিখলেন। অবশ্য আপনার ফেভারেট লিস্ট বা অনুসন্ধানে প্রাপ্ত ঠিকানাও চয়েজ করতে পারেন। যে উপায়েই হোক এ ঠিকানা বা **'ইউনিফর্ম রিসোর্চ লকেটর'** [Uniform Resource Locator -URL] এর মধ্যে আছে ডমেন নেইম [domain name]। সার্ভার প্রথমেই ডিএনএস [DNS] সার্ভারের সাথে যোগাযোগ করে নামের সঙ্গে সম্পৃক্ত আইপি ঠিকানা [IP Address] সংগ্রহ করবে ওয়েভ সার্ভারের জন্য।

২. এবার ব্রাউজার ওয়েভ সার্ভারের সঙ্গে যোগাযোগ সৃষ্টি করে একটি এইচটিটিপি অনুরোধ [HTTP Request] প্রেরণ করবে কাঙ্ক্ষিত ওয়েভ পেইজ খুঁজে বের করতে।

৩. ওয়েভ সার্ভার রিকুয়েস্ট প্রাপ্ত হয়ে কাঙ্ক্ষিত ওয়েভ পেইজ আছে কি না পরীক্ষা করে নেয়। যদি তা থেকে থাকে তাহলে ওয়েভ সার্ভার এটা প্রেরণ করবে ব্রাউজারের নিকট। আর না পাওয়া গেলে সার্ভার **'এইচটিটিপি ৪০৪ এরোর মেসেজ'** [HTTP 404 error message - 'Page Not Found'] প্রেরণ করবে।

৪. পেইজ প্রাপ্ত হওয়ার পরই যোগাযোগ ক্ষণকালের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

৫. পৃষ্ঠার মধ্যে যদি অন্য তথ্যাদি থাকে, সার্ভার থেকে তা লোড করার জন্য রিকুয়েস্ট প্রেরণ করবে ব্রাউজার। সাধারণত ওয়েভ পেইজে চিত্র, ছবি, আপলেট, লেখা ইত্যাদি থাকে।

৬. প্রত্যেক বস্তুর জন্য ব্রাউজার বার বার আলাদা করে রিকুয়েস্ট করবে। অর্থাৎ একটা লোড হওয়ার পর যোগাযোগ ক্ষণকালের জন্য বিচ্ছন্ন হবে। এরপর আরেকটার জন্য প্রেরণ করবে এইচটিটিপি রিকুয়েস্ট। এভাবে করার মূল কারণ হলো অন্যদের সুবিধা। একই সার্ভারের সঙ্গে হয়তো অন্য এক বা একাধিক ব্রাউজার অনুরূপ রিকুয়েস্ট প্রেরণ করতে পারে। আর আসলে এরূপই হয়ে থাকে। কারণ ইন্টারনেটে যে কোন মুহূর্তে কোটি কোটি মানুষ জড়িত আছে বিশ্বব্যাপী। এ সংখ্যা প্রতি মুহূর্তে বাড়ছেও।

৭. ওয়েভ পেইজের সব বস্তু লোড করা শেষ হয়ে গেলে সার্ভারের সঙ্গে যোগাযোগ সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এবার আপনার কম্পিউটারে পুরো পৃষ্ঠাটি দৃশ্যমান হবে। একই ওয়েভ সাইটের অপর কোনো পেইজে যেতে হলে ক্লিক করতে হবে প্রয়োজনীয় লিংকে। এবার ব্রাউজার আবার সার্ভারের সঙ্গে যোগাযোগ সৃষ্টি করে রিকুয়েস্ট প্রেরণ করবে। এভাবে বিভিন্ন পৃষ্ঠা আপনি দেখতে পারেন। আপনি যে কোন পৃষ্ঠা লোড হওয়ার পর নিজের কম্পিউটারে সংরক্ষণ করেও রাখতে পারেন।

১১.ঝ. সফ্টওয়্যার প্রটোকল : এসএমটিপি ও ইলেকট্রনিক মেইল [Application Protocol and Electronic Mail]

ইন্টারনেট সার্ভিসের গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক হলো **'ইলেকট্রনিক মেইল'** [electronic mail - E-Mail] বা ই-মেইল ব্যবস্থা। ই-মেইল একটি সফ্টওয়্যার লেবেল প্রটোকল ব্যবহার করে। এর নাম হলো **'সিম্পুল মেইল ট্রান্সফার প্রটোকল'** [Simple Mail Transfer Protocol - SMTP]। এটা মূলত লেখাসর্বস্ব প্রটোকল [text based]। এটা এইচটিটিপি থেকে বেশ জটিলও বটে। এবার জেনে নিন আপনি যখন ই-মেইল পড়া বা করার জন্য ইচ্ছে করেন তখন কী হয়।

১. মেইল ক্লায়েন্ট [যেমন, gmail, yahoomail, MS Outlook, Netscape Mail ইত্যাদি] তার নিজের মেইল সার্ভারের সঙ্গে প্রথমে যোগাযোগ সৃষ্টি করবে। সার্ভারের আইপি ঠিকানা বা ডমেন নাম মেইল ক্লায়েন্ট **'সফ্টওয়্যার সেটাপের'** [software setup] সাথে ইন্সস্টল হয়ে থাকে।

২. মেইল সার্ভার সর্বদাই প্রথম মেসেজ প্রেরণ করবে নিজেকে পরিচয় করার উদ্দেশ্যে।

৩. ক্লায়েন্ট একটি এসএমটিপি **'হ্যালো'** কমান্ড বা নির্দেশ পাঠাবে। সার্ভার এটা প্রাপ্ত হয়ে **'250 OK'** মেসেজ দ্বারা জাবাব দেবে।

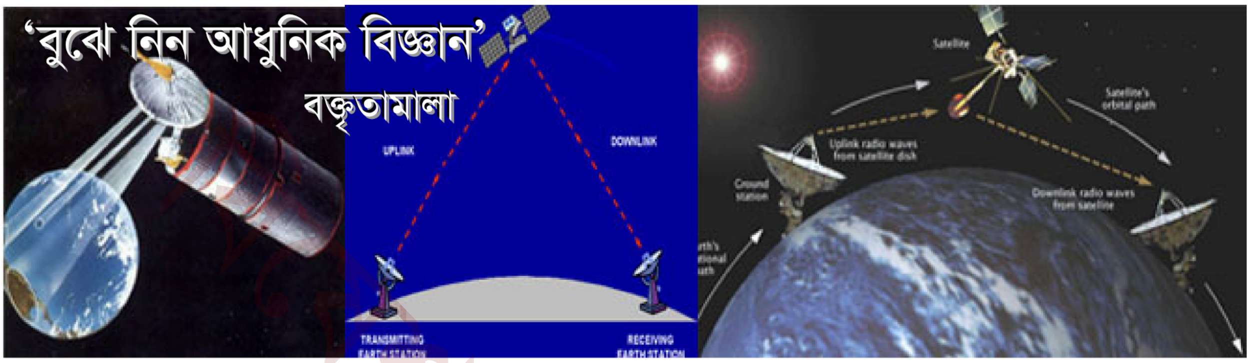
৪. ঠিক কোন্ কাজটি করছেন তার উপর নির্ভর করবে কোন্ এসএমটিপি কমান্ড সার্ভারে প্রেরিত হবে। আপনি হয়তো ডাক চেক করতে পারেন, ই-মেইল পাঠাতে পারেন বা অন্য কোন কাজ করতে পারেন। যেটাই করুন, সে মুতাবিক কমান্ড প্রেরিত হবে সার্ভারে। সার্ভার সঠিক জবাব দেবে।

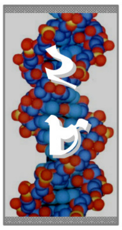
৫. এই রিকুয়েস্ট/রিসপন্স [request/response] বা অনুরোধ/সাড়া যোগাযোগ চলতে থাকবে যতক্ষণ না ক্লায়েন্ট থেকে **'এসএমটিপি কুইট'** [SMTP QUIT] কমান্ড প্রেরিত হবে। এই কমান্ডের অর্থ ই-মেইল যোগাযোগ বন্ধ করা। মোটকথা, এসএমটিপি ক্লায়েন্ট [SMTP client] ও এসএমটিপি সার্ভারের [SMTP server] মধ্যে **'কথাবার্তা'** হওয়ার নামই ই-মেইল করা ও পাওয়া।

প্রিয় ছাত্র-বন্ধুরা! এ পর্যায়ে ইন্টারনেট সম্পর্কে আর বেশী কিছু বলার প্রয়োজন নেই। মাত্র কয়েক দশক পূর্বে ইন্টারনেট আত্মপ্রকাশ করে। ইতোমধ্যে অনেক দূর এগিয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে আরো এগুবে সন্দেহ নেই। ইতোমধ্যে ইন্টারনেট ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে। পৃথিবীব্যাপী বিরাট প্রভাব ফেলেছে এই জনপ্রিয় মিডিয়া। যদিও দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনেক বাজে জিনিসও প্রচার হচ্ছে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বিশ্বসমাজ। অত্যন্ত চরম পর্যায়ের ব্লু ছবি ও ফিল্ম ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। এছাড়া ধর্ম-দর্শন-ইতিহাস এবং অন্যান্য তত্ত্ব-তথ্যভিত্তিক ফাইল যে যেভাবে পারে আপলোড করে দিচ্ছে ইন্টারনেটে। এসব ফাইল সত্য থেকে ডাহা মিথ্যা ও আপত্তিকর থেকে বিভ্রান্তিকর পর্যন্ত আছে। সুতরাং সবাইকে সতর্ক থাকা চাই।

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা! আজকের লেকচার দীর্ঘ হয়ে গেছে ইতোমধ্যে। আমরা পরবর্তী লেকচারে আধুনিক প্রযুক্তির আরো একটি বিষয়ের উপর তথ্যানুসন্ধান চালাবো। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের আলোচনা শেষ করছি।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম





বক্তাঃ ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী, নেশন্যাল ডিপ্লোমা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ইংল্যান্ড।

স্থানঃ খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সুবিদ বাজার, সিলেট।

ঘ. বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক বিজ্ঞান

বক্তৃতা ২৮ : আধুনিক প্রযুক্তি

১২. আধুনিক যোগাযোগ কৃত্রিম উপগ্রহ [Modern Communication Satellite]

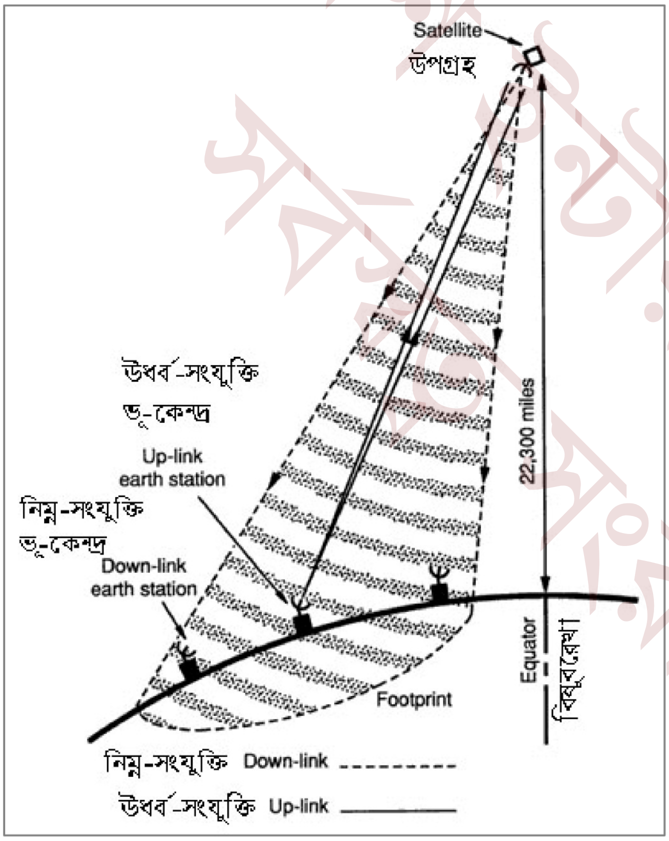
প্রিয় শিক্ষার্থী! গত লেকচারে আমরা ইন্টারনেটের উপর আলোচনা করেছি। জনপ্রিয় এ গণমাধ্যম সম্পর্কে আরো অনেককিছু বলার ছিলো। তবে আমাদেরকে এক স্থানে থামতে হবে। ইন্টারনেট মাত্র ক'টি বৎসরে এক বিরাট বিষয়ে রূপান্তর হয়েছে। প্রতি মুহূর্তে এর সম্প্রসারণ ঘটছে। সুতরাং ইন্টারনেট সম্পর্কে বলে শেষ করার কোনো উপায় নেই। আসলে এই লেকচারের ব্যাপ্তির বাইরে যেতে ইচ্ছে নেই। সুতরাং আজকের লেকচারের মোড় ঘুরিয়ে দিচ্ছি। আমরা এখন আলোচনা করবো এ যুগের গুরুত্বপূর্ণ আরেক টেকনোলজির উপর। এটা হলো আধুনিক **'যোগাযোগ কৃত্রিম উপগ্রহ'** [communication sattelite]।

যোগাযোগ উপগ্রহের যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৫৮ সালে। ইতোমধ্যে পার হয়ে গেছে প্রায় ৬ দশক। আজকের পৃথিবী-গোলকের চতুর্দিকে দূর মহাকাশে ঘূর্ণনরত আছে অসংখ্য যোগাযোগ কৃত্রিম উপগ্রহ। এ সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। যোগাযোগ কৃত্রিম উপগ্রহের কাজ হলো পৃথিবীকে একটা নির্দিষ্ট গতিতে প্রদক্ষিণরত অবস্থায় মহাকাশে থেকে পৃথিবীর সঙ্গে রেডিও, টিভি ও টেলিফোন সিগনাল আদান-প্রদান করা। পৃথিবীর জমিনে স্থাপিত **'আর্থ স্টেশন'** [Earth Station] বা ভূ-কেন্দ্র থেকে প্রেরিত সিগনাল উপগ্রহের মাধ্যমে অপর আর্থ স্টেশনে পাঠানো হয়। সিগনাল অবশ্য উচ্চতর গতি তথা আলোকের গতিতে চলে। ফলে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী সরাসরি রেডিও, টিভি ও টেলিফোন যোগাযোগ সম্ভব হচ্ছে। নতুন এই যোগাযোগ ব্যবস্থা বাস্তবিকই সমগ্র পৃথিবীর জনগোষ্ঠিকে আজ **'গ্লোবেল ভিলেজ'**

[Global Village] এর অধিবাসী করেছে। আমরা অনুভব করছি আমেরিকা কিংবা অস্ট্রেলিয়ার অধিবাসী আমাদের পড়শী- খুব দূরের মানুষ নন। স্যাটেলাইট যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকায় প্রতি মুহূর্তে কোটি কোটি মানুষ সরাসরি যোগাযোগ অব্যাহত রাখছে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী। আজকের লেকচারে আমরা **'কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট'** [Communication Satellite] প্রযুক্তির উপর হৃদয়াকর্ষক আলোচনা করবো।

১২.ক. স্যাটেলাইট যোগাযোগ ব্যবস্থার মৌলিক পদ্ধতি

প্রথমেই আমরা স্যাটেলাইট যোগাযোগের মৌলিক দিক নিয়ে আলোচনা করাবো। নীচের চিত্রে এটা বুঝানোর চেষ্টা করেছি। যোগাযোগ ক্রিয়া শুরু হয় **'ভূ-কেন্দ্রে'** [Earth Station]। ভূ-কেন্দ্রের মধ্যে থাকে পৃথিবীর কক্ষপথে প্রদক্ষিণরত কৃত্রিম উপগ্রহের সঙ্গে সিগনাল প্রেরণ ও প্রাপ্তির বিভিন্ন যন্ত্রাদি।



ভূ-কেন্দ্র থেকে উচ্চ এনার্জি ও ফ্রিকুয়েন্সিসম্পন্ন সিগনাল ছাড়া হয় যোগাযোগ স্যাটেলাইটে। পৃথিবীর ভূ-খণ্ডের একটি বিশেষ অংশ যে কোন স্যাটেলাইটের রেঞ্জের ভেতর থাকে। এই রেঞ্জের অভ্যন্তরে স্থাপিত হয়েছে আরো একাধিক ভূ-কেন্দ্র। সুতরাং যে কোন একটি ভূ-কেন্দ্র থেকে প্রেরিত সিগনাল পুনরায় অপর এক বা একাধিক ভূ-কেন্দ্রে স্যাটেলাইট ফেরৎ পাঠিয়ে দিতে পারে। যে রেঞ্জের ভেতর স্যাটেলাইটের যোগাযোগ সম্ভব একে বলে ঐ স্যাটেলাইটের **'ফুটপ্রিন্ট'** [footprint]। ভূ-কেন্দ্র থেকে স্যাটেলাইটে সিগনাল পাঠানোর সিস্টেমকে বলে **'আপলিঙ্ক'** [uplink] বা উর্ধ্বগামী-সংযুক্তি। আর স্যাটেলাইট থেকে ভূ-কেন্দ্রে সিগনাল ফেরৎ পাঠানোর সিস্টেমকে বলে **'ডাউনলিংক'** [downlink] বা নিম্নগামী-সংযুক্তি। এ পর্যন্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে সক্ষম হলাম যে, স্যাটেলাইট পৃথিবীর উর্ধ্বাকাশে একটি বিশেষ স্থানে প্রদক্ষিণরত থাকে। ভূ-কেন্দ্র থেকে উর্ধ্বগামী-সংযুক্তির মাধ্যমে সিগনাল প্রেরণ করা হয় আর অপর এক বা একাধিক ভূ-কেন্দ্রে সেই সিগনাল পুনরায় স্যাটেলাইট থেকে নিম্নগামী-সংযুক্তির মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়। প্রত্যেক স্যাটেলাইটের একটি রেঞ্জ আছে যাকে **'ফুটপ্রিন্ট'** বলে। ফুটপ্রিন্টের অভ্যন্তরে যতো ভূ-কেন্দ্র আছে ওগুলো ঐ স্যাটেলাইটের সঙ্গে যোগাযোগ সৃষ্টি করতে পারে।

১২.খ. উপগ্রহ যোগাযোগ ফ্রিকুয়েন্সি ব্যান্ড [satellite frequency band]

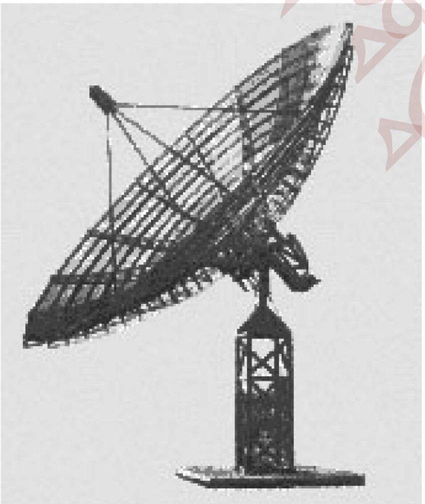
স্যাটেলাইট যোগাযোগের জন্য তিনটি নির্দিষ্ট ব্যান্ড ব্যবহৃত হয়। এগুলো হলো **'সি-ব্যান্ড'** [C-band], **'কেইউ-ব্যান্ড'** [Ku-Band] এবং **'কেএ-ব্যান্ড'** [Ka-Band]। এর মধ্যে প্রথমোক্ত দু'টি সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়।

আমরা ফিজিক্সের উপর আলোচনাকালে **‘ফ্রিকুয়েন্সি’** [frequency] বা তরঙ্গসংখ্যা, **‘ওয়েভলেন্থ’** [wavelength] বা তরঙ্গদৈর্ঘ্য ইত্যাদির উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে শুধুমাত্র উভয়টির অর্থ ও একটার সঙ্গে আরেকটির সম্পর্ক কী তা তুলে ধরছি।

একটি সিগনালে প্রতি সেকেন্ড ক’টি তরঙ্গ আছে সে-ই হিসাবের নামই হলো **ফ্রিকুয়েন্সি**। অপরদিকে একটি তরঙ্গের [কোন বিশেষ পয়েন্ট থেকে অপর একই পয়েন্ট পর্যন্ত] দৈর্ঘ্যকে বলে **ওয়েভলেন্থ**। এই উভয়টির মধ্যে সম্পর্ক বিদ্যমান। গাণিতিকভাবে এই সম্পর্ক লেখা হয় এভাবে:

$V = \lambda f$ [এখানে V হলো সিগনালের গতি বা ভেলোসিটি, λ (লামদা) হলো তরঙ্গদৈর্ঘ্য এবং f হলো ফ্রিকুয়েন্সি]

উপরের সমীকরণ থেকে স্পষ্ট, যদি **ফ্রিকুয়েন্সি** বাড়ে তাহলে **ওয়েভলেন্থ** কমবে। সুতরাং ওয়েভলেন্থ বাড়লে অধিক বড়ো **এ্যান্টেনা** [Antenna -অর্থাৎ স্যাটেলাইটের ডিশ-এ্যান্টেনা] দরকার। এ কারণেই আমরা স্যাটেলাইট কমিউনিকেশনের জন্য খুব বড় বড় এ্যান্টেনা দেখতে পাই। সি-ব্যান্ড স্যাটেলাইট ট্রান্সমিশনের ফ্রিকুয়েন্সি রেঞ্জ হলো ৪ থেকে ৮ **গিগাহার্টজ** [GHz]। এটা অপেক্ষাকৃত নিম্ন ফ্রিকুয়েন্সি রেঞ্জ। এতে যে ওয়েভলেন্থ সৃষ্টি হয় তা কেইউ-ব্যান্ড ও কেএ-ব্যান্ডের তুলনায় বেশী। সুতরাং সি-ব্যান্ডের এসব দীর্ঘ ওয়েভলেন্থকে গ্রহণযোগ্যভাবে রিসিভ করতে প্রয়োজন দাঁড়ায় বেশ বড় বড় এ্যান্টেনার। অঙ্ক কষে দেখা গেছে সি-ব্যান্ডের যোগ্য এ্যান্টেনার ব্যাস হতে হবে ২ থেকে ৩ মিটার। নীচে সি-ব্যান্ডের এ্যান্টেনার একটি ছবি তুলে ধরেছি।



কেইউ-ব্যান্ড স্যাটেলাইট ট্রান্সমিশনের ফ্রিকুয়েন্সি রেঞ্জ হলো **১১** থেকে **১৭ মেগাহার্টজ** [MHz]। উচ্চ ফ্রিকুয়েন্সির অর্থ তরঙ্গদৈর্ঘ্য অনেকটা কম। সুতরাং ছোট্ট সাইজের এ্যান্টেনা দ্বারা এসব সিগনাল রিসিভ করা সম্ভব। সর্বনিম্ন মাত্র ১৮ ইঞ্চি ব্যাসের এ্যান্টেনাই এই সিগনাল ধারণের জন্য যথেষ্ট। এরূপ সিগনালের মাধ্যমেই ঘরে ঘরে স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন সম্ভব হয়েছে। নীচে কেইউ-ব্যান্ডের একটি এ্যান্টেনা ও রিসিভার দেখানো হলো।

কেএ-ব্যান্ডের স্যাটেলাইট ট্রান্সমিশনের ফ্রিকুয়েন্সি ২০ থেকে ৩০ মেগাহার্টজ পর্যন্ত হয়ে থাকে। উচ্চ ফ্রিকুয়েন্সির ফলে ওয়েভলেন্থও হয় কম। ফলে অতি ছোট্ট এ্যান্টেনাই যোগাযোগের জন্য যথেষ্ট। গড়িতে ব্যবহৃত স্যাটেলাইট ট্রাকিং সিস্টেমে এই ব্যান্ডের সিগনাল কাজে লাগানো হয়।

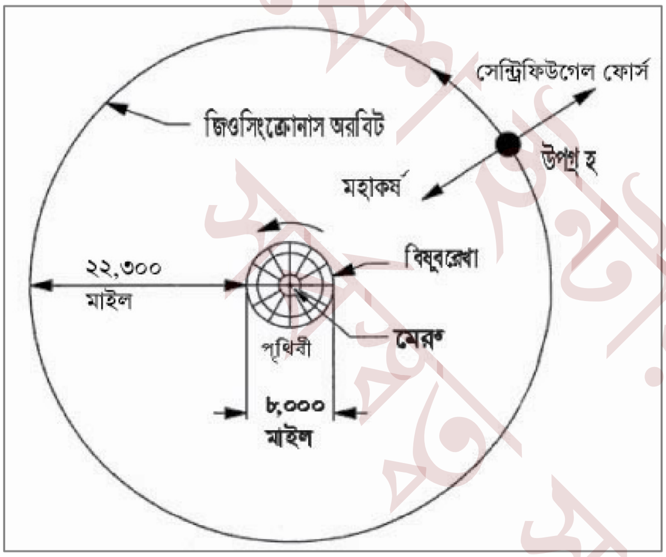


১২.গ. ভূ-গতিসঙ্গত পৃথিবী কক্ষপথ উপগ্রহ [Geosynchronous Earth Orbit - GEO Satellite]

আমরা ইতোমধ্যে কোনো এক লেকচারে এই কক্ষপথের উপর তথ্য তুলে ধরেছি। এই বিশেষ কক্ষপথকে বুঝানোর উদ্দেশ্যে

একটি চিত্রও আমার অঙ্কন করে দেখিয়েছিলাম। নীচে [পরবর্তী পৃষ্ঠায়] সেই চিত্রটি পুনরায় তুলে ধরছি।

আজকাল অধিকাংশ কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট উপরোক্ত GEO অরবিটে স্থাপন করা হয়। এর মূল কারণ হলো পৃথিবীর এক বিশেষ ভূ-খণ্ড জুড়ে স্যাটেলাইটের ফুটপ্রিন্ট স্থায়ী রাখা। কারণ জিইও কক্ষপথে স্থাপিত স্যাটেলাইট পৃথিবীর দৈনিক গতির সমপরিমাণ গতিতে একই দিকে তথা পূর্বদিকে প্রদক্ষিণ করে। ফলে যে কোন মুহূর্তে স্যাটেলাইট ভূ-খণ্ডের একই স্থানে ২২,৩০০ মাইল ঊর্ধ্বে পৃথিবীর তুলনায় স্থির থাকতে সক্ষম হয়। অন্য কোন কক্ষপথে স্যাটেলাইটকে এভাবে স্থির রাখা সম্ভব নয়। এই বিশেষ কক্ষপথের অপর নাম **'জিওস্টেশনারী আর্থ অরবিট'** [Geostationary Earth orbit] বা ভূ-স্থিত পৃথিবী কক্ষপথ।



১২. ঘ. মধ্যম পৃথিবী কক্ষপথ উপগ্রহ [Medium Earth Orbit - MEO Satellite]

মধ্যম পৃথিবী কক্ষপথে স্যাটেলাইট স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে গত ক'বৎসর পূর্বে। আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি, ভূ-স্থিত কক্ষপথ পৃথিবী থেকে অন্তত ২২,৩০০ মাইল ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। যোগাযোগ স্যাটেলাইটে সিগনাল আদান-প্রদান হয় ইলেকট্রমেগনেটিক তরঙ্গে। এই সিগনালের নির্দিষ্ট গতি আছে। আলোকের অতি কাছাকাছি গতিতে চলেও ভূ-কেন্দ্র থেকে সিগনাল আপলোড ও অপর ভূ-কেন্দ্রে বা স্যাটেলাইট ডিশে ডাউনলোড হতে মোট সময় লাগে প্রায় ০.২৫ সেকেন্ড। এটা এক সেকেন্ডের চার ভাগের একভাগ হলেও **'লাইভ ট্রান্সমিশন'** [live transmission] এর জন্য কিছুটা সমস্যা সৃষ্টি করে। মোটকথা, পৃথিবী থেকে কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট যতো কাছে হবে সময় অপচয় বা **'টাইম ডিলে'** [time delay] কম হবে। এ লক্ষ্যার্জনে বিজ্ঞানীরা **মধ্যম আর্থ অরবিট স্যাটেলাইট** স্থাপনের পথ উদ্ভাবন করেছেন। তবে এ ক্ষেত্রে একটি মাত্র স্যাটেলাইট ভূ-পৃষ্ঠের বড়ো অংশে **ফুটপ্রিন্ট** তৈরী করতে পারবে না। তাই একাধিক স্যাটেলাইট MEO কক্ষপথে স্থাপন করে যোগাযোগের জন্য একটি **'নেটওয়ার্ক'** [network] তৈরী করে পুরো বিশ্বব্যাপী সম্প্রচার নিশ্চিত করেছেন একই সঙ্গে।

১২. ঙ. নিম্ন পৃথিবী কক্ষপথ উপগ্রহ [Low Earth Orbit -LEO Satellite]

এই সিস্টেমে থাকবে বেশ ক'টি স্যাটেলাইট নেটওয়ার্ক। এগুলো ৫০০ থেকে ১০০০ মাইল ঊর্ধ্বে অবস্থান করে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করবে। এলইও কক্ষপথে চলন্ত থাকলে **'স্যাটেলাইট ট্রান্সমিশন ডিলে'** [Satellite Transmission Delay] অনেকটা কমে আসবে। ধারণা করা হচ্ছে এর মাত্রা হবে মাত্র ০.০৫ সেকেন্ড। তিন ধরনের এলইও স্যাটেলাইট প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব এসেছে: ছোট্ট, বড়ো ও অনেক বড়ো এলইও। ছোট্ট এলইও স্যাটেলাইট ৮০০ মেগাহার্টজ [MHz] ফ্রিকুয়েন্সিতে কাজ করবে। বড়োটি কাজ করবে ২ গিগাহার্টজ [GHz] রেঞ্জে ও অনেক বড়োগুলোর রেঞ্জ হবে ২০ থেকে ৩০ গিগাহার্টজে। উচ্চ ফ্রিকুয়েন্সির স্যাটেলাইটগুলো অধিক তথ্য একই সঙ্গে ক্যারি করার ক্ষমতাসম্পন্ন হবে। এছাড়া **'রিয়েল-টাইম ট্রান্সমিশন'** [real-time transmission] সম্ভব হবে এগুলো

দ্বারা। এর অর্থ হলো সিগনাল প্রেরণ ও প্রাপ্তিতে সময় নষ্ট হবে না। পৃথিবীবিখ্যাত 'মাইক্রসফ্ট কর্পোরেশন' এবং 'মেক-কো সেল্যুলার' কোম্পানি মিলে একটি নতুন স্যাটেলাইট যোগাযোগ সিস্টেম স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই সিস্টেমের নাম 'AT&T Wireless Services'। এতে থাকবে ৮৪০টি অধিক বড়ো এলইও স্যাটেলাইট। এগুলো সৃষ্টি করবে এক বিরাট নেটওয়ার্ক যার নাম **'টেলিডিসিক'** [Teledesic]। ভিডিও-অডিও ট্রান্সমিশনের জন্য এই সিস্টেম হবে যোগাযোগ কৃত্রিম উপগ্রহের ইতিহাসে বৈপ্লবিক উন্নয়ন।

১২. চ. অধিক উচ্চতাসম্পন্ন দীর্ঘমেয়াদী প্লাটফর্ম [High Altitude Long Endurance - HALE Platform]

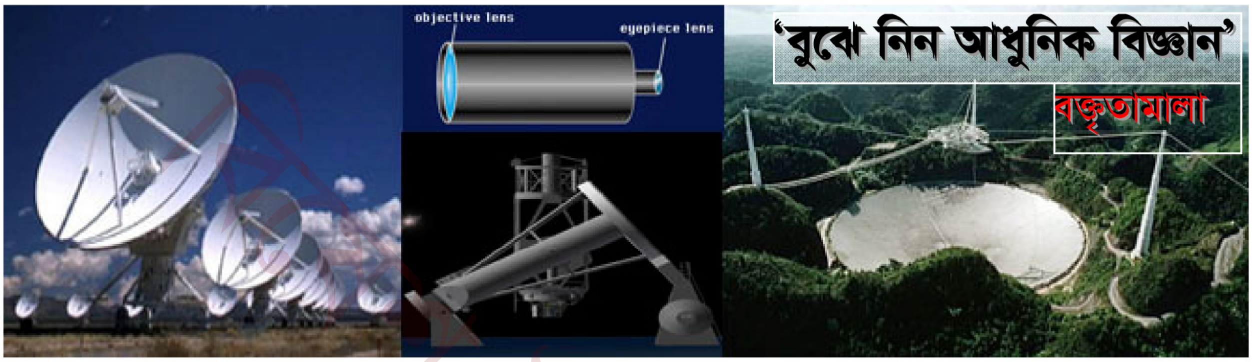
যোগাযোগ স্যাটেলাইট সিস্টেমের সর্বাধুনিক এই প্রযুক্তি এখন পরীক্ষামূলকভাবে চালু হয়েছে। এসব স্যাটেলাইট মূলত উচ্চগুণসম্পন্ন অল্প ওজনের বিমান। এগুলো যোগাযোগ যন্ত্রাদিসহ স্থাপিত হবে জিওসিংক্রোনাস স্যাটেলাইট কক্ষপথে। পৃথিবী থেকে এগুলো খুব অল্প উচ্চতায় অবস্থান করবে। এসব বিমান পরিচালিত হবে উচ্চমানের টারবাইন ইঞ্জিন দ্বারা। সেসাথে ব্যাটারী ও সৌরবিদ্যুৎ থাকবে। পৃথিবী থেকে মাত্র ৭০ হাজার ফুট উপরে এই প্লাটফর্ম স্থাপিত হবে। সুতরাং ট্রান্সমিশন ডিলে কমে ০.০০১ সেকেন্ডে নেমে আসবে। বিজ্ঞানীরা এই সিস্টেম স্থাপন করছেন মুটোফোন জাতীয় যন্ত্রের জন্য। সুতরাং ভবিষ্যতে স্যাটেলাইট ট্রান্সমিশন আপনার আমার মোবাইলেও থাকবে।

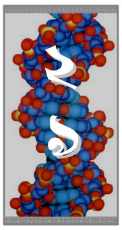
১২. জ. কক্ষপথের ফাঁক [Orbital Slots]

ইতোমধ্যে উর্ধ্বাকাশে ৩ শতাধিক স্যাটেলাইট স্থাপিত হয়ে গেছে ভূ-স্থিত কক্ষপথে [Geosynchronous Orbit]। এ সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। সুতরাং একটা আরেকটার উপর পতিত হওয়ার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এরূপ অনাকাঙ্ক্ষিত সমস্যা এড়াতে একাধিক আন্তর্জাতিক ও গভর্নমেন্ট সংস্থা কাজ করে যাচ্ছেন। আপনার স্যাটেলাইট [প্রাইভেট কোম্পানীর বা কোন সরকারের হউক] ঠিক কোন্ ফাঁকে বা স্লটে স্থাপন করবেন সেজন্য ওসব সংস্থার নিকট থেকে অনুমতি গ্রহণ করে নিতে হবে। আন্তর্জাতিক সংস্থাটির নাম **'ইন্টারনেশনাল কমিউনিকেশন্স ইউনিয়ন'** [International Communications Union - ICU]। আমেরিকার সরকার আরেক সংস্থা সৃষ্টি করেছেন, যার নাম **'ফেডারেল কমিউনিকেশন্স কমিশন'** [Federal Communication Commission]। ডিগ্রী হিসাবে দ্রাঘিমাংশ [altitude] দ্বারা এসব স্লট বরাদ্দ করা হয়। আজকাল সি-ব্যান্ড ও কেইউ-ব্যান্ড স্যাটেলাইটের জন্য অরবিটেল স্লটের চাহিদা এতো বৃদ্ধি পেয়েছে যে ICU এবং FCC বাধ্য হয়ে স্লটের প্রয়োজনীয় ব্যাপ্তি কমিয়ে মাত্র ২ ডিগ্রীতে নামিয়েছেন।

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা! আধুনিক যোগাযোগ কৃত্রিম উপগ্রহের উপর আমাদের তথ্যানুসন্ধানের ইতি এক্ষুণি টানছি। এ সম্পর্কে আর বেশী বলার প্রয়োজন নেই। আমি আশা করছি যা আলোচিত হলো তা থেকেই আপনারা কৃত্রিম উপগ্রহের কার্যকারিতা সম্পর্কে অনেকটা বেশী জেনে নিয়েছেন। আর এটাই আমাদের উদ্দেশ্য। আগামী লেকচারে উচ্চ প্রযুক্তির আরেক গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র অপটিকেল ও রেডিও টেলিস্কোপ নিয়ে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ! সবাই ভালো থাকুন। আগামী লেকচারে আবার দেখা হবে।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম





বক্তা: ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী, নেশন্যাল ডিপ্লোমা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ইংল্যান্ড।

স্থান: খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সুবিদ বাজার, সিলেট।

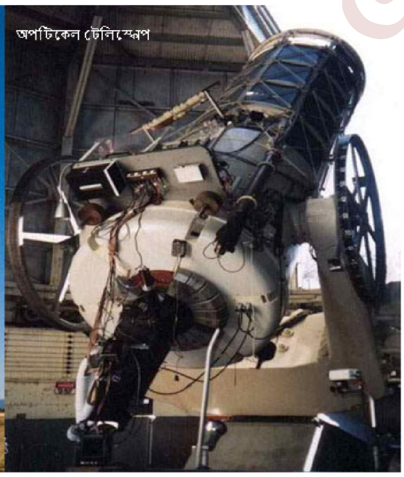
ঘ. বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক বিজ্ঞান

বক্তৃতা ২৯ : আধুনিক প্রযুক্তি

১৩. অপটিক্যাল ও রেডিও টেলিস্কোপ [Optical and Radio Telescope]

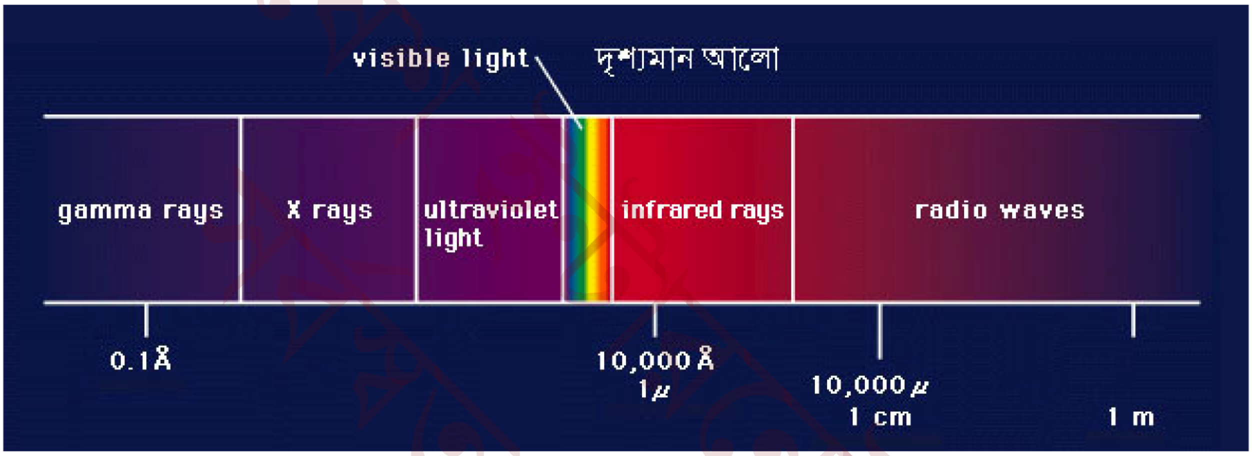
প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা! বুঝে নিন আধুনিক বিজ্ঞান শীর্ষক বক্তৃতামালার উনত্রিশতম সংযোজন এটি। সবাইকে জানাচ্ছি সাদর সম্ভাষণ। আজকের লেকচার টেলিস্কোপ নিয়ে। বাংলায় একে দূরবীক্ষণযন্ত্র বলে। এর দ্বারা কী হয় তা সকলেই জানেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের ব্যবহার অপরিহার্য। তাই আধুনিক প্রযুক্তির উপর তথ্যানুসন্ধানের অংশ হিসাবে ১৩তম যন্ত্র হিসাবে টেলিস্কোপকে বেছে নিয়েছি। আমরা ইতোমধ্যে এ যন্ত্রটির কথা উল্লেখ করেছি অপর আরেক বক্তৃতায়। আজ অবশ্য এই যন্ত্রের টেকনিকেল দিকের উপর আলোচনা হবে। তাই আসুন, জেনে নিই দূরবীক্ষণযন্ত্র ঠিক কিভাবে কাজ করে।





১৩. ক. দূরবীক্ষণযন্ত্র ব্যবহারের ব্যাপ্তি

দূরবীক্ষণযন্ত্র দ্বারা শুধুমাত্র দৃশ্যমান জগতের এক বা একাধিক বস্তু বড়ো করে দেখা হয়- তা কিন্তু নয়। পুরো ইলেকট্রমেগনেটিক স্পেকট্রাম [electromagnetic spectrum] বা বর্ণচ্ছটা বৃহৎ করে দেখা ও পরীক্ষার যন্ত্র এটি। আধুনিক যুগে এ কারণেই মহাকাশ বিজ্ঞানে টেলিস্কোপের গুরুত্ব এতোই বেশী। ইলেকট্রমেগনেটিক বর্ণচ্ছটার উপর বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে ফিজিক্সের উপর তথ্যানুসন্ধানের সময়। এখানে স্পেকট্রামের একটি চিত্র তুল ধরলাম সকলের মাইন্ড ফ্রেস করতে যেয়ে।



লক্ষ্য করুণ, উপরোক্ত চিত্রে বায়ের দিকে আছে গামা-রে [নীলের দিক], এরপর এক্স-রে, আলট্রাভাইলট, দৃশ্যমান আলো, [লালের দিকে] ইনফ্রারেড ও রেডিও তরঙ্গ। আজকাল এই সবক'টি তরঙ্গে ব্যবহারযোগ্য টেলিস্কোপ তৈরী হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা জরুরী, আমরা যে তরঙ্গে **'দেখি'** তা-ই হলো দৃশ্যমান আলো। বাকী সবকিছু আমাদের দৃষ্টির অগোচরে এক বিরাট জগৎ।

১৩. খ. অপটিকেল টেলিস্কোপ [Optical Telescope]

বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় বর্ণচ্ছটার দৃশ্যমান আলো এরূপ দূরবীক্ষণযন্ত্রের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়। পৃথিবীকেন্দ্রিক অপটিকেল টেলিস্কোপ দ্বারা চন্দ্র, সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহ, নিকটস্থ তারা যেমন বাইনারি তারা সিস্টেম ইত্যাদি বড়ো করে দেখা ও পরীক্ষা করা হয়। অপটিকেল টেলিস্কোপ দুই ধরনের: **১. রিফ্রেকটিং [refracting]** ও **২. রিফ্লেকটিং [reflecting]**। আমরা এখন উভয়টির উপর আরো বিস্তারিত আলোচনা করবো।

১. রিফ্রেকটিং টেলিস্কোপ [Refracting Telescope]

আলোকরশ্মি এক মাধ্যম থেকে অপর মাধ্যমে প্রবেশ করলে বাঁকা হয়। এই বাঁকা হওয়াকেই বলে 'refraction'। সুতরাং বাতাস থেকে কাচের মধ্য দিয়ে আলোকরশ্মি চললে তা বাঁকা হবে। আর বিশেষ কাচ যেমন লেন্স দ্বারা এই বক্রতাকে একটি বিন্দুতে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। কাচের কেন্দ্র থেকে এই বিন্দুর দূরত্বকে বলে **'ফোকাল দৈর্ঘ্য'** [focal length]। নীচের চিত্রটি দেখুন। ফোকাল বিন্দুকে ঐ লেন্সের ফোকাসও বলে।

রিফ্রেকটিং টেলিস্কোপের মধ্যে কোন দূরের বস্তুর আলোকরশ্মি প্রবেশ করে যে লেন্সের মাধ্যমে তার নাম **‘অবজেক্টিভ লেন্স’** [objective lens]। লক্ষণীয়, আলোকরশ্মি ফোকাল পয়েন্টে এসে উল্টে যায়- ফলে বস্তুর চিত্রও উল্টো অবস্থায় দেখা যাবে। নীচের চিত্রে রিফ্রেকটিং টেলিস্কোপের ডিজাইন প্রিন্সিপাল দেখানো হয়েছে।



দ্বিতীয় লেন্সকে বলে **‘আইপিস লেন্স’** [eyepiece lens]। এই লেন্সের মাধ্যমেই পর্যবেক্ষক বস্তুটি দেখতে পারেন। ফোকেল পয়েন্ট পরে এটি স্থাপিত থাকে। দূরের বস্তুটি এই আইপিস দ্বারা বড়ো দেখাবে। কতটুকু বড়ো তা নির্ভর করবে অবজেক্টিভ লেন্সের ব্যাসের উপর। অবজেক্টিভ লেন্সের ব্যাসকে **‘এপারচার’** [aperture] বলে। এপারচারের ব্যাস মাত্র কয়েক সেন্টিমিটার থেকে এক মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। অবশ্য বস্তুর চিত্রকে উল্টো অবস্থা থেকে সঠিক অবস্থায় দেখার জন্য অভ্যন্তরে আয়না থাকতে পারে।

১৩. গ. ম্যাগনিফিকেশন [magnification]

অপটিকেল টেলিস্কোপ ব্যবহারের মূল লক্ষ্য হলো দূরের বস্তুকে বড়ো করে দেখা। এই বড় করে দেখাকেই বলে **‘ম্যাগনিফিকেশন’** [magnification] যার বাংলা প্রতিশব্দ হলো **‘বিবর্ধন’**। আগেই বলেছি বিবর্ধনের মাত্রা লেন্সের উপর নির্ভরশীল। ঠিক কিভাবে এই মাত্রাটি মাপা যায়? এটা মাপার উপায় হলো অবজেক্টিভ লেন্সের ফোকেল দৈর্ঘ্যকে আইপিস লেন্সের ফোকাল দৈর্ঘ্য দ্বারা ভাগ করা। সুতরাং যে কোন রিফ্রেকটিভ টেলিস্কোপের পাওয়ার [power] তথা ম্যাগনিফিকেশন শক্তি হলো: P = Fo / Fe। এখানে Fo অর্থ অবজেক্টিভ লেন্সের ফোকাল দৈর্ঘ্য এবং Fe হলো আইপিসের ফোকাল দৈর্ঘ্য। উভয় একক অবশ্য একই হতে হবে। একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

মনে করুন, আপনার টেলিস্কোপের অবজেক্টিভ লেন্সের ফোকাল দৈর্ঘ্য ২৫৪ সেন্টিমিটার (১০০ ইঞ্চি)। আপনার আইপিসের ফোকাল লেন্থ যদি ২.৫৪ সেন্টিমিটার (১ ইঞ্চি) হয় তাহলে উপরের সমীকরণ থেকে: চ = ২৫৪/২.৫৪ = ১০০। সুতরাং চন্দ্রের দিকে এই টেলিস্কোপ দিয়ে তাকালে তাকে একশত গুণ বড় দেখাবে।

১৩. ঘ. রিফ্লেকটিং টেলিস্কোপ [Reflecting Telescope]

এরূপ টেলিস্কোপ দ্বারা দৃশ্যমান আলো ছাড়াও বর্ণচ্ছটার আলট্রাভাইলোট এবং ইনফ্রারেড ক্ষেত্রও পরীক্ষা করা যায়। রিফ্রেকটিং টেলিস্কোপ আলোকরশ্মি বক্র করে। কিন্তু এটা আলোকরশ্মি প্রতিবিম্ব করে একটি ফোকাল পয়েন্টে নিয়ে আসে। অন্য কথায় লেন্সের বদলে ব্যবহৃত হয় আয়না। এই আয়নাকে বলে **‘প্রাইমারী মিরর’** [primary mirror]। এটা সাধারণত খেদাই করা থাকে। একে বলে **‘কনকেভ’** [concave] আকার। নীচের চিত্রটি দেখুন।



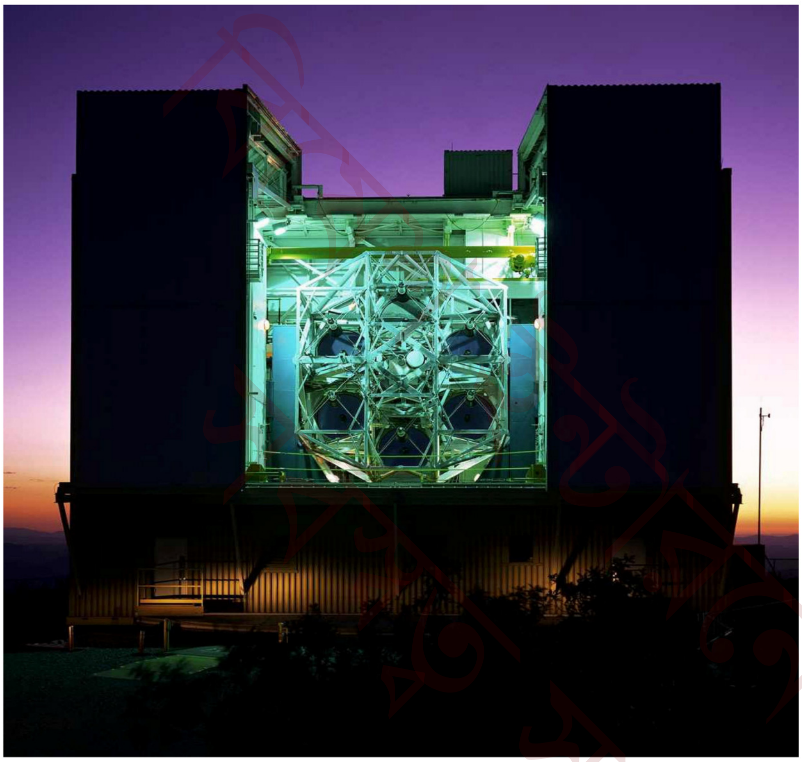
উপরে উল্লেখিত একই সমীকরণ দ্বারা রিফ্লেকটিং টেলিস্কোপের পাওয়ার নির্ণয় করা হয়। আজকের যুগে খুব বড় ব্যাসসম্পন্ন রিফ্লেকটিং টেলিস্কোপ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমার জানা মতে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ রিফ্লেকটিং টেলিস্কোপ রাশিয়ায় স্থাপিত আছে। জেলেনকুক্সকায়া [Zelenchukskaya] নামক স্থানে স্পেশাল আস্ট্রফিকিজ্যাল অবজারভেটরীর প্রধান টেলিস্কোপ এটি। পাশে এর একটি চিত্র তুলে ধরেছি।



১৪. ঙ. একাধিক আয়নার টেলিস্কোপ

বিশ্বের দূর-দূরান্তের গভীর থেকে আগত আলোকরশ্মিতে লুকিয়ে থাকে অসংখ্য রহস্যজনক বস্তু: গ্যালাক্সি, নেব্যুলা, বাইনারি তারা, তারা ক্লাস্টার ইত্যাদি। এগুলো স্পষ্টভাবে দেখা ও তাদের ছবি তোলার লক্ষ্যে টেলিস্কোপের শক্তি যতো বেশী হবে ততোই ভালো। আস্ট্রনোমাররা তাই বড়ো আয়তনের আয়না দিয়ে টেলিস্কোপ নির্মাণ করেন। কিন্তু আয়নার ব্যাস কী পরিমাণ করা যাবে? প্রথমত আয়না বড় হলে নির্মাণ ব্যয়ও বেড়ে যায় বহুগুণ। দ্বিতীয়ত অতিবেশী বড়ো আয়না তৈরী করে টেলিস্কোপে ব্যবহারও কঠিন- এমনকি অসম্ভব। এসব সমস্যা সমাধানে বিজ্ঞানীরা একাধিক আয়নার সমন্বয়ে টেলিস্কোপ তৈরির পথ উদ্ভাবন করেছেন। **'মাল্টিপল মিরর টেলিস্কোপ'** [Multiple Mirror

Telescope -MMT] নামক এসব রিফ্লেকটিং দূরবীক্ষণ যন্ত্রের একটি স্থাপিত হয়েছে আমেরিকার আরিজনায় **'উইপল অবজারভেটরী'** [Whipple Observatory] নামক মহাকাশ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে। নীচে এর একটি ছবি তুলে ধরেছি।



উপরোক্ত এমএমটি টেলিস্কোপের মধ্যে মোট ৬টি আয়না আছে। প্রতিটির ব্যাস ১.৮ মিটার। প্রত্যেক আয়না থেকে প্রতিবিম্বিত আলো একটি মাত্র ফোকাসে নিয়ে আসা হয়। পর্যবেক্ষণের সময় প্রয়োজনে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কম্পিউটারের মাধ্যমে এক বা একাধিক আয়নার অবস্থান পরিবর্তন করা হয়। আরো বেশিসংখ্যক আয়নার সমন্বয়ে টেলিস্কোপ নির্মাণের কাজ চলছে।

১৫. চ. মহাকাশে স্থাপিত টেলিস্কোপ

পৃথিবীর জমিনে যতো বড় অপটিকেল টেলিস্কোপই স্থাপন হোক না কেনো, বায়ুমণ্ডলের কারণে প্রাপ্ত ছবি অনেকটা বিকৃত হয়ে যায়। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বিকৃত ছবি ব্যবহার গ্রহণযোগ্য নয়। আধুনিক যুগে মহাকাশ অনুসন্ধান [space exploration] দ্রুত উন্নততর হওয়ায় বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে কৃত্রিম উপগ্রহ হিসাবে টেলিস্কোপ স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ নিয়েছেন। ইতোমধ্যে বেশ ক'টি অপটিকেল টেলিস্কোপ মহাকাশে প্রেরিতও হয়েছে। তবে এ যুগের সর্বাপেক্ষা উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রজেক্টের নাম **'হাব্‌ল স্পেইস টেলিস্কোপ'** [Hubble Space Telescope - HST]। নীচে মহাকাশে ভাসমান এই টেলিস্কোপের একটি [বাস্তব] ছবি তুলে ধরেছি। হাব্‌ল পৃথিবী থেকে ৫৭০ কিলোমিটার ঊর্ধ্বে প্রদক্ষিণরত আছে।



১৯৯০ সালে এইচএসটি মহাকাশে প্রেরিত হয়। এটা একটি অপটিকেল-আলট্রাভাইলট [Optical-Ultraviolet] টেলিস্কোপ। তার প্রাইমারী আয়নার ব্যাস ২.৪ মিটার। অন্য সিস্টেম থেকে এই টেলিস্কোপ দ্বারা ৩-৪ শতগুণ বেশী পরিমাণ মহাকাশ অঞ্চল দেখা যায়। ইতোমধ্যে

হাব্‌ল টেলিস্কোপ মহাবিশ্বের অতি ক্ষুদ্র দূরতম অংশের একাধিক ছবি প্রেরণ করে পুরো বিজ্ঞানজগতে বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। দেখা গেছে অতি ক্ষুদ্র এসব অঞ্চলেও হাজার হাজার গ্যালাক্সি বিদ্যমান যাদের একেকটিতে আছে কোটি কোটি তারা। নিম্নে সর্বশেষ **'হাব্‌ল ডীপ স্পেইস'** [Hubble Deep Space] ছবিটি তুলে ধরলাম।



১৩. জ. রেডিও টেলিস্কোপ [Radio Telescope]

১৯৩১ সালে আমেরিকার বেল টেলিফোন ল্যাবেরোটরিজ ইঞ্জিনিয়ার কার্ল জান্সকি [১৯০৫-১৯৫০] সাধারণ এ্যান্টেনা [এরিয়েল] ব্যবহার করাকালে একান্ত অজান্তেই **'রেডিও আস্ট্রনোমি'** [radio astronomy] আবিষ্কার করেন। তিনি বুঝতে পারলেন, একটি অস্বস্তিকর রেডিও সিগনাল হাজার হাজার আলোক-বৎসর দূরে অবস্থিত আমাদের গ্যালাক্সির কেন্দ্র থেকে আসছে। এতে এটাই প্রমাণিত হলো, বস্তু থেকে শুধুমাত্র দৃশ্যমান আলো [বা ছবি] বেরিয়ে আসে না- বরং বর্ণচ্ছটার বিভিন্ন তরঙ্গে অনেক গোপন তথ্য প্রত্যেক বস্তু চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেয়। আলোকের গতিতে এসব তথ্য সমগ্র বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত হয়ে আছে। বিজ্ঞানীরা আজকের যুগে বর্ণিত গোপন তথ্যাদি **'জব্দ'** করে গবেষণা চালিয়ে জগৎ সম্পর্কে জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করে যাচ্ছেন প্রতিনিয়ত। যে যন্ত্রের মাধ্যমে তথ্যাদি আটকা পড়ে তা-ই হলো রেডিও টেলিস্কোপ।



বুঝতেই পারছেন, রেডিও টেলিস্কোপ মূলত বিরাট আয়তনের এ্যান্টেনা ডিশ। ইলেকট্রমেগনেটিক রেডিয়েশনের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ব্যাপ্তি বিরাট। তাই টেলিস্কোপ যতো বড় হবে তথ্য সংগ্রহ ততো বেশী সম্ভব। রেডিও তরঙ্গদৈর্ঘ্য ১ মিটার থেকে ১ কিলোমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। অপরদিকে দৃশ্যমান আলোক-তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য মাত্র ০.০০১ মিলিমিটার। সুতরাং অপটিকেল টেলিস্কোপ খুব মসৃণ হওয়া চাই- অন্যথায় সংগ্রহিত ছবি হবে বিকৃত। এ ক্ষেত্রে রেডিও টেলিস্কোপ ওয়েভলেন্থ দীর্ঘ হওয়ায় অপেক্ষাকৃত অমসৃণ হলেও সমস্যা নেই। অন্যদিকে দূর-মহাকাশ থেকে আগত তরঙ্গের শক্তি অতি দূর্বল। আকাশ থেকে পড়ন্ত একটুকু তুষার যে অল্প পরিমাণ এনার্জিসহ পৃথিবীর জমিনে পতিত হয় ঠিক ততোটুকু মাত্র শক্তি নিয়ে রেডিও তরঙ্গ আসে। সুতরাং কৃত্রিম রেডিও তরঙ্গ যাতে বেজাল সৃষ্টি না করতে

পারে সেদিকে খিয়াল রাখা চাই। এ কারণেই রেডিও টেলিস্কোপ স্থাপিত হয়েছে শহর থেকে দূরে, নিভৃত অঞ্চলে। এমনকি পাহাড়ের উপরও। নিম্নের চিত্রটি দেখুন।
এখানে টেলিস্কোপ ছবি: ক্যাপশন- আরেসিবো রেডিও টেলিস্কোপ, পর্টোরিকো: এটা পৃথিবীর সর্ববৃহৎ একক স্থির রেডিও টেলিস্কোপ। পৃথিবীর দৈনিক গতি ব্যবহৃত হয় আকাশের বিভিন্ন স্থান পরীক্ষার জন্য। মূল বউল থেকে প্রতিবিম্বিত সিগনাল সংগ্রহ হয় উপরে স্থাপিত ডিটেক্টরে। বিরাট এই টেলিস্কোপের বউল বা ডিশের ব্যাস ৩০৫ মিটার।

১৩. ঝ. রেডিও ইন্টারফেরোমিটার [Radio Interferometer]

আরেসিবো টেলিস্কোপ কিন্তু দূরতম বস্তু থেকে আগত রেডিও তরঙ্গের জন্য যথেষ্ট নয়। বিজ্ঞানীরা অঙ্ক কষে দেখেছেন, দূরের গ্যালাক্সি থেকে আগত সিগনালকে সত্যিকার অর্থে সূক্ষ্মভাবে গবেষণার জন্য প্রয়োজন আরেসিবো টেলিস্কোপ থেকে অন্তত ৫০ গুণ বেশী ব্যাসবিশিষ্ট রেডিও ডিশের। কিন্তু এরূপ বিরাট ব্যাসসম্পন্ন ডিশ তৈরী আদৌ সম্ভব নয়। তাহলে কি করা? একটি পথ আছে, যার নাম রেডিও ইন্টারফেরোমেট্রি [radio interferometry]। আস্ট্রনোমার একাধিক টেলিস্কোপ বিশেষ দূরত্বে স্থাপন করেন। ফলে একই বস্তুর রেডিও সিগনাল একত্রে গবেষণা করা যায়, যা ঐ ৫০ গুণসম্পন্ন টেলিস্কোপের নামান্তর হবে। পৃথিবীর একটি বৃহৎ ইন্টারফেরোমিটার স্থাপিত হয়েছে আমেরিকার নতুন মেক্সিকোর সকোরো শহরের নিকট। সঙ্গত কারণে এর নামকরণ হয়েছে, **'ভেরি লার্জ আরে'** [Very Large Array - VLA]। ইংরেজী অক্ষর 'Y' এর মতো সৃষ্ট এই টেলিস্কোপ আরেতে আছে ২৫ মিটার ব্যাসসম্পন্ন মোট ২৭টি ডিশ-এ্যান্টেনা। আরের তিনটি হাতের একেকটির দূরত্ব ২১ কিলোমিটার। নীচের চিত্রটি দেখুন।


Very Large Araay - VLA

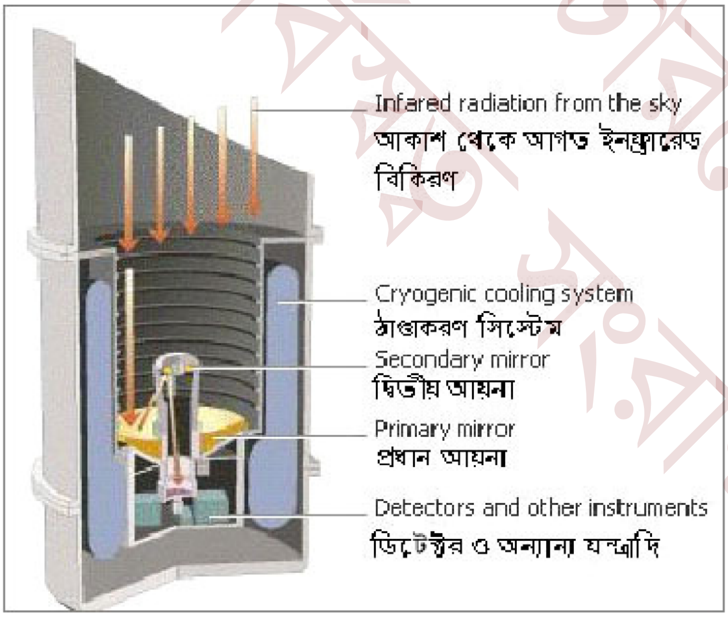
উপরোক্ত ভিএলএ রেডিও সিগনাল নির্গতকারী বস্তু অপটিকেল টেলিস্কোপের তুলনায় হাজার গুণ পরিষ্কারভাবে দেখতে সক্ষম। তবে পৃথিবীর জমিনে স্থাপিত সব ধরনের রেডিও টেলিস্কোপ আজকাল বেশী থেকে বেশী সমস্যায় ভুগছে আধুনিক রেডিও-ভিত্তিক যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্রমোন্নতির ফলে। পুরো বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে কৃত্রিম রেডিও সিগনাল। আজকের মোবাইল, টিভি সম্প্রচার, বিমান-ট্রাফিক কন্ট্রোল ইত্যাদি সবই রেডিও তরঙ্গে কাজ করে।

সুতরাং এ সমস্যার সমাধানে স্থাপিত হয়েছে মহাকাশে অপটিকেল ও রেডিও টেলিস্কোপ, যার বর্ণনা আমরা ইতোমধ্যে তুলে ধরেছি।

১৩. ঞ. অন্যান্য তরঙ্গের টেলিস্কোপ

অপটিকেল তথা আলোক এবং রেডিও টেলিস্কোপ ছাড়াও আরো বেশ ক'টি টেলিস্কোপ উদ্ভাবন করা হয়েছে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য। আমরা এগুলোর উপর সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করে আজকের লেকচারের ইতি টানবো।

১. ইনফ্রারেড টেলিস্কোপ [infrared telescope]: আমাদের নিজস্ব মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি [Milky Way Galaxy] এবং বাইরের অন্যান্য গ্যালাক্সিতে অন্ধকারাচ্ছন্ন কণায় পরিপূর্ণ অনেক অঞ্চল বিদ্যমান। এসব এলাকা গবেষণার জন্য বিজ্ঞানীরা উদ্ভাবন করেছেন বর্ণচ্ছটার ইনফ্রারেড রিজিওনের টেলিস্কোপ। কারণ এসব অন্ধকার এলাকা থেকে রেডিও কিংবা আলোক তরঙ্গে তেমন শক্তিশালী কিছু আমাদের পৃথিবীর ধারেকাছে না আসলেও, ইনফ্রারেড তরঙ্গে কিছুটা আসে। তারার জন্ম, প্লানেটারি সিস্টেমের উৎপত্তি, প্লানেটারি বায়ুমণ্ডল ও ধূমকেতুর স্বরূপ ইত্যাদি গবেষণায়ও ইনফ্রারেড টেলিস্কোপ বিশেষ প্রয়োজনীয়। নীচে ইনফ্রারেড টেলিস্কোপের প্রিন্সিপাল তুলে ধরলাম।

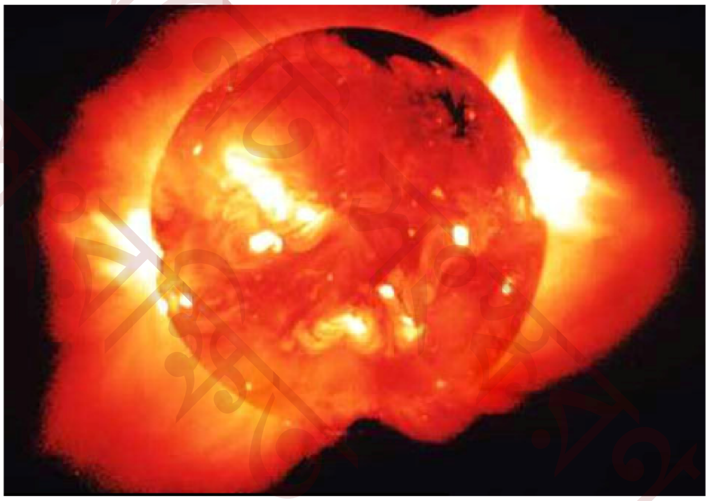


২. আলট্রাভাইলোট টেলিস্কোপ [ultraviolet telescope]: জগতজুড়ে অসংখ্য বস্তুর কেন্দ্র যেমন তারা, গ্যালাক্সি, নেব্যুলা, ক্লাস্টার ইত্যাদি অত্যন্ত উচ্চ তাপমাত্রা ও এনার্জিসম্পন্ন। এসব কেন্দ্র থেকে নির্গত হচ্ছে বর্ণচ্ছটার আলট্রাভাইলোট তরঙ্গ যা আমাদের পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল আটকে রাখে। সুতরাং এই তরঙ্গে কোনো বস্তু গবেষণা পৃথিবীর জমিনে থেকে তেমন একটা সুবিধাজনক নয়। বিজ্ঞানীরা তাই মহাকাশে প্রদক্ষিণরত অবস্থায় একাধিক আলট্রাভাইলোট টেলিস্কোপ স্থাপন করেছেন। ইতোমধ্যে উল্লেখিত **'হাব্‌ল স্পেইস টেলিস্কোপ'** [Hubble Space Telescope] এবং অনুরূপ আরো কিছু প্রদক্ষিণরত টেলিস্কোপে আলট্রাভাইলোট রেঞ্জে বস্তু পরীক্ষার যন্ত্রপাতি যুক্ত করা হয়েছে। নীচে **'ইন্টারনেশনাল আলট্রাভাইলোট এক্সপ্লোরার'** [international ultraviolet explorer] টেলিস্কোপের ছবি তুলে ধরেছি।

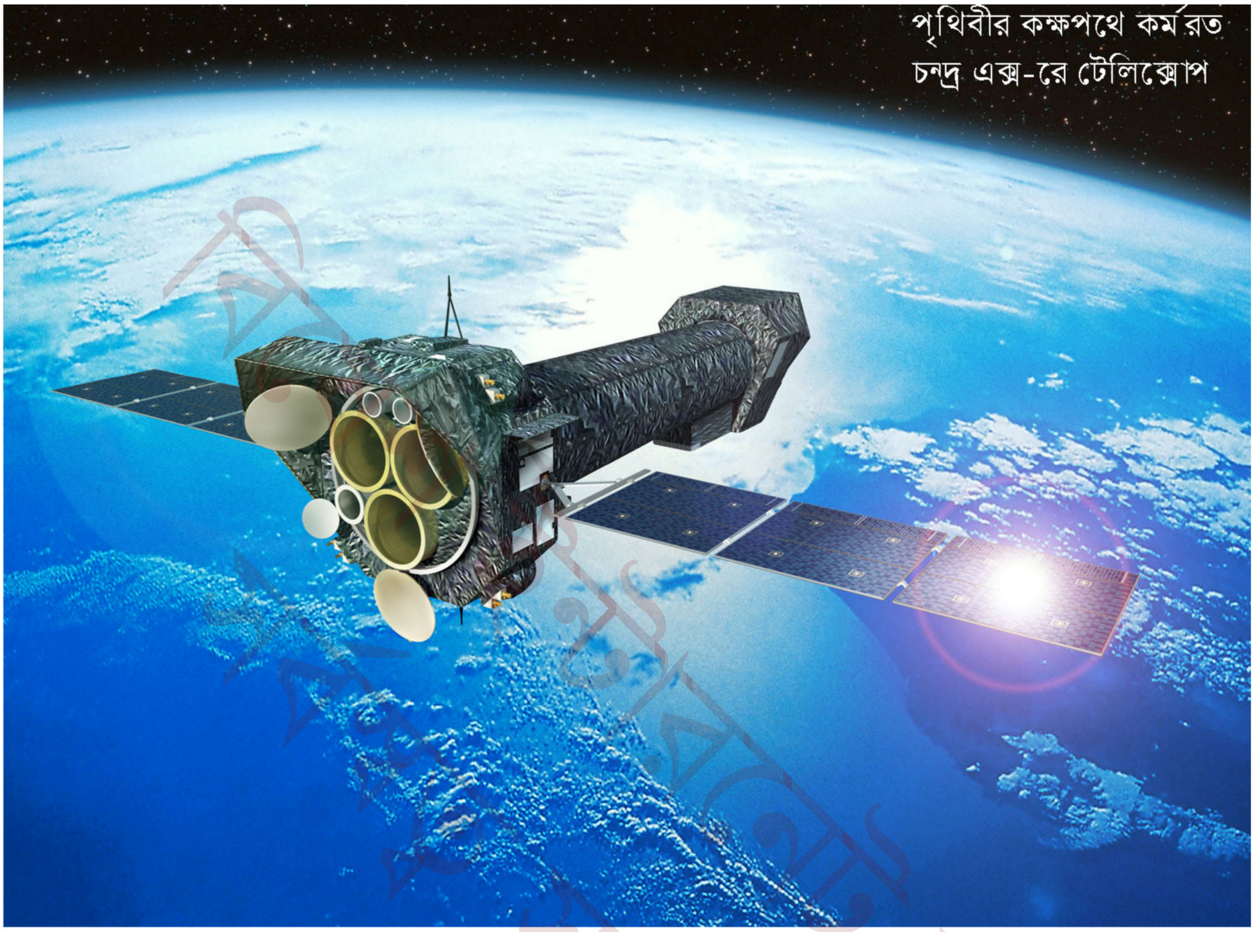


ঠিক অপটিকেল প্রতিবিম্ব টেলিস্কোপের মতোই এটি ডিজাইন করা হয়েছে। তবে মূল আয়নার মধ্যে বিশেষ লেপ আছে যা আল্ট্রাভাইলোট তরঙ্গকে সঠিকভাবে প্রতিবিম্ব করে।

৩. এক্স-রে টেলিস্কোপ [x-ray telescope]: নীচের চিত্রটি দেখুন। এটা কী বলে মনে হয়? মানবদেহের অভ্যন্তরের চিত্র তুলতে ব্যবহৃত হয় এক্স-রে। অবশ্য আমাদের দেহ এক্স-রে তৈরী করে না। কৃত্রিম উপায়ে এক্স-রে দেহের মধ্যদিয়ে চালনা করে ছবি তুলতে হয়। জগতের অনেক বস্তু যেমন আমাদের সূর্য এই এক্স-রে তরঙ্গ নিজেরাই সৃষ্টি করে ছড়িয়ে দিচ্ছে চতুর্দিকের মহাকাশে। বিশেষ এক্স-রে টেলিস্কোপ দ্বারা এই তরঙ্গ ধরা সম্ভব। এবার আশাকরি সকলেই বুঝতে পেরেছেন নীচের ছবিটি কিসের- এটা আমাদের সূর্যের এক্স-রে।

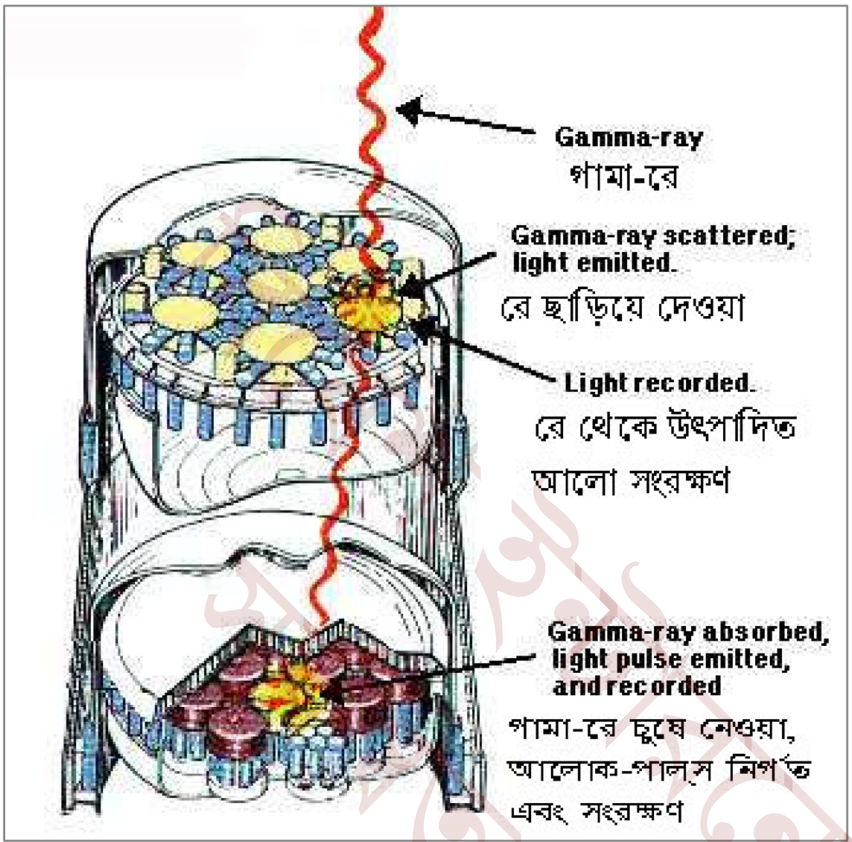


আবিষ্কারটা কিন্তু বিজ্ঞানীদেরকে অবাক করেছিল সে-ই ১৯৬০ দশকে। তখন কেউ ভাবতেই পারে নি, মহাকাশের তারারা এক্স-রে সৃষ্টি করতে পারে। উর্ধ্বাকাশে উড়ন্ত রকেটে এক্স-রে যন্ত্রাদি দ্বারা সূর্যের ছবি তুলে নিশ্চিত হওয়া গেলো এ সত্যটি। আজকাল এক্স-রে টেলিস্কোপ মহাকাশে স্থাপিত হয়েছে। এরূপ একটির নামকরণ হয়েছে পাকিস্তানের লাহোরে জন্মগ্রহণকারী আমেরিকান নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত পদার্থবিদ সুবরামানিয়ান চন্দ্রশেখরের [১৯১০-১৯৯৫] নামানুসারে, **'চন্দ্র এক্স-রে অবজারভেটরী'** [Chandra X-Ray Observatory]। নীচে এই টেলিস্কোপের একটি [বাস্তব] ছবি তুলে ধরেছি।



৪. গামা-রে টেলিস্কোপ [gamma-ray telescope]: আমরা ইতোমধ্যে ইলেকট্রমেগনেটিক স্পেকট্রামের প্রায় সবগুলো তরঙ্গের টেলিস্কোপের কথা বলেছি। যেমনঃ অপটিকেল [আলোক], রেডিও, ইনফ্রারেড, আলট্রাভাইলোট এবং এক্স-রে টেলিস্কোপ। বাকী থাকলো গামা-রে। হ্যাঁ, এক্স-রে থেকেও ক্ষুদ্র এই তরঙ্গদৈর্ঘ্যে জগতের অনেক বস্তু বিকিরণ করছে এনার্জি। এর মূল কারণ হলো বস্তুতে বস্তুতে সংঘর্ষ। বিজ্ঞানীরা থেমে নেই- এই তরঙ্গের এনার্জি পরীক্ষার জন্যও উদ্ভাবন করেছেন গামা-রে টেলিস্কোপ। নিম্নে পরের পৃষ্ঠায় এর মূল ডিজাইন প্রিন্সিপাল তুলে ধরলাম।

জগতের বড় বড় সাংঘর্ষিক বস্তু যেমন নিউট্রন তারা, ব্ল্যাক হোল, সুপারনোভা ইত্যাদি থেকে গামা-রে নির্গত হয়। তবে এসব তরঙ্গ আমাদের পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল অতিক্রম করে ভূ-মণ্ডলে পৌঁছতে পারে না। বিজ্ঞানীরা তাই গামা-রে টেলিস্কোপ মহাকাশে স্থাপন করেছেন। এরূপ একটি হলো **'কম্পটন গামা-রে অবজারভেটোরী'** [Compton Gamma Ray Observatory - GRO]। নিম্নে পরের পৃষ্ঠায় এর একটি ছবি তুলে ধরেছি।



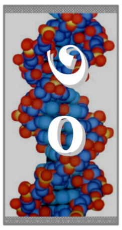
প্রিয় ছাত্রবন্ধুরা! আজকের লেকচারের সমাপ্তি এক্ষুণি হবে। আধুনিক যুগে মহাকাশ বিজ্ঞান গবেষণায় টেলিস্কোপের গুরুত্ব যে কতো অপরিসীম তা এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে অবশ্যই সকলে উপলব্ধি করেছেন, আশারাখি। বাস্তবে আধুনিক জ্যোতিবির্জ্ঞানের মেরুদণ্ড হলো উপরে আলোচিত টেলিস্কোপগুলো। আপনারা হয়তো জানেন, মহাকাশে স্থাপিত **'হাবল স্পেইস টেলিস্কোপ'** থেকে প্রাপ্ত ছবি জগতের বড়ত্ব ও ব্যাপ্তি সম্পর্কে আমাদের ধারণা পাল্টে দিচ্ছে। এ সম্পর্কে সংবাদ মাধ্যমেও একাধিকবার তথ্য সম্প্রচার করা হয়েছে। যাক, আগামী লেকচারে আমরা আরেকটি **'স্কোপ'** নিয়ে আলোচনা করবো। টেলিস্কোপ দ্বারা দূরতম বস্তু বিভিন্ন তরঙ্গে দেখা ও পরীক্ষা করা হয়। তাহলে স্বভাবের ক্ষুদ্রতম বস্তু অণু-পরমাণু জগৎ দেখা ও গবেষণা কি দিয়ে হবে? বিপরীতমুখী এই জগতের প্রতি দৃষ্টিপাতের যন্ত্রটির নাম অণুবিক্ষণ যন্ত্র বা মাইক্রস্কোপ। আর তা-ই হবে আগামী লেকচারে আমাদের আলোচনার বিষয়।



কম্পটন গামা-রে অবজারভেটরী স্পেইস শাটল থেকে মাহাকাশে স্থাপিত হচ্ছে

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম





বক্তা: ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী, নেশন্যাল ডিপ্লোমা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ইংল্যান্ড।

স্থান: খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সুবিদ বাজার, সিলেট।

ঘ. বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক বিজ্ঞান

বক্তৃতা ৩০ : আধুনিক প্রযুক্তি

১৪. মাইক্রস্কোপ [microscope]

বাংলায় বলে অণুবিক্ষণযন্ত্র। টেলিস্কোপ দ্বারা দেখা হয় দূরের বস্তু বড় করে আর মাইক্রস্কোপ দ্বারা পরীক্ষা করা হয় ক্ষুদ্র বস্তু যা সহজে খালিচোখে পরিষ্কারভাবে দেখা যায় না। এখানেও ছোট্ট বস্তুকে বড় করে দেখার চেষ্টা। প্রিয় ছাত্রবন্ধুরা! হয়তো ভাবছেন, মাইক্রস্কোপ সম্পর্কে কী আর বলার আছে? আছে, আছে বৈকি। এ লেকচার শেষে হয়তো আপনাদের এরূপ ধারণা পাল্টে যাবে। মাইক্রস্কোপ তার আবিষ্কারের পর থেকে বহুদূর এগিয়েছে। অনেক ধরনের মাইক্রস্কোপ এখন উদ্ভাবন করেছেন বিজ্ঞানীরা। বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে টেলিস্কোপের মতো মাইক্রস্কোপের গুরুত্ব কোনো ক্রমেই কম নয়। আসুন, আজকের লেকচারে আধুনিক যুগে ব্যবহৃত মাইক্রস্কোপ পরিচিতি ও কার্যকারিতার উপর বিস্তারিত আলোচনা করা যাক, কেমন?



১৪. ক. বিভিন্ন ধরনের মাইক্রস্কোপ

সচরাচর ব্যবহৃত মাইক্রস্কোপকে **‘আলোক মাইক্রস্কোপ’** বা **‘অপটিকেল মাইক্রস্কোপ’** [optical microscope] বলে। এতে থাকে বিভিন্ন কাচের তৈরী লেন্স। এক-লেন্সবিশিষ্ট মাইক্রস্কোপ অতি সাধারণ। অপরদিকে কম্পাউন্ড [যুক্ত] মাইক্রস্কোপে থাকে একাধিক বিভিন্ন সাইজের লেন্স। সাধারণ মাইক্রস্কোপের বিবর্ধন ক্ষমতা ১ থেকে ১০ গুণ পর্যন্ত হতে পারে। এর রিজোলুশন [resolution] বা পরিচ্ছন্নতা ০.০১

মিলিমিটারের অধিক হয় না। অপরদিকে কম্পাউন্ড মাইক্রস্কোপের ক্ষমতা ২.৫ থেকে ২,০০০ গুণ পর্যন্ত হতে পারে। তাদের রিজেলুশনও উচ্চ- ০.০০০২ মিলিমিটার বলে অনেকে বলেছেন।

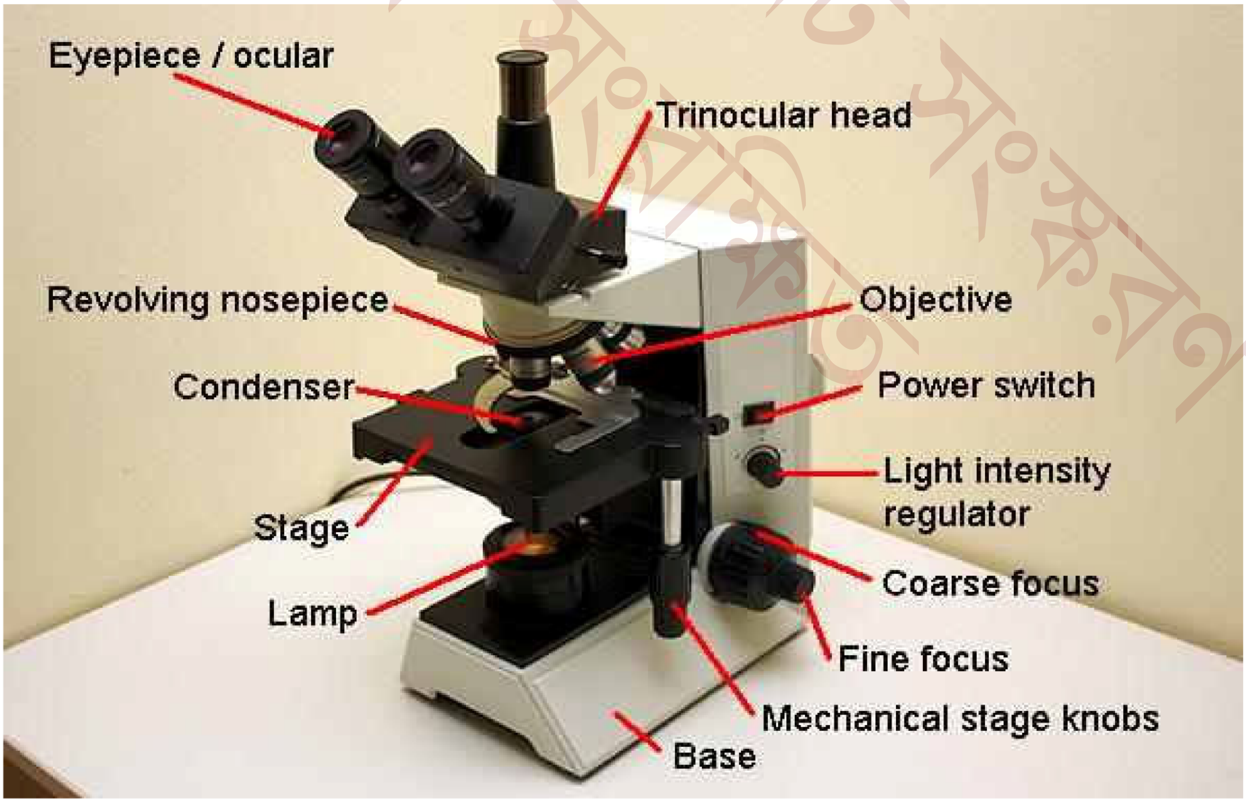
দ্বিতীয় আরেক ধরনের মাইক্রস্কোপ আছে যাদের উপরও আমাদের তথ্যানুসন্ধান চলবে। এক বলে **'ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপ'** [electron microscope]। এটা ইলেকট্রন বীম দ্বারা **'ছবি'** সৃষ্টি করে। ইতোমধ্যে বর্ণিত লাইট মাইক্রস্কোপ একই কাজে ব্যবহার করে আলোকরশ্মি। ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপের বিবর্ধন ক্ষমতা বিরাট। তা **১** হাজার থেকে **১০** লক্ষাধিক পর্যন্ত হতে পারে। এছাড়া এদের রিজেলুশনও বেশী। ০.০০১ থেকে নীচে ০.০০০০০০০১ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে বলে কোনো কোনো নির্মাতা দাবী করেন।

উপরে আলোচিত দু'টি ছাড়াও আরো কিছু মাইক্রস্কোপ আছে যেমন: শব্দতরঙ্গের মাইক্রস্কোপ- একে **'স্কানিং টানেলিং মাইক্রস্কোপ'** [scanning tunneling microscope] নামেও অভিহিত করা হয়েছে। এগুলো সত্যিই ক্ষমতাশীল! এসব মাইক্রস্কোপ দ্বারা বিজ্ঞানীরা একক মলিকিউল ও অণু পর্যন্ত দেখতে পারেন। আমরা এখন এসব বিশেষ মাইক্রস্কোপের ও সাধারণ মাইক্রস্কোপের উপর বিস্তারিত আলোচনা করবো একাধিক ছবিসহ।

১৪. খ. সাধারণ আলোক মাইক্রস্কোপ [simple optical microscope]

এদের আছে একটি কিংবা কম্পাউন্ড [যুক্ত] লেন্স- যার নাম **'মেগনিফাইয়ার'** [magnifier]। এসব লেন্স সাধারণত খোলা অবস্থায় থাকে। সুতরাং আপনি যে বস্তু পরীক্ষা করবেন, সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ক্ষমতাসম্পন্ন লেন্স মূল অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত করতে পারেন। সাধারণ অপটিকেল মাইক্রস্কোপে থাকে ডবল কনভেক্স লেন্স [convex]। এ ধরনের লেন্স দ্বারা পর্যবেক্ষিত বস্তুর বিবর্ধন **১৫** গুণ পর্যন্ত হতে পারে।

কম্পাউন্ড মাইক্রস্কোপে থাকে দু'টি লেন্স। প্রথমটি অবজেক্ট ও দ্বিতীয়টি চোখের লেন্স। বন্ধ টিউবের বিপরীত



শেষাংশে এগুলো রাখা থাকে। এরূপ উপায়ে রাখার মূল উদ্দেশ্য হলো অধিক বিবর্ধন ক্ষমতা নিশ্চিত করা।

১৪. গ. বিশেষ প্রয়োজনে ব্যবহৃত মাইক্রস্কোপ

বিশেষ প্রয়োজনে বিজ্ঞানীরা কিছু মাইক্রস্কোপের উদ্ভাবন করেছেন। এর মধ্যে একটি হলো **'স্টেরেওস্কোপিক মাইক্রস্কোপ'** [stereoscopic microscope]। একটি মাত্র স্পেসিমেনের জন্য দু'টি কম ক্ষমতাসম্পন্ন মাইক্রস্কোপ ব্যবহৃত হয় যাতে বস্তুর ছবিটি ত্রিমাত্রিক দেখা যায়। আরো এক ধরনের মাইক্রস্কোপ আছে যার নাম **'পেট্রোগ্রাফি মাইক্রস্কোপ'** [petrography microscope]। ফ্যাশনেবুল এই নামের অর্থ হলো, এরূপ মাইক্রস্কোপ দ্বারা বিজ্ঞানীরা **'আগ্নেয় শিলা'** [igneous rock] ও **'রূপান্তরিত শিলা'** [metamorphic rock] গবেষণা করেন। আরেকটির নাম **'ডার্ক ফিল্ড মাইক্রস্কোপ'** [dark field microscope]। এরূপ যন্ত্র জীববিজ্ঞান বিষয়ক স্পেসিমেনের জন্য উপকারী। আরেক অণুবীক্ষণযন্ত্রের নাম **'ফেইজ মাইক্রস্কোপ'** [phase microscope]। এগুলো কাজে আসে যখন বিজ্ঞানীরা জ্যান্ত টিস্যু নিয়ে গবেষণা করেন।

টেলিস্কোপের আলোচনাকালে আমরা **'আলট্রাভাইলোট টেলিস্কোপের'** [ltraviolet telescope] কথা বলেছি। এই তরঙ্গে মাইক্রস্কোপও আছে যার নাম **'আলট্রাভাইলোট মাইক্রস্কোপ'** [ultraviolet microscope]। আলট্রাভাইলোট আলোকরশ্মি মানুষের চোখে ধরা দেয় না। তাই মাইক্রস্কোপের দৃশ্যকে ছবি হিসাবে সংরক্ষণ করতে হয়।

'স্কানিং ইন্টারফোরোমেট্রিক আপারচারলেস মাইক্রস্কোপ' [scanning interferometric aperture-less microscope - SIAM] একটি উন্নতমানের আলোক মাইক্রস্কোপ। সাধারণ আলোক মাইক্রস্কোপের বিবর্ধন ক্ষমতা দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মধ্যে সীমিত। সুতরাং এই ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্য থেকে ক্ষুদ্র কোন অংশের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দৃশ্য পরিষ্কারভাবে দেখা সম্ভব নয় ওসব মাইক্রস্কোপ দ্বারা। বিজ্ঞানীরা এ সমস্যার সমাধানে উদ্ভাবন করেছেন উপরোক্ত **'সিয়াম'** মাইক্রস্কোপটি। মাত্র ১ নানোমিটার [এক মিটারের এক বিলিয়ন অংশের এক অংশ] প্রশস্ত অতিক্ষুদ্র মাথাসম্পন্ন সিলিকনের তৈরী একটি অংশ হলো এই মাইক্রস্কোপের প্রধান যন্ত্রাংশ। পর্যবেক্ষণ করা হবে এমন কোনো সাম্পুলে এই যন্ত্রাংশ ২ লক্ষাধিকবার কম্পনের মাধ্যমে আলোকরশ্মি ছিটিয়ে দেয়। এই ছিটিয়ে যাওয়া আলোকরশ্মি ও স্থির আলোকরশ্মির মধ্যে পার্থক্য-নির্ণয়ের মাধ্যমে সাম্পুলের একটি পরিষ্কার চিত্র ফুটে ওঠে। সিয়াম দ্বারা সাধারণ মাইক্রস্কোপের তুলনায় ৬,৫০০ গুণ ছোট্ট ছবিও পরিষ্কার দেখা যায়।
এখানে সিয়াম

১৪. ঘ. ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপ [electron microscope]

ধারণাটা অতি সহজ- ইলেকট্রন দ্বারা কোনো বস্তু **'আলোকিত করা'**। যে যন্ত্রের মাধ্যমে তা সম্ভব তাকেই বলে **'ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপ'** [electron microscope]। বুঝতেই পারছেন, অণুর ক্ষুদ্রতম অংশ ইলেকট্রনের তরঙ্গদৈর্ঘ্য [মনে আছে, ইলেকট্রন তরঙ্গ পথে চলে?] দৃশ্যমান আলোকরশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য থেকে অনেক কম। সুতরাং এগুলো অনেক ছোট্ট বস্তুকে দৃশ্যমান করতে পারে। কিন্তু দেখবো কিভাবে? নীচের [পরবর্তী পৃষ্ঠার] চিত্র দু'টো দেখুন। একটি ক্ষুদ্র ভাইরাসের ও বস্তুর এটমগুলোর চিত্র কী পরিষ্কারভাবে দেখাচ্ছে। এটা **'ইলেকট্রন মাইক্রগ্রাফ'** [electron micrograph] দ্বারা সম্ভব হয়েছে।

দৃশ্যমান আলোর সর্বনিম্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্য হলো ৪,০০০ আংস্ট্রম [এটা এক মিটারের ৪০ মিলিয়ন ভাগের এক ভাগ]। ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপে ব্যবহৃত তরঙ্গদৈর্ঘ্য মাত্র ০.৫ আংস্ট্রম! [এটা এক মিটারের ৫০ ট্রিলিয়ন অংশের এক অংশ মাত্র]। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, কী অল্প পরিমাণ অংশে ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপ তার ক্রিয় করতে পারে।



ইলেকট্রন মাইক্রগ্রাফ থেকে প্রাপ্ত জীবাণুর ছবি

প্রযুক্তি: কৌশলটা অতি সহজ। মাইক্রস্কোপে থাকে একটি **'ইলেকট্রন গান'** [electron microscope]। এই বন্দুক থেকে বেরিয়ে আসে ইলেকট্রন। এগুলো **'স্পেসিমেন'** [specimen] বস্তুর উপর পতিত হয়। ফোকস সৃষ্টির জন্য আমরা ইতোমধ্যে বলেছি লেন্স ব্যবহৃত হয়। এটা সম্ভব আলোক-মাইক্রস্কোপে। ইলেকট্রনকে ফোকাসে আনতে প্রয়োজন **'মেগনেটিক ফিল্ডে'**র [magnetic field]। বাতাস একটি সমস্যা। খুব সহজে ইলেকট্রনের সঙ্গে বাতাসের ইলেকট্রন মিথস্ক্রিয়া করে। এ সমস্যা দূর করার একমাত্র উপায় হলো অভ্যন্তরের সকল বাতাস সরিয়ে দিতে হবে! আর তা-ই করা হয়। স্পেসিমেনের ছবি যাতে সংরক্ষণ হয় সে ব্যবস্থাও মাইক্রস্কোপের ভেতর থাকে। দু' ধরনের ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপ খুব বেশী ব্যবহৃত হচ্ছে। নীচে এ দু'টির উপর আরো কিছু আলোচনা।



ইলেকট্রন মাইক্রগ্রাফ থেকে প্রাপ্ত এটমের ছবি

ট্রান্সমিশন ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপ [transmission electron microscope - TEM]: উপরে উল্লেখিত উপায়ে ইলেকট্রন বীম বস্তুর উপর পতিত হওয়ার পর কিছু ইলেকট্রন বস্তুটি চুষে নেবে, কিছুটা চতুর্দিকে ছিটকে যাবে প্রতিবিম্ব হয়ে এবং কিছুটা চলে যাবে অপর দিকে। শেষোক্ত ইলেকট্রনগুলোই তৈরী করে বস্তুর ছবি। বস্তুর পেছনে **'ফটোগ্রাফিক প্লেট'** [photographic plate] বা **'ফ্লুরেসেন্ট স্ক্রীন'** [fluorescent screen] থাকে যাতে উচ্চ বিবর্ধনসম্পন্ন চিত্র সংরক্ষণ করা হয়। এ ধরনের ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপ দ্বারা স্পেসিমেনকে ১০ লক্ষাধিক গুণ বড় করে দেখা সম্ভব।

স্ক্যানিং ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপ [scanning electron microscope]: এদের বৈশিষ্ট্য হলো স্পেসিমেনকে স্ক্যান করে একটি বিবর্ধন চিত্র গড়ে তোলা। খুব টাইট-ফিট একটি ইলেকট্রন বীমকে ফোকাস করে বস্তুর উপরে নিয়ে স্ক্যান করা হয়। টিভির স্ক্রীনের মতো ইলেকট্রনিক মনিটরে স্ক্যানকরা বস্তুর বিবর্ধন চিত্র দেখতে পারেন একজন গবেষক। এরপর এই চিত্রকে সংরক্ষণ করা যবে পরবর্তীতে প্রিন্টার দ্বারা ছবি বের করতে। স্ক্যানিং

ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপের বিবর্ধন ক্ষমতা অনেকটা কম- লক্ষাধিক পর্যন্ত হয়ে থাকে। তবে এগুলো দ্বারা ত্রিমাত্রিক সুস্পষ্ট ছবি তৈরী করা যায়। অপরদিকে ট্রান্সমিশন ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপ দ্বারা শুধুমাত্র দ্বিমাত্রিক ছবি তৈরী সম্ভব।



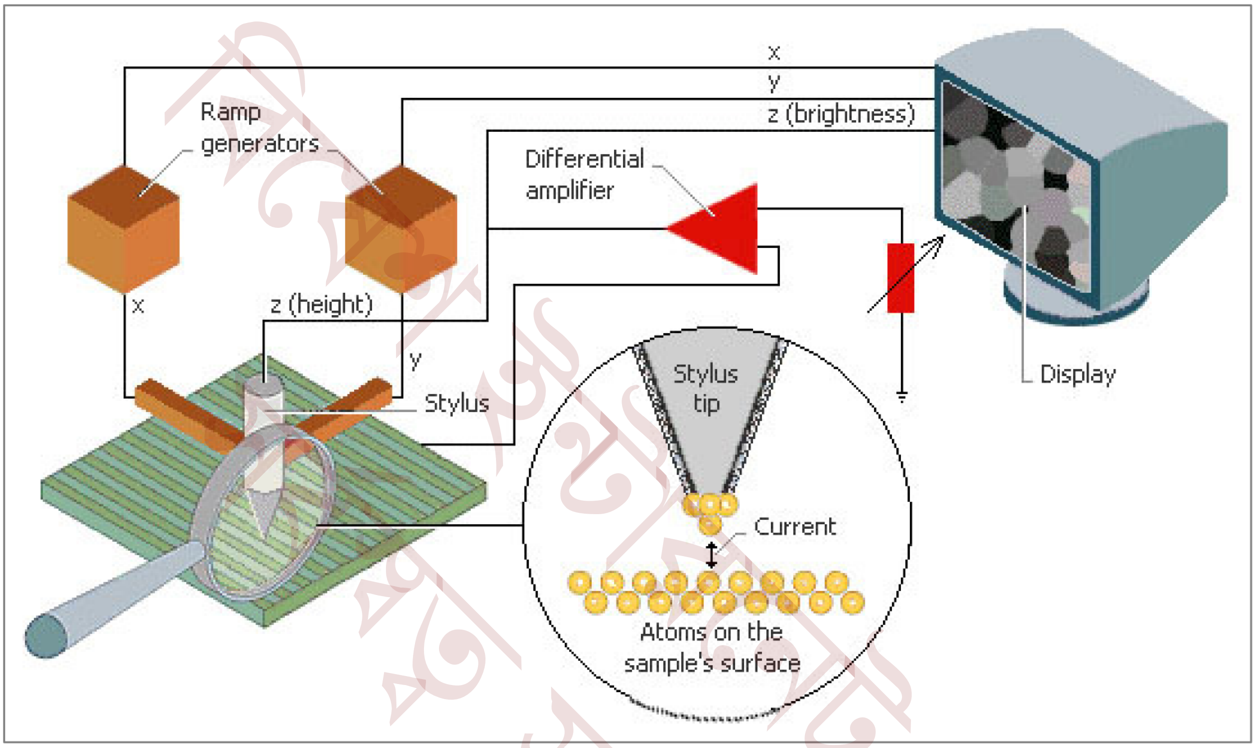
স্ক্যানিং ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপ

অপর আরেক মাইক্রস্কোপ ইদানিং উদ্ভাবন হয়েছে। এটা মূলত উপরে আলোচিত উভয়টির সমন্বিত রূপ। এর নামকরণ হয়েছে **'স্ক্যানিং ট্রান্সমিশন ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপ'** [scanning transmission electron microscope -STEM]। এটাই একক অণুর ছবি ওঠাতে সক্ষম। আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মাইক্রস্কোপ উদ্ভাবন হয়েছে। আমরা এগুলোর নামও কার্যকারিতা অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করবো মাত্র।

'ইলেকট্রন প্রোব মাইক্রএ্যানালাইজার' [electron probe microanalyzer]: এরূপ মাইক্রস্কোপের সঙ্গে লাগানো থাকে এক্স-রে বর্ণচ্ছটা গবেষকযন্ত্র। স্পেসিমেন থেকে এক্স-রে নির্গত হলে এই যন্ত্র দ্বারা গবেষণা করা যায়। বিবর্ধন চিত্র ছাড়াও এই মাইক্রস্কোপ দিয়ে বস্তুর রসায়নিক তথ্যাদি জানা সম্ভব।

স্ক্যানিং প্রোব মাইক্রস্কোপ [scanning probe microscope]: এটা উপরে বর্ণিত ইলেকট্রন প্রোব মাইক্রএ্যানালাইজারের মতোই কাজ করে। তবে এতে কোনো এক্স-রে যন্ত্র সংযুক্ত থাকে না। সাম্পুলের উপরিভাগ প্রোব দ্বারা স্ক্যান করে ত্রিমাত্রিক বিবর্ধন চিত্র তৈরী করাই এর কাজ। প্রোবের মাথা এতোই সরু যে, একটিমাত্র অণু এর ভেতরে ফিট হবে মাত্র। সুতরাং বুঝাই যাচ্ছে, এরূপ মাইক্রস্কোপের বিবর্ধন ক্ষমতা কতো বেশী হতে পারে।

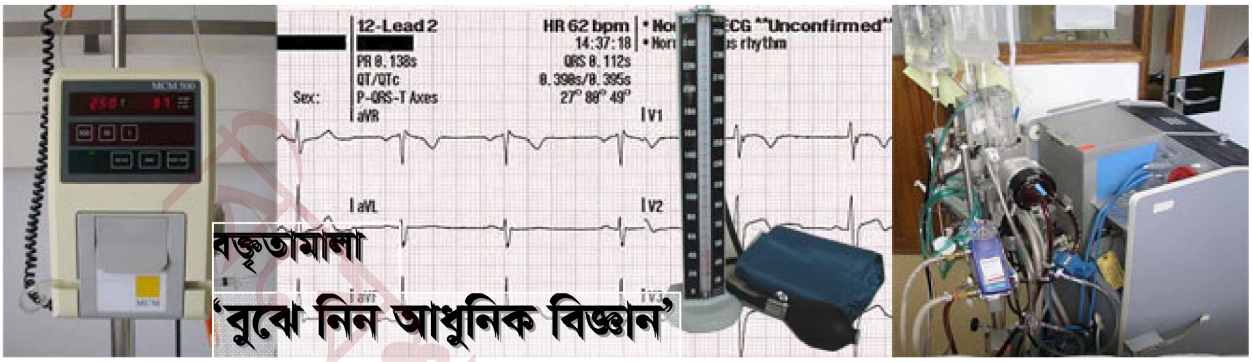
উপরে বর্ণিত মাইক্রস্কোপের একটি নাম **‘স্ক্যানিং টানেলিং মাইক্রস্কোপ’** [scanning tunneling microscope -STM]। নীচের চিত্রে এর প্রিন্সিপাল ডিজাইন তুলে ধরেছি। এই যন্ত্রে ক্যুয়ান্টাম ফিজিক্সের একটি সত্যকে কাজে লাগায়। এ যন্ত্রের মাধ্যমেও বস্তুর বিবর্ধনসম্পন্ন একটি ত্রিমাত্রিক চিত্র তৈরী করে।

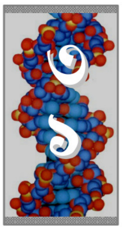


এটমিক ফোর্স মাইক্রস্কোপ [atomic force microscope -AFM]: অত্যাধুনিক এই টানেলিং প্রযুক্তির মাইক্রস্কোপের বৈশিষ্ট্য হলো সাম্পুলের উপর স্ক্যানের সময় এটমিক শক্তি দ্বারা প্রোবটির উপর-নীচে চলন্ত হওয়া। আর এ থেকেই বস্তুর বিবর্ধনসম্পন্ন চিত্র তৈরী করা।

প্রিয় ছাত্রবন্ধুরা! বিজ্ঞানের নির্যাস **‘প্রযুক্তি’**র উপর চৌদ্দটি অত্যাধুনিক গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রের উপর আমরা আলোচনা শেষ করেছি। একটি বিষয় বাকী আছে। মেডিকেল বিজ্ঞানে ব্যবহৃত কয়েকটি যন্ত্রের উপর কিছুটা তথ্য তুলে ধরা জরুরী মনে করছি। আমরা তাই পরবর্তী দু’একটি লেকচারে সেদিকেই মনোনিবেশ করার ইচ্ছা রাখি।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম





বক্তা: ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী, নেশন্যাল ডিপ্লোমা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ইংল্যান্ড।

স্থান: খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সুবিদ বাজার, সিলেট।

ঘ. বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক বিজ্ঞান

বক্তৃতা ৩১ : আধুনিক প্রযুক্তি

১৫. মেডিকেল যন্ত্রপাতি

আমরা আশা করছি শীঘ্রই **'মেডিকেল বিজ্ঞানের'** উপর মৌলিক কিছু আলোচনা করবো। আজকের লেকচারে আধুনিক প্রযুক্তির গুরুত্ববহ কয়েকটি মেডিকেল যন্ত্রের উপর তথ্যানুসন্ধান চালাবো। আপনারা অবগত আছেন, আজকের মেডিকেল সাইন্স [medical science] মূলত উন্নতমানের যন্ত্রাদির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। টেস্ট ছাড়া সাধারণ কোনো রোগেরও চিকিৎসা আজকাল হয় না। যেসব যন্ত্র জনপ্রিয় বা বলতে হবে ডাক্তার-প্রিয় হয়ে ওঠেছে এ যুগে, ওগুলো আসলে কিভাবে কাজ করে? আজকের লেকচারে সব উন্মোচন হবে।

১৫. ক. মেডিকেল যন্ত্রাদির ধরন

মেডিকেল যন্ত্রাদি মূলত কয়েক ধরনের হয়ে থাকে, যেমন: **১. ডায়াগনস্টিক [Diagnostic], ২. থেরাপিউটিক [Therapeutic], ৩. লাইফ সাপোর্ট [Life support], ৪. মনিটর [Monitor] ও ৫. ল্যাবেরোটরি যন্ত্রাদি [Laboratory]**। আমরা এগুলোর উপর আরো কিছু তথ্য তুলে ধরবো।

১. ডায়াগনস্টিক যন্ত্রাদি

এসব যন্ত্রের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ক'টি হলো আলট্রাসাউন্ড [ultrasound], এমআরই [magnetic resonance imaging- MRI], ক্যাট [computerized axial tomography -CAT], পিইটি [positron emission

tomography -PET], এবং এক্স-রে [X-Ray]। রোগ সনাক্তকরণে আজকাল এ যন্ত্রগুলো খুব বেশী কাজে লাগছে। আমরা এবার একে একে এগুলোর উপর তথ্যাদি তুলে ধরবো।

১. ক. আলট্রাসাউন্ড [ultrasound]: চিকিৎসা শাস্ত্রে **'আলট্রাসনোগ্রাফি'** [ultrasonography] একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আলট্রাসাউন্ড বা অতিশব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে দেহের অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন দেহযন্ত্রের **'ছবি'** স্ক্রীনে অঙ্কিত করা হয়। এই উপায়ে প্রাপ্ত চিত্র গবেষণা করে রোগ সনাক্তকরণ হয়ে থাকে।



পদার্থবিজ্ঞানে **'আলট্রাসাউন্ড'** [ultrasound] মানে কানে শোনা যায় না এমন উচ্চ ফ্রিকুয়েন্সিসম্পন্ন শব্দ তরঙ্গকে বুঝায়। সাধারণ এই ফ্রিকুয়েন্সিটি হলো প্রায় ২০ কিলোহার্টজ। আলট্রাসাউন্ডে যে ফ্রিকুয়েন্সি ব্যবহৃত হয় তার মাত্রা ২ থেকে ১৮ মেগাহার্টজ পর্যন্ত হয়ে থাকে। তিনটি পদক্ষেপে শব্দতরঙ্গ থেকে ছবি ভেসে আসে স্ক্রীনে। প্রথমত মেশিন দ্বারা উপযুক্ত শব্দতরঙ্গ সৃষ্টি করতে হবে। দ্বিতীয়ত দেহের অভ্যন্তরস্থ অরগ্যান থেকে ফিরে আসা শব্দতরঙ্গ আটকে রাখা জরুরী। সবশেষে প্রতিবিম্বিত এই শব্দতরঙ্গ থেকে তৈরী করতে হবে ছবি, গবেষণার জন্য।

শব্দতরঙ্গ সৃষ্টি: সিরামিকের তৈরী **'পিযোইলেকট্রিক ট্রান্সডিউসার'** [piezoelectric transducer] দ্বারা শব্দতরঙ্গ সৃষ্টি করা হয়। এই তরঙ্গ দেহের ভেতর প্রবেশ করে ফিরে আসে। ফেরৎ আসা শব্দতরঙ্গ মেশিনে চলে যায়।

প্রতিবিম্ব শব্দতরঙ্গ আটকে রাখা: ট্রান্সডিউসারে যেভাবে শব্দতরঙ্গ দেহের ভেতর পাঠিয়েছিল ঠিক অনুরূপ উল্টোদিকে ট্রান্সডিউসারে শব্দতরঙ্গ প্রতিবিম্ব হয়ে ফিরে আসে। এই ফিরে আসা তরঙ্গেই তথ্য নিহিত থাকে। এসব তরঙ্গ আটকে রাখতে হবে। ইলেকট্রনিক যন্ত্রাদি এই তরঙ্গকে সিগনালে পরিণত করে পাঠিয়ে দেয় স্ক্যানারের মূল যন্ত্রে যেখানে এটা প্রসেস করে ছবি তৈরী হয়। নিম্নে একটি ট্রান্সডিউসার দেখানো হয়েছে।



ছবি সৃষ্টি: প্রতিটি প্রতিবিম্বিত শব্দতরঙ্গকে সনোগ্রাফিক স্ক্যানার প্রসেস করে ছবিতে রূপান্তর করে। যে বিজ্ঞান এই প্রক্রিয়ায় কাজে লাগানো হয় তার নাম **'ডপলার এফেক্ট'**। পদার্থবিজ্ঞানের উপর আলোচনাকালে এ সম্পর্কে তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের মনে আছে আশা করি। সনোগ্রাফিক স্ক্যানার দ্বারা সৃষ্ট ছবি প্রদর্শন করার জন্য একটি ডিসপ্লে ইউনিট থাকে। এরপর তা প্রিন্টার দ্বারা বের করে নিয়ে আসা যায়।

বিভিন্ন রোগের কারণ খোঁজা ছাড়াও মায়ের উদরে শিশু কিভাবে বেড়ে ওঠে তা পরীক্ষার জন্য আলট্রাসনোগ্রাফি আজকাল সকলেই ব্যবহার করে থাকেন। এই উপায়ে মাত্র মাস তিনেক পরই শিশু ছেলে না মেয়ে তা-ও সনাক্ত করা হতে পারে।

১. খ. এমআরআই [MRI]: চিকিৎসা শাস্ত্রে 'মেগনেটিক রেজোনেন্স টমোগ্রাফি' [Magnetic Resonance Imaging- MRI] একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। কম্পিউটার প্রযুক্তি, রেডিও তরঙ্গ ও শক্তিশালী মেগনেটিক ফিল্ড ব্যবহারের মাধ্যমে দেহের ছবি তৈরী করে রোগ সনাক্তকরণে এই যন্ত্রটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। দেহের নির্দিষ্ট **'পাতলা কাটা অংশ'** কম্পিউটারের মাধ্যমে চিত্র বানানোই এর কাজ। হৃদযন্ত্র, শিরা-উপশিরা, মস্তিষ্ক ইত্যাদির ছবি যে কোন কোণ থেকে এই যন্ত্র ছবি তুলতে পারে। ফলে এসব দেহযন্ত্রে রোগ-ব্যাধি কি থাকতে পারে তা সহজে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। অন্যথায় একই লক্ষ্যর্জনে অস্ত্রোপচার কিংবা কোন উপায়ে ক্যামেরা ঢুকাতে হবে। শেষোক্ত একটি প্রযুক্তি অবশ্য ইতোমধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। এর নাম **'এন্ডোস্কোপি'** [endoscopy]।


MRI মেশিন

আমাদের দেহের অভ্যন্তরে অসংখ্য প্রটন আছে যা হাইড্রোজেন এটমের নিউক্লিয়াসে থাকে। এমআরআই সম্ভব এ কারণেই যে, মানবদেহের ওসব প্রটনে আছে অতি ক্ষুদ্র **'বায়োলজিকেল মেগনেট'** [biological magnet]। এমআরআই প্রযুক্তির মূলই হলো ওসব মেগনেট বা চুম্বক। একজন রোগিকে যখন মেশিনের পাইপের মতো মেগনেটের ভেতরে ঢুকানো হয়, তখন মোট তিনটি পদক্ষেপে রোগ সনাক্তকরণ প্রক্রিয়া শুরু হবে। ১. এমআরআই দেহে সৃষ্টি করে খুব শক্তিশালী স্থির মেগনেটিক ফিল্ড যা পৃথিবীর ফিল্ডের তুলনায় ৩০ হাজার গুণ বেশী। ২. এবার এমআরআই থেকে রেডিও সিগনালের মাধ্যমে দেহের প্রটনগুলোর স্থিত অবস্থায় পরিবর্তন ঘটায়। ৩. রেডিও সিগনাল বন্ধ করে এমআরআই দেহের মধ্য থেকে **'ইলেকট্রমেগনেটিক ট্রান্সমিশন'** [electromagnetic transmission] কিভাবে বেরিয়ে আসছে তা শ্রবণ করে। এই তথ্যাদি থেকেই শেষ পর্যন্ত দেহের অভ্যন্তরের চিত্র গড়ে তুলে।


MRI ছবি

এমআরআই স্ক্যান বেশ ব্যয়বহুল। তবে মস্তিষ্ক, কেন্দ্রীয় নার্ভাস সিস্টেম ইত্যাদির সঙ্গে সম্পৃক্ত রোগ-ব্যাধিতে এমআরআই স্ক্যান বিশেষ ফলপ্রসু হতে পারে। এমআরআই স্ক্যান আজকাল বাংলাদেশেও হচ্ছে, উপকৃত হচ্ছেন অসংখ্য রোগী।

১. গ. ক্যাট [CAT]: 'কম্পিউটেড এক্সিয়েল টমোগ্রাফি' [computed axial tomography -CAT] একটি গুরুত্বপূর্ণ রোগ-সনাক্তকরণ টেকনিক। এই প্রযুক্তির অপর নাম সিটি [Computed Tomography -CT] স্ক্যান। সিটি স্ক্যান অনেকটা এক্স-রে এর মতোই। তবে কম্পিউটারের মাধ্যমে ত্রিমাত্রিক ছবি সৃষ্টিও এতে সন্বিবেশিত আছে। নীচে একটি সিটি স্ক্যানার দেখাচ্ছে।



সিটি স্ক্যানারের মতো অনুরূপ রোগ-সনাক্তকরণ কাজ উন্নতমানের এমআরআই [MRI] স্ক্যানারের মাধ্যমে সম্ভব। ইতোমধ্যে আমরা এমআরআই সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করেছি। সিটি স্ক্যান ওটার তুলনায় বেশ সুবিধাজনক। এটা অনেকটা কম ব্যয়বহুল, পরীক্ষার জন্য সময় লাগে অল্প, বক্ষস্থল ও পেটের চিত্র অধিক পরিষ্কার হয় এবং শক্তিশালী মেগনেটিক ফিল্ড ছাড়াই ছবি সংগ্রহ করার সুযোগ এতে আছে। এসব কারণে ডাক্তাররা সিটি স্ক্যান ব্যবহার ছেড়ে দিচ্ছেন না- যা অনেকে ভেবেছিলেন তা-ই হবে এমআরআই প্রযুক্তির ফলে।

১. ঘ. পিইটি [Positron Emission Tomography -PET]: অভ্যন্তরীণ দেহ-টিস্যুর ছবি তোলার জন্য এই টেকনিক ব্যবহৃত হয়। মস্তিষ্ক টিউমার সনাক্তকরণ ও মস্তিষ্কে স্ট্রোকের ক্রিয়া পরীক্ষার জন্য পিইটি স্ক্যান খুব কার্যকরী। নীচে একটি পিইটি সিস্টেমের ছবি তুলে ধরেছি।



১. ঙ. আধুনিক এক্স-রে [X-Ray]: এক্স-রে মূলত আলোক-রশ্মি থেকে স্বল্প দৈর্ঘ্যসম্পন্ন তেজস্ক্রিয়া। এদের তরঙ্গদৈর্ঘ্য ১০০ থেকে ০.০১ আংস্ট্রম মাত্র। এক্স-রে শিল্প ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এক্স-রে রেডিওগ্রাফ থেকে রোগ সনাক্তকরণ পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। নিশ্চয় আপনাদের কেউ না কেউ এক্স-রে করেছেন বিভিন্ন কারণে। ইতোমধ্যে আলোচিত ক্যাট সিস্টেম মূলত এক্স-রে ও কম্পিউটারের সমন্বয়ে গঠিত। ডানে উন্নতমানের একটি এক্স-রে মেশিনের ছবি তুলে ধরলাম।



২. থেরাপিউটিক যন্ত্রাদি [Therapeutic instruments]

এ ক্যাটাগরির মেডিকেল যন্ত্রাদির মধ্যে **‘ইনফিউশন পাম্প’** [infusion pump], লেইজার [LASER] ও লাসিক [LASIC] নামক যন্ত্রাদির উপর আমরা আলোচনা করবো।

২. ক. ‘ইনফিউশন পাম্প’ [infusion pump]: এ যন্ত্রের কাজ হলো পানীয়, ঔষধ কিংবা জৈবিক পদার্থ রোগির রক্তের মধ্যে পাম্প করে ঢুকানো। নার্সিং স্টাফ দ্বারা সঠিক পরিমাণ ও মাত্রায় জরু রী তরল পদার্থ রোগিদের শিরায় পৌঁছানো সম্ভব নয়। নীচে একটি ইনফিউশন পাম্প দেখানো হলো।



২. খ. লেইজার [LASER]: ফিজিক্সের উপর আলোচনাকালে লেইজার সম্পর্কে তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। আশারাখি সবার মনে আছে। লেইজার আজকাল ভারী শিল্প থেকে মেডিসিনে ব্যবহৃত হচ্ছে। থেরাপির ক্ষেত্রে লেইজার আলোক মানবদেহে সার্জারিতে ব্যবহৃত হয়- যেমন, কাটা, পুড়ানো, টিস্যু ধ্বংস ইত্যাদি। অতি ক্ষুদ্র, শক্তিশালী ও যথার্থ হওয়ায় লেইজার মেডিকেল প্রয়োজনে খুব প্রশস্ত ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে আজকাল। নিম্নোক্ত কয়েকটি কাজে লেইজার কাজে লাগিয়ে থাকেন ডাক্তাররা। লিস্টের পরে একটি লেইজার যন্ত্রের ছবি দিয়েছি।

ক. ফুলেওঠা রক্ত-পূর্ণ মোচড়ে যাওয়া শিরা-উপশিরা চিকিৎসা।
খ. দৃষ্টিশক্তি উন্নতকরণে কর্ণিয়াতে সার্জারি।
গ. চোখের রেটিনা খুলে গেলে তা সঠিককরণ।
ঘ. প্রসস্টেট গ্ল ্যান্ড কেটে ফেলা।
ঙ. কিডনি থেকে পাথর তুলে ফেলা।
চ. চামড়ায় লেইজার সার্জারি।

২. গ. লাসিক [LASIC]: এটাও মূলত লেইজার প্রযুক্তির একটি যন্ত্র। এটা দ্বারা চোখের সার্জারি করা হয়। লাসিক সার্জারি একজন **‘অপথালমোলজিস্ট’** [ophthalmologist] দ্বারা সম্পাদিত হয়ে থাকে। চোখের কর্ণিয়ায় এই অপারেশন করা হয় দৃষ্টিশক্তি উন্নতিকরণে। নীচে [পরের পৃষ্ঠায়] আমরা একটি লাসিক লেইজার মেশিনের ছবি তুলে ধরলাম।



৩. লাইফ সাপোর্ট [Life support] সিস্টেম

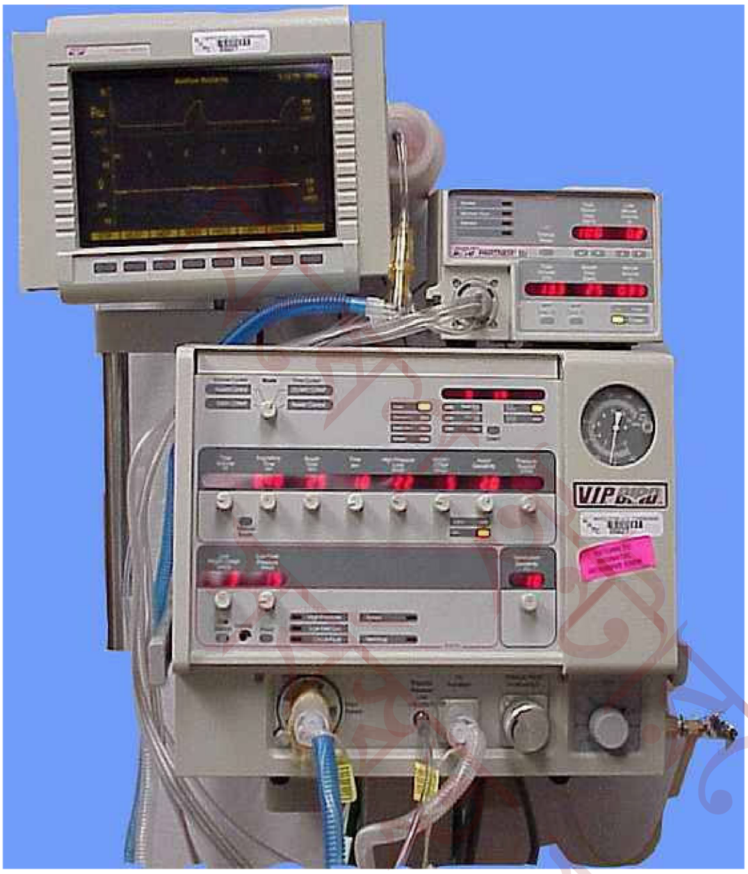


যদি কেউ রোগ-ব্যাধি বা অন্য কোনো মেডিকেল কারণে নিজে নিজে বাঁচার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে তাহলে কৃত্রিম উপায়ে তাকে বাঁচানোর জন্য আজকাল প্রায় সবদেশে তৈরী করা হয়েছে **'লাইফ সাপোর্ট সিস্টেম'**। হাসপাতালে এই সিস্টেম যেখানে স্থাপন করা হয় তার নাম **'ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিট'** [Intensive Care Unit -ICU]। আইসিইউ-তে কাউকে রাখার অর্থ হলো জীবিত রেখে চিকিৎসা অব্যাহত রাখার চেষ্টা। এতে থাকে সর্বাধুনিক মেডিকেল যন্ত্রপাতি, যেমন ইলেকট্রনিক মনিটরিং, কৃত্রিম ভেন্টিলেশন এবং অন্যান্য জীবন-বাঁচানোর যন্ত্রাদি। এছাড়া সর্বোন্নত ঔষধপত্র, অভিজ্ঞ ডাক্তার ও নার্সিং স্টাফ এই সিস্টেমের সঙ্গে সম্পৃক্ত রাখা হয়। লাইফ-সাপোর্ট সিস্টেম মূলত জীবনকে দীর্ঘায়িত করার চেষ্টা মাত্র। এই সিস্টেমে কাউকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য রাখা আদৌ যৌক্তিক বা সম্ভব নয়। তাই এতে রাখার অর্থ, জীবন দীর্ঘায়িত করে চিকিৎসা প্রদান। কিন্তু তাতেও যদি রোগির অবস্থার উন্নতি না হয় তাহলে এক পর্যায়ে লাইফ-সাপোর্ট থেকে অব্যাহতি দিতে হবে। নীচে একটি লাইফ-সাপোর্ট ইউনিট দেখানো হয়েছে।



লাইফ-সাপোর্ট সিস্টেমে যে ক'টি যন্ত্র থাকা আবশ্যক ওগুলো হলো: ক. **'মেডিকেল ভেন্টিলেটর'** [medical ventilators], খ. **'এ্যানায়েস্তেটিক মেশিন'** [anesthetic machines], গ. **'হার্ট-লাং মেশিন'** [heart-lung machines], ঘ. **'ইসিএমও'** [extracorporeal membrane oxygenation -ECMO] এবং ঙ. **'ডায়ালিসিস মেশিন'** [dialysis machines]। আমরা এবার একে একে এগুলোর উপর আরো কিছু তথ্য ছবিসহ তুলে ধরছি।

৩. ক. 'মেডিকেল ভেন্টিলেটর' [medical ventilators]: যদি কোনো রোগি স্বেচ্ছায় শ্বাস-প্রশ্বাস অব্যাহত রাখতে অপারগ হন তখন কৃত্রিম উপায়ে ফুসফুসে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন যোগান ও সেখান থেকে ক্ষতিকর গ্যাস কার্বন ডাইওক্সাইড বের করতে হবে। অন্যথায় রোগি মারা যেতে পারেন। যে যন্ত্রের মাধ্যমে এ কাজটি করা হয় তা-ই হলো মেডিকেল ভেন্টিলেটর। নীচে এরূপ একটি যন্ত্রের ছবি তুলে ধরেছি।



ভেন্টিলেটর ব্যবহৃত হয় ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিট, বাড়িস্থ কেয়ার ও জরুরী বিভাগে। এছাড়া এ্যানাস্তেসিয়া সিস্টেমের একটি ইউনিট হিসাবে এটি কাজে লাগানো হয়। আজকাল ভেন্টিলেটর কম্পিউটার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। কেউ কেউ মেডিকেল ভেন্টিলেটরকে **'রেসপিরেটর'** [respirator] বলে সম্বোধন করেন। ভেন্টিলেটরকে অনেকে **'লাইফ-ক্রিটিকেল সিস্টেম'** [life-critical system] বলেন। অর্থাৎ জীবন-মরণ অবস্থা। এর কারণ হলো, ভেন্টিলেটর অকেজো হয়ে পড়লে রোগির মৃত্যু অনিবার্য হবে। সুতরাং সিস্টেমটা যাতে **'ফুলপ্রুফ'** হয় সেদিকে খিয়াল রাখতে হবে। এসব যন্ত্রাদির ডিজাইন ইঞ্জিনিয়াররা পাওয়ার সাপ্লাই বেকআপ এবং অটোমেটিক সিস্টেম অকেজো হলে নার্সদের নিয়ন্ত্রণে পরিচলন সিস্টেম সংযুক্ত রাখেন। কম্পিউটারের সফটওয়্যার সমস্যা হলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে এলার্ম সিস্টেমও এসব যন্ত্রে সম্পৃক্ত থাকে।

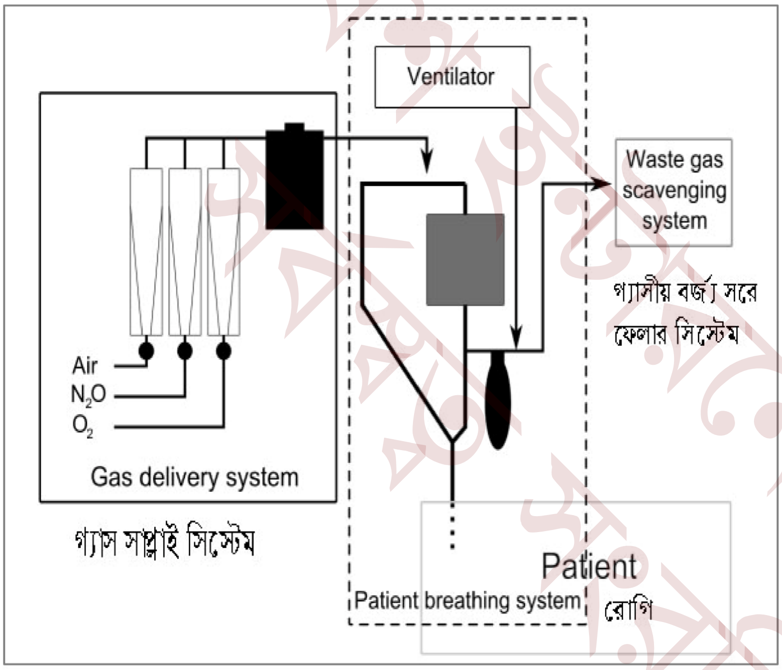
৩. খ. 'এ্যানায়েস্তেটিক মেশিন' [anesthetic machines]: ব্রিটিশ ইংরেজীতে একে **'anaesthetic machinees'** এবং আমেরিকার ইংরেজীতে **'anesthesia machine'** বলে। এর কাজ হলো অস্ত্রোপচারের সময় রোগির দেহে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন, নাইট্রাস অক্সাইড, এ্যানাস্তেটিক বাষ্প যেমন আইসোফ্লোরেইন ইত্যাদি সঠিক মাত্রায় যোগান দেওয়া নিশ্চিত রাখা। আধুনিক বিশ্বের হাসপাতালে এই মেশিনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করে। নীচে এরূপ একটি মেশিনের ছবি তুলে ধরেছি।



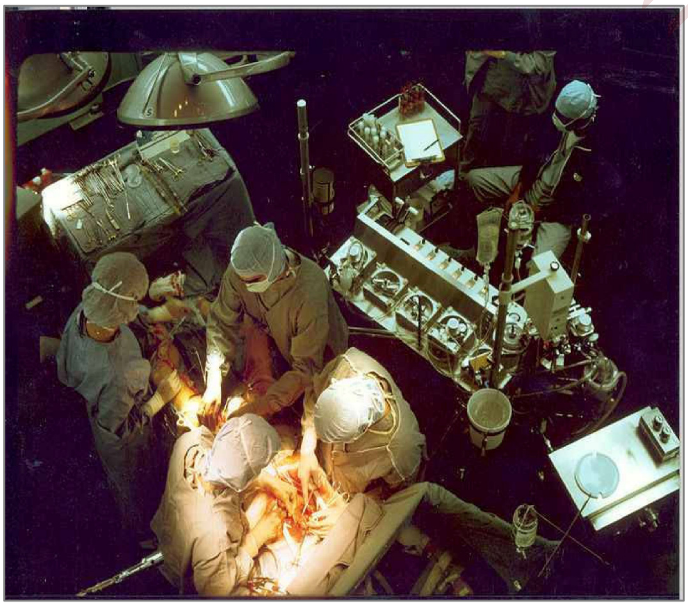
আধুনিক এ্যানায়েস্তেটিক মেশিনে এসব গুরুত্বপূর্ণ অংশ আছে: ১. হাসপাতালের অক্সিজেন, মেডিকেল বাতাস ও নাইট্রাস অক্সাইড সাপ্লাইয়ের সঙ্গে পাইপ দ্বারা সংযুক্তি। ২. সিলিন্ডার ভর্তি রিজার্ভ অক্সিজেন, বাতাস ও নাইট্রাস অক্সাইজ গ্যাস। ৩. উচ্চ গতিসম্পন্ন অক্সিজেন ফ্ল্যাস যার মাধ্যমে ৩০ থেকে ৭৫ লিটার প্রতি মিনিট গ্যাস সাপ্লাই হতে পারে। ৪. গ্যাস সাপ্লাই নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রেসার গেজ ও বাল্ব। ৫. রোগির দেহে গ্যাস প্রবেশ ও বেরকরণ ক্রিয়া মনিটরের ব্যবস্থা। ৬. রোগির হৃদ-

স্পন্দন, ইসিজি, রক্তচাপ এবং অক্সিজেন গলনাঙ্ক মনিটরের জন্য বিশেষ যন্ত্রাদি। এছাড়া দেহ-তাপমাত্রাও মনিটরের প্রয়োজন পড়তে পারে। ৭. শ্বাস-নিঃশ্বাস সার্কেট সিস্টেম। ৮. সার্জারির সময় বর্জ্য সরানোর চোষণ ব্যবস্থা। নীচের চিত্রটি দেখুন।

যে কোন সিস্টেম যেখানে মানুষের জীবন-মরণ সমস্যা সম্পৃক্ত, সেখানে অবশ্যই **'নিরাপত্তা'** [safety] সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রোগির দেহে অস্ত্রোপচারের সময় ব্যবহৃত ভেন্টিলেটর যাতে ফেইল না করে তা নিশ্চিত করা চাই। সুতরাং ভেন্টিলেটর ডিজাইন ইঞ্জিনিয়াররা সর্বাধিক সতর্কতার সঙ্গে নিরাপত্তার দিকটি বিবেচনা করেন। যেমন অক্সিজেন সাপ্লাই অকেজো হলে সাথে সাথে ডাক্তাররা যাতে জানতে পারেন তার জন্য এলার্ম। এজন্য মেশিনে সংযুক্ত থাকে **'অক্সিজেন ফোইলার ওয়ার্নিং ডিভাইস'** [OFWD]। প্রেসার এলার্ম। ইত্যাদি। অবশ্য প্রত্যেকবার ব্যবহারের পূর্বে পুরো মেশিনটির ফাংশন ভালোভাবে চেক করতে হবে কার্যকারিতার নিশ্চিতকরণের জন্য।



৩. গ. 'হার্ট-লাং মেশিন' [heart-lung machines]: সার্জারির সময় হৃদযন্ত্র ও ফুসফুসের অবস্থা ও ফাংশন সার্বক্ষণিক মনিটর জরুরী। এ কাজে আজকাল একটি মেশিন ব্যবহৃত হচ্ছে। এটার নাম **'কার্ডিওপালমোনারি বাইপাস'** [Cardiopulmonary bypass - CPB]। সার্জারির সময় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো রোগির দেহে পর্যাপ্ত পরিমাণ অক্সিজেন সাপ্লাই ও রক্ত চলাচল নিশ্চিত রাখতে হবে। **'ঈচই'** এ কাজটিই স্বয়ংক্রিয়ভাবে করে থাকে। এটি মূলত একটি পাম্প। একে কেউ কেউ **'হার্ট-লাং মেশিন'** বলেন। নীচে এরূপ একটি আধুনিক মেশিনের ছবি তুলে ধরেছি।



হার্ট-লাং মেশিন যেসব অস্ত্রোপচারে কাজে লাগে তাহলো, ১. আর্টারি বাইপাস, ২. হৃদযন্ত্রের বাল্ব মেরামত বা প্রতিস্থাপন, ৩. হৃদযন্ত্রের আর্টারি মেরামত, ৪. হৃদযন্ত্র বদলানো [**হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট**], ৫. রক্ত শিরা থেকে বড় ধরনের বস্তু সরানো, ৬. আর্টারি [**শিরা**] থেকে রক্ত-ক্লট সরানো এবং অন্যান্য হৃদযন্ত্র সম্পৃক্ত অস্ত্রোপচারে এই মেশিন কাজে লাগে।

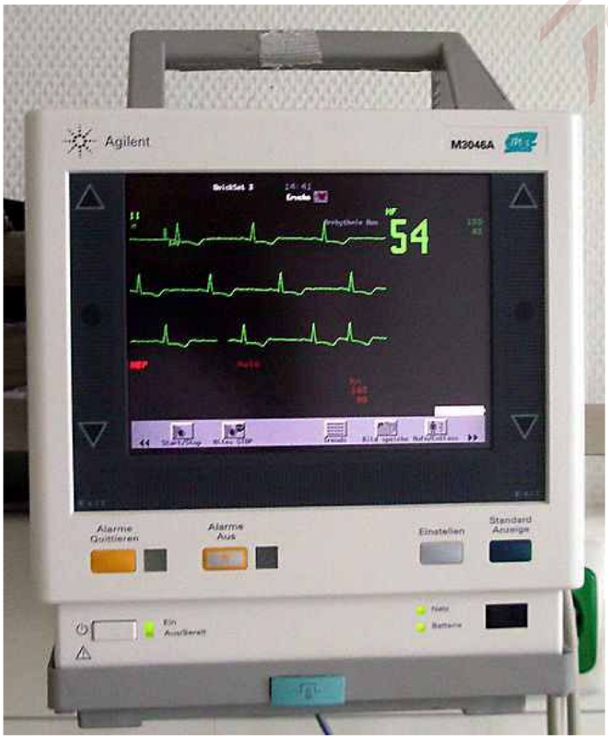
৪. ঘ. **'ইসিএমও' [extracorporeal membrane oxygenation -ECMO]:** রোগির হৃদযন্ত্র ও ফুসফুস যখন কৃত্রিম সাহায্য ছাড়া কাজ করতে ব্যর্থ হয়ে পড়ে তখনই এই যন্ত্রটি কাজে লাগানো হয়। এটা সাধারণত ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিটে থাকে। এই যন্ত্রের মাধ্যমে হৃদযন্ত্র ও ফুসফুসকে ফাংশন করতে সাহায্য করা হয়। মোটকথা, এটা কৃত্রিম শ্বাসযন্ত্র। নীচে একটি ইসিএমও মেশিন দেখানো হয়েছে।



৫. ঙ. **'ডায়ালিসিস মেশিন' [dialysis machines]:** রক্তের মধ্যে অতিরিক্ত পানি ও বর্জ্য থাকে যা সময় সময় সরাতে হয়। সাধারণত এই কাজটি আঞ্জাম দেয় আমাদের কিডনিদ্বয়। কিন্তু এগুলো যদি সঠিকভাবে কাজ করে না তাহলে কৃত্রিম উপায়ে বর্জ্য ও পানি সরানোর ব্যবস্থা বিজ্ঞানীরা উদ্ভাবন করেছেন। আর একেই বলে **'ডায়ালিসিস'** [dialysis]।

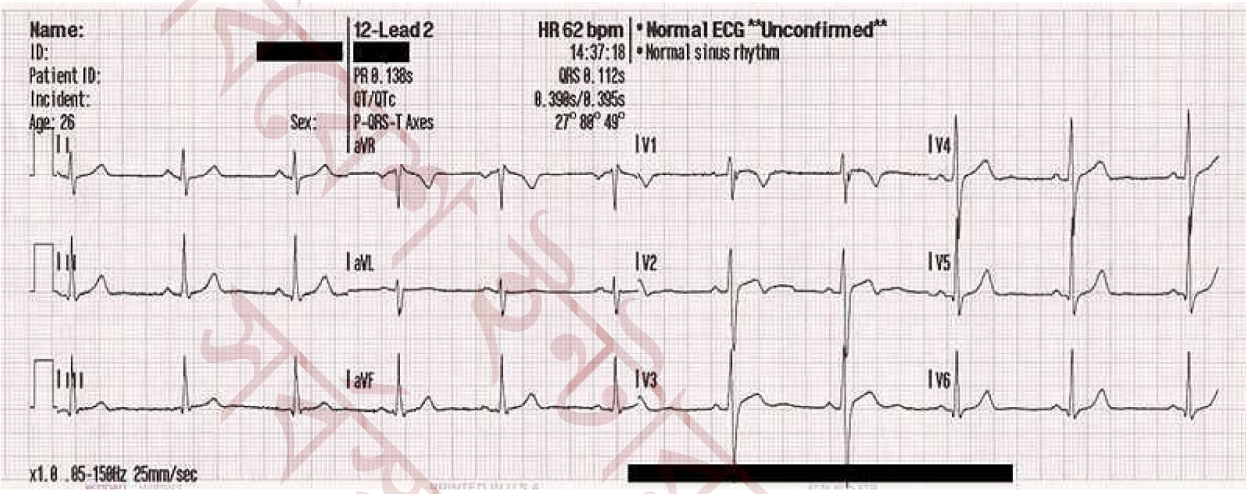
৪. মনিটর [Monitor] সিস্টেম

চিকিৎসা শাস্ত্রে রোগির অবস্থা সর্বক্ষণ জানা একান্ত জরুরী। ইঞ্জিনিয়াররা তাই বেশ কিছু যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন যার মাধ্যমে এক কাজটি সম্পন্ন হয়ে থাকে। মনিটর যন্ত্র দ্বারা রোগির রক্তচাপ, দেহ তাপমাত্রা, হৃদযন্ত্রের স্পন্দন ইত্যাদি জানা যেতে পারে। আমরা এ প্রসঙ্গে ইসিজি [ECG], ইইজি [EEG], রক্তচাপ [Blood Pressure] ও রক্তে গলিত গ্যাস [dissolved gases in blood] মনিটরের যন্ত্রাদির উপর আলোচনা করবো।



৪. ক. **ইসিজি [ECG]: 'ইলেকট্রকার্ডিওগ্রাফ'** [electrocardiograph] বলতে কি বুঝায় তা আপনাদের অনেকেরই জানা আছে। হয়তো অনেকে তা করিয়েছেনও। অন্তত ইসিজি'র মাধ্যমে যে **'গ্রাফ'** বেরিয়ে আসে তা-ও হয়তো দেখেছেন। কিন্তু আসলে এটি কী? আমাদের হৃদযন্ত্রের মধ্যে নেচারেল ইলেকট্রিকেল ক্রিয়া চলছে প্রতি মুহূর্তে। এই ক্রিয়াটি কতটুকু সঠিক তা জানার জন্য ইসিজি টেস্ট। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হৃদযন্ত্রের ইলেকট্রিকেল ক্রিয়া রেকর্ড করা হয় ইসিজি মেশিন দ্বারা। নীচে ইসিজি'র একটি গ্রাফ দেখানো হয়েছে।

সাধারণত রোগির হৃদযন্ত্রের নিকটে ৬টি, উভয় হাতে ২টি এবং উভয় পায়ে ২টি- মোট এই ১০ **'ইলেকট্রোড'** [electrode] লাগানো হয়। এগুলো মূলত সেন্সর। ইলেকট্রিক তারের মাধ্যমে এসব সেন্সরের সঙ্গে যুক্ত থাকে রেকর্ডার মেশিন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হৃদযন্ত্রের স্পন্দন ঠিক কিভাবে হচ্ছে তা-ই রেকর্ড করা হয় ইসিজি মেশিন দ্বারা। ডাক্তাররা এটা পরীক্ষা করে বুঝতে পারেন রোগির হৃদযন্ত্র স্বাভাবিক না অস্বাভাবিক।

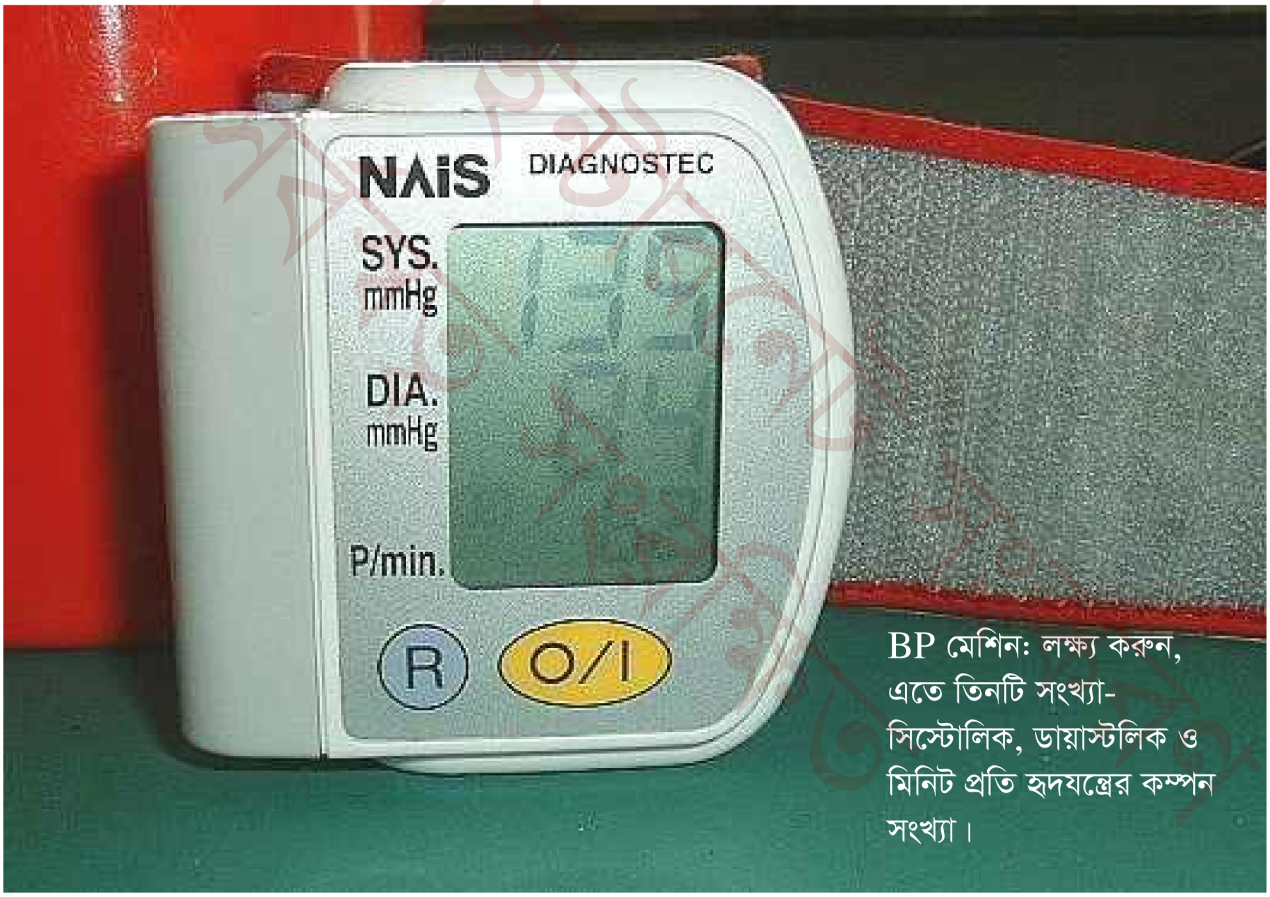


৪. খ. ইইজি [EEG] যন্ত্র: 'ইলেকট্রএনসেফালোগ্রাফি' [Electroencephalography -EEG] হলো মস্তিষ্কের নিউরনে কিভাবে ইলেকট্রিক ভলটেজ চলাচল করে তা নির্ণয় করা। ইসিজি'র মতো একটি গ্রাফ কাগজে রেজাল্ট অঙ্কিত হয়ে থাকে। বিশ থেকে চল্লিশ মিনিটের মধ্যে ব্রেনের ইলেকট্রিকেল ক্রিয়া মাপা হয় এই মেশিন দ্বারা। নীচের গ্রাফটি দেখুন।

এখানে ইইজি

মাথার খুলির সর্বত্র অসংখ্য সেন্সর লাগানো হয় ইইজি টেস্টের জন্য। এরগুলো তারের মাধ্যমে সংযুক্ত থাকে রেকর্ডারের সঙ্গে। নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ব্রেনের ক্রিয়া গ্রাফ আকারে অঙ্কিত হয় কাগজে। ডাক্তাররা এই গ্রাফ গবেষণা করে রোগির ব্রেন সম্পর্কে অনেক ব্যাপার জানতে সক্ষম হন।

৪. গ. রক্তচাপ [Blood Pressure]: রক্তচাপ সাধারণ না থাকলে বেশ সমস্যা হয়। একাধিক যন্ত্রের মাধ্যমে আজকাল রক্তচাপ মাপা হয়ে থাকে। রক্তের শিরা-উপশিরা বা ব্লাড ভেসেলে'র দেওয়ালে রক্ত চলাচল থেকে চাপ সৃষ্টি হয়। হৃদযন্ত্র একটি রক্ত-পাম্প। প্রতিটি হৃদ-স্পন্দনের সময় রক্তচাপ সর্বোচ্চ বা **'সিসটোলিক'** [systolic] থেকে সর্বনিম্ন বা **'ডায়াস্টলিক'** [diastolic] পর্যন্ত ওঠানামা করে। আমাদের হাতের উপরিভাগে **'ব্রাকিয়েল আরটারি'** [brachial artery] নামক একটি শিরা আছে। এটা হৃদযন্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত একটি বড় শিরা। এই শিরায় কি পরিমাণ সিস্টোলিক ও ডায়াস্টলিক চাপ আছে তা মাপা হয়ে থাকে। সাধারণ রক্তচাপ হলো সিস্টোলিক ৯০ থেকে ১১৯ এবং ডায়াস্টলিক ৬০ থেকে ৭৯ পর্যন্ত। লো রক্তচাপ হলো সিস্টোলিক ৯০ কিংবা এর নীচে এবং ডায়াস্টলিক ৬০ কিংবা এর নীচে। অপরদিকে উচ্চ রক্তচাপ মানে সিস্টোলিক অন্তত ১২০ থেকে ১৮০ পর্যন্ত এবং ডায়াস্টলিক ৮০ থেকে ১১০ পর্যন্ত। আজকাল ইলেকট্রনিক মেশিন দ্বারা রক্তচাপ অতি সহজে মাপা যায়। নিম্নে একটি অত্যাধুনিক মেশিনের ছবি তুলে ধরলাম। এটির নাম **'স্পিগমোমানোমিটার'** [sphygmomanometer]!



BP মেশিন: লক্ষ্য করুন, এতে তিনটি সংখ্যা- সিস্টোলিক, ডায়াস্টলিক ও মিনিট প্রতি হৃদযন্ত্রের কম্পন সংখ্যা।

নীচের টেবিলে বিভিন্ন বয়সে স্বাভাবিক রক্তচাপের একটি মাত্রা-টেবিল দেওয়া হলো।

Stage	Approximate age	Systolic	Diastolic
Infants	1 to 12 months	75–100	50–70
Toddlers	1 to 4 years	80–110	50–80
Preschoolers	3 to 5 years	80–110	50–80

School age	6 to 13 years	85–120	50–80
Adolescents	13 to 18 years	95–140	60–90
Adult	18 and older	90–119	60–79

নম্নে আরো আগের যুগে ব্যবহৃত [আর অনেকে এখনও ব্যবহার করেন] এমন দু'টি রক্তচাপ মাপার উপায় উপকরণের ছবি তুলে ধরেছি। প্রথম যন্ত্রটিতে আছে **'স্পিগমোম্যানোমিটার'** [sphygmomanometer] ও **'স্ট্রেথোস্কোপ'** [stethoscope] আর দ্বিতীয়টির নাম **'মার্কারি ম্যানোমিটার'** [mercury manometer]।





৫. রক্তে গলিত গ্যাস [dissolved gases in blood] মনিটর যন্ত্রাদি

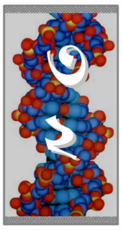
আমাদের রক্তে **'হিমোগ্লোবিন'** [hemoglobin] বা লাল রক্তকোষ নামক একটি গুরুত্বপূর্ণ কোষ [cell] আছে। এটার কাজ হলো অক্সিজেন ক্যারী করে দেহের সকল কোষে নিয়ে যাওয়া। সাপ্লাই দেওয়ার পর দেহ কোষ হিমোগ্লোবিনে ছেড়ে দেয় নিজের বর্জ্য কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস। এটা লাল রক্তকোষ বয়ে নিয়ে এসে ছেড়ে দেয় আমাদের ফুসফুসে। এরপর আমরা নিঃশ্বাসের মাধ্যমে এই ক্ষতিকারক গ্যাসটি বায়ুমণ্ডলে ছেড়ে দেই। যখন হিমোগ্লোবিন ফুসফুস থেকে [শ্বাসের মাধ্যমে জমাকৃত] অক্সিজেন সংগ্রহ করে নেয় তখন একে বলে **'অক্সিজেনেটেড'** [oxygenated] রক্তকোষ। আর যখন অক্সিজেনমুক্ত হয়ে পড়ে তখন একে বলে **'ডিঅক্সিজেনেটেড'** [deoxygenated] রক্তকোষ। হিমোগ্লোবিনে অক্সিজেন কতটুকু সেটারেট [গলে] যায় তা জানা অনেক সময় প্রয়োজন পড়ে। এ প্রয়োজনেই উদ্ভাবন হয়েছে বিভিন্ন মনিটরিং যন্ত্রাদি। এসব যন্ত্রের নাম **'অক্সিমিটার'** [oximeter]। নীচে (পরের পৃষ্ঠায়) এরূপ কয়েকটির ছবি তুলে ধরেছি।



প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা! আধুনিক মেডিকেল যন্ত্রাদির উপর আমাদের তথ্যানুসন্ধান এখানে শেষ। ইতোমধ্যে লেকচারটি বেশ বড় হয়ে গেছে। ধৈর্যসহ এটি শ্রবণ করেছেন আপনারা, আমি এতে কৃতজ্ঞ। আশা করছি মেডিকেল যন্ত্রাদি সম্পর্কে কিছুটা হলে সবার জ্ঞান অনেকটা বর্ধিত হয়েছে। আগামী লেকচার থেকে শুরু হবে মানবদেহ সম্পর্কে চিত্তাকর্ষক বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধান। আশাকরি সকলে এতে উপস্থিত হবেন। আল্লাহ হাফিজ।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম





বক্তা: ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী, নেশন্যাল ডিপ্লোমা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ইংল্যান্ড।

স্থান: খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সুবিদ বাজার, সিলেট।

ঙ. জীববিদ্যা: পরিচিতি ও কার্যকারিতা

বক্তৃতা ৩২ : প্রাণীজগৎ

১. পরিচিতি

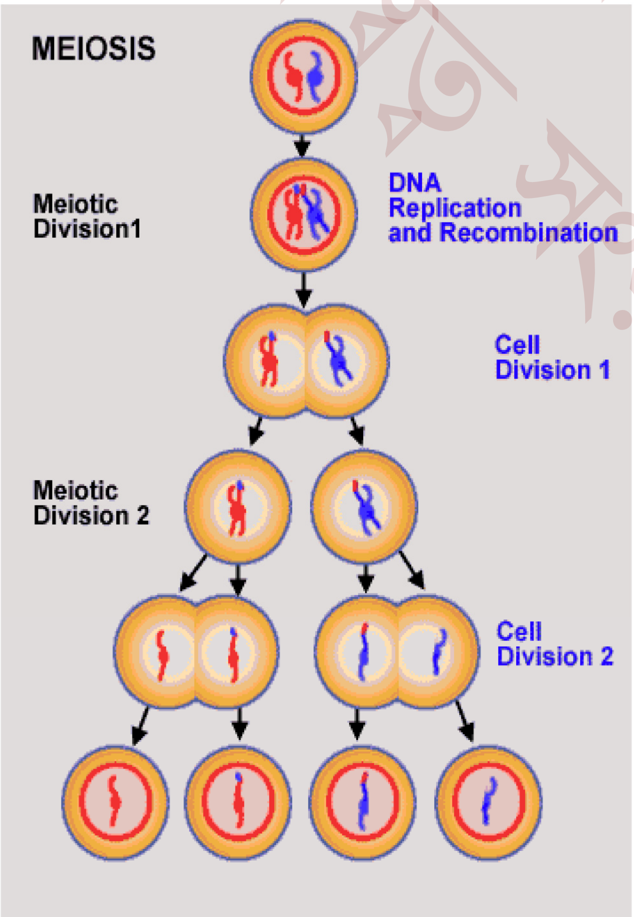
ইংরেজীতে বলে **'বায়োলজি'** [Biology]। বাংলায় জীববিদ্যা। বিজ্ঞানের এই শাখাটি ব্যাপক। জগতের প্রাণীসমূহ নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা এর কাজ। অতি ক্ষুদ্রকায় জীবাণু [bacteria] থেকে মানবদেহের পরিচিতি ও কার্যকারিতা হলো বায়োলজির অন্তর্ভুক্ত বিষয়াদি। আধুনিক বিজ্ঞানের উপর অত্র লেকচার অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি আমরা প্রাণীজগৎ নিয়ে আলোচনা উপেক্ষা করি। সুতরাং আসুন, অন্তত সংক্ষেপে জীববিজ্ঞানের উপর পরিচিতিমূলক তথ্যাদির বর্ণনা তুলে ধরি।

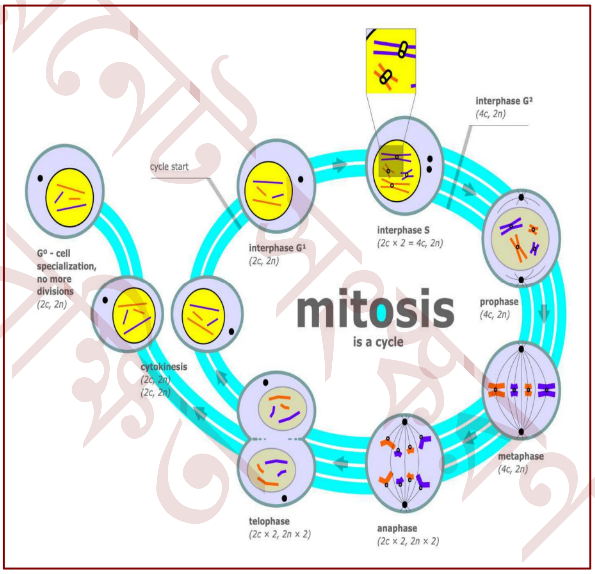
২. প্রাণের সংজ্ঞা

আমরা প্রাণী। সকল জীব-জন্তু কীট-পতঙ্গ ও জীবাণুরাও প্রাণী। কিন্তু **'প্রাণ'** [life] বলতে কী বুঝায়? এর সংজ্ঞা কী? খুব একটা বলার দরকার নেই- কারণ, আমরা সবাই জীবন্ত! আমাদের সংজ্ঞা তো আমরাই। এরপরও দেখা যাক বিজ্ঞান কী বলে?

পৃথিবীর জমিনে বহু ধরনের **‘প্রাণী’** বসবাস করে। তাদেরকে জীবন্ত বলতে হলে কয়েকটি মৌলিক গুণাবলীর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এগুলো হলো: তারা ছোট থেকে বড় হয়, তারা পুনর্জননের ক্ষমতা রাখে এবং তারা খাদ্যগ্রহণ করে। আরো গভীরে যেয়ে গবেষণা করলে দেখা যায় সকল প্রাণীই মূলত **‘জীবন্ত’** কোষের তৈরী। এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেহাংশ একেকটি এনার্জি সৃষ্টির ইউনিট। এগুলোও এনার্জি গ্রহণ করে জীবন্ত থাকতে। পরবর্তীতে আমরা কোষ বিজ্ঞানের উপর আলোচনাকালে এগুলোর উপর বিস্তারিত বর্ণনা তুলে ধরবো।

প্রতিটি কোষের কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াসে আছে ডিএনএ [deoxyribonucleic acid] নামক একটি বড় মলিকিউল। এটাই পুনর্জননের জন্য দায়ী। সে নিজে নিজেকে কপি করতে জানে। এই প্রক্রিয়াকে বলে **‘টেমপ্লেট রেপ্লিকেশন’** [template replication]। এর অর্থ ডিএনএ বিভক্ত হয়ে যাওয়া। কোষ এভাবেই বিভক্ত হয়ে এক থেকে দু'টো এবং দু'টো থেকে চারটিতে- বাড়তে থাকে। যে দু'টি প্রক্রিয়ায় কোষ বিভক্ত হয় তার নাম হলো: ১. মাইওসিস [meiosis] ও ২. মাইটোসিস [mitosis]। প্রথম প্রক্রিয়ায় কোষের নিউক্লিয়াস চার ভাগে বিভক্ত হয়। দ্বিতীয় প্রক্রিয়ায় কোষ বিভক্ত হয়ে দু'টি কন্যা কোষে পরিণত হয় যারা সবদিক থেকে মূল মা-কেষোর কপি। প্রথমটি হলো **‘সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন’** [sexual reproduction] এবং দ্বিতীয়টি হলো **‘এসেক্সুয়েল রিপ্রোডাকশন’** [asexual reproduction]। প্রথমোক্ত প্রক্রিয়া ডিম্বকোষ ও শুক্রকোষের সঙ্গে সম্পৃক্ত। শেষোক্তটি জড়িত বেড়েওঠা ও কোষ প্রতিস্থাপন, মেরামত ইত্যাদির সঙ্গে। আমাদের দেহে প্রতি মুহূর্তে অসংখ্য কোষ মারা যাচ্ছে, সৃষ্টি হচ্ছে এবং মেরামতও হচ্ছে। মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় এ কাজগুলো ঘটছে। নীচে উভয় ক্রিয়ার দু'টি চিত্র তুলে ধরেছি। একটু দেখে নিন।





প্রাণীদের অপর মূল ক্রিয়ার নাম খাদ্যগ্রহণ ও বিপাকক্রিয়া। একে বিজ্ঞানীরা **‘মেটাবলিজম’** [metabolism] বলেন। খাদ্যগ্রহণ ও বিপাকক্রিয়া মূলত প্রয়োজনীয় এনার্জি আহরণের উপায় মাত্র। এনার্জিসূত্র হতে পারে সূর্যালোক, অক্সিজেন ও অন্যান্য গ্যাস কিংবা সুস্বাদু খাদ্য। এনার্জির দরকার হয় পুনর্জনন, বড়-হওয়া, কোষ জীবন্ত, সৃষ্টি ও মেরামতে

এবং চলন্ত থাকা ইত্যাদিতে। সবুজ পত্রবিশিষ্ট উদ্ভিদরা ফটোসিনথেসিসের মাধ্যমে সূর্যের আলো ব্যবহার করে খাদ্য তৈরীতে। মানুষসহ সকল জীব-জন্তু কেমিকেল এনার্জি সংগ্রহ করে খাদ্য থেকে। **'প্রাণ'** এর সংজ্ঞাদান সহজ নয়। তবে যে কোনো প্রাণীকে মেটাবলিজম ও পুনর্জনন প্রক্রিয়ায় সক্রিয় থাকা চাই। এ উভয় প্রক্রিয়ার একটিও যদি না থাকে তাহলে জীবন্ত প্রাণী বলা যাবে না।

মেটাবলিজম ও রিপ্রোডাকশন ক্রিয়া কিন্তু প্রাণীদের কোষের মধ্যে সংঘটিত হয়। নিউক্লিয়াসসর্বস্ব কোষকে বলে **'ইউক্যারিওট সেল'** [eukaryote cell]। নিউক্লিয়াসহীন কোষকে বলে **'প্রক্যারিওট সেল'** [prokaryote cell]। প্রথম প্রকারের কোষ দ্বারা মানবদেহসহ যাবতীয় জীবজন্তু ও উদ্ভিদ সৃষ্ট। দ্বিতীয় প্রকার কোষ পাওয়া যায় বেকটেরিয়া বা জীবাণুদের দেহে। ইউক্যারিওট কোষের নিউক্লিয়াসে ডিএনএ মলিকিউল থাকে। কেন্দ্রের বাইরে **'সাইটোপ্লাজম'** [cytoplasm] নামক এলাকায় **ডিএনএ সিনথেসিস [কপি]** সংঘটিত হয়। মেটাবলিজমের জন্য যাবতীয় বস্তু সেখানেই বিদ্যমান। সুতরাং বলা যায়, কোষের অভ্যন্তরেই প্রাণীদের মূল দু'টি প্রক্রিয়া- তথা পুনর্জনন ও বিপাকক্রিয়া সংঘটিত হয়।

ভাইরাস সম্পর্কে আপনারা সবাই অবগত। এসব রোগ-জীবাণু **'আংশিক জীবন্ত'**। তারা নিজেদেরকে কপি করতে জানলেও এনার্জি রূপান্তর প্রক্রিয়া জানে না। অথচ নিজেদেরকে কপি করতে প্রয়োজন হয় এনার্জির। সুতরাং তারা **'পরজীবী'** [parasite] হিসাবে দেহের মধ্যে বাস করে। এ উপায়েই পুনর্জনন নিশ্চিত রাখতে সক্ষম হয় রোগ জীবাণু। যে মেজবান-কোষে সে বসে থাকে, তাকে নিয়ন্ত্রণ করে নেয়। সে যেভাবে নির্দেশ দেয় সে মুতাবিক কাজ করতে বাধ্য থাকে মেজবান কোষটি। ফলে দেহের মেজবান কোষটি আর সাধারণ প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হতে পারে না। এক কথায়, জীবাণুরা তাদের মেজবান কোষকে এভাবে ধ্বংস করে নিজেরা বেঁচে থাকে। আর এটার নামই জীবাণু দ্বারা রোগাক্রান্ত হওয়া।

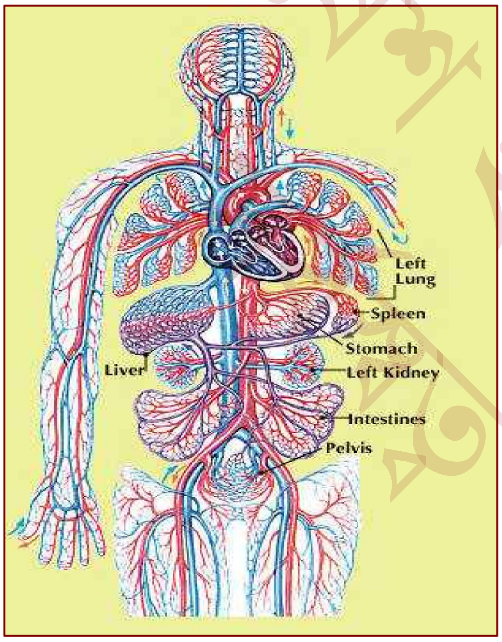
৩. মানব দেহকাঠামো

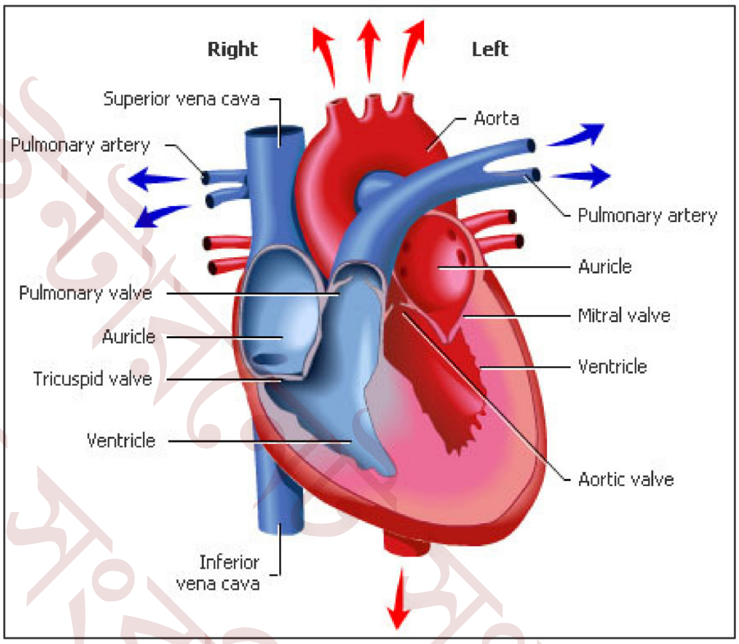
এই লেকচারে আমরা জীব-জন্তুর উপর আলোচনা করবো না। মানবদেহ সম্পর্কে জ্ঞানার্জনই উদ্দেশ্য। আমাদের দেহ নিয়ে গবেষণার নাম **'এ্যানাটমি'** [anatomy]। একে বংলায় অঙ্গব্যবচ্ছেদ-বিদ্যা বলে। শিক্ষার্থীদের বলে রাখি, এ্যানাটমি বিরাট বিষয়। এটার উপরই দীর্ঘ ৬ বৎসর পর্যন্ত অধ্যয়ন শেষে ডাক্তার হতে হয়। সুতরাং এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ মাত্র জ্ঞানদান ছাড়া আর বেশী কিছু সম্ভব নয়।

বিজ্ঞানীরা মানব এ্যানাটমিকে মোট **১২টি** শাখায় বিভক্ত করেছেন। এগুলো হলোঃ **১.** সার্কুলেটরী [circulatory], ২. এনডোক্রিন [endocrine], ৩. ইউরিনারি [urinary], ৪. স্কেলেটেল [skeleton], ৫. নার্ভাস [nervous], ৬. সামন মাসকুলার [front muscular], ৭. পেছন মাসকুলার [back muscular], ৮. রেসপিরেটরি [respiratory], ৯. ডাইজেস্টিভ [digestive], ১০. ইমিউন [immune], **১১.** পুরুষ রিপ্রোডাক্টিভ [male reproductive] এবং **১২.** মহিলা রিপ্রোডাক্টিভ [female reproductive]। আমরা আশা করছি এই **১২টি** সিস্টেমের উপর একে একে আলোচনা করার। তবে আজকের লেকচারে শুধুমাত্র প্রথমটির উপর আলোচনা হবে। বাকীগুলো নিয়ে পরবর্তী লেকচারসমূহে বর্ণনা আসবে ইনশাআল্লাহ।

৩. ১. সার্কুলেটরী সিস্টেম [circulatory system]

আমাদের হৃদযন্ত্র বা হার্ট এই সিস্টেমের কেন্দ্র। মায়ের গর্ভে শিশুর আগমন ও জন্ম থেকে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত অনবরত হৃদযন্ত্র রক্ত পাম্প করে যায়। যে উপায়ে হার্ট রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া সম্পাদন করে তার নামই হলো সার্কুলেটরী সিস্টেম বা রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া।



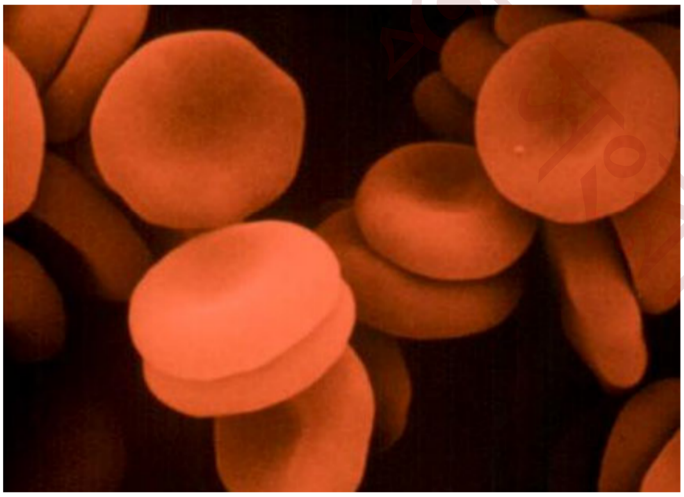


'র্কুলেটরী সিস্টেমের বিভিন্ন অংশ: তিনটি মৌলিক অংশ একত্রে কাজ করে যাচ্ছে রক্ত সঞ্চালন নিশ্চিত রাখতে। এগুলো হলো হার্ট [নেতা], রক্ত, শিরা-উপশিরা নেটওয়ার্ক। হার্ট একটি পেশী পাম্প। এটা পুরো সিস্টেমের ইঞ্জিন। এতে আছে চারটি আলাদা চেম্বার বা কক্ষ। এগুলো হলো: ১. **'রাইট এট্রিয়াম'** [right atrium], ২. **'রাইট ভেনট্রিকল'** [right ventricle], ৩. **'লেফ্‌ট এট্রিয়াম'** [left atrium] ও ৪. **'লেফ্‌ট ভেনট্রিকল'** [left ventricle]। **'মাইওকার্ডিয়াম'** [myocardium] নামক একজাতীয় বিশেষ পেশীর তৈরী এসব চেম্বারের দেওয়াল। রক্ত পাম্প করতে যেয়ে এ দেওয়ালগুলো ছন্দে ছন্দে সংকোচন হয়। দু'টি স্টেজে হার্টের পাম্প ক্রিয়া সংঘটিত হয়। উপরের চিত্রটি দেখুন।

ডাইয়াস্টলি: এই স্টেজে হার্টের পেশীগুলো স্বাভাবিক থাকে। এসময় আরটিওভেনট্রিকুলার ভাল্ব [artioventicular valve] খুলে যায়। শিরা থেকে রক্ত হার্টের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। আট্রিয়া হয়ে ভেনট্রিকলে রক্ত জমা হয়। রক্তে পরিপূর্ণ হলেই শুরু হয় দ্বিতীয় পর্যায়।

সিস্টলি: এই পর্যায়ের শুরু হয় যখন ভেনট্রিকলে রক্ত পরিপূর্ণ হওয়ার ফলে আরটিয়া সংকোচন হয়। এরপরই ভেনট্রিকল সংকোচন হয়ে রক্তকে ভাল্বের মাধ্যমে পৌঁছে দেয় আরটারিতে। এভাবে ডাইয়াস্টলি পর্যায়ে রক্ত দেহ থেকে হার্টে পৌঁছে ও তা পাঠিয়ে দেয় ফুসফুসে অক্সিজেন সংগ্রহের জন্য। সিস্টলি পর্যায়ে হার্ট থেকে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত চলে যায় শিরা-উপশিরা হয়ে দেহের সর্বত্র। মোটকথা, আমাদের হৃদযন্ত্রের কাজ হলো সমগ্র দেহব্যাপী রক্ত সঞ্চালন করা। এমনকি যখন ক্লান্তি হেতু দেহের মধ্যে অতিরিক্ত অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় তখন শ্বাস-প্রশ্বাসের মাত্রা বেড়ে যায়। এসময় আমরা ব্যায়াম বা অন্য কোন ফিজিকেল কাজের দরুন হয়রান হয়ে পড়ি। অতিরিক্ত অক্সিজেন ফুসফুসে আসার পর রক্তকোষ [হিমোগ্লোবিন] অক্সিজেন দ্বারা পরিপূর্ণ হয়। এদিকে হার্টের স্পন্দন মাত্রা [হার্ট বিট রেট] বৃদ্ধি পায় একটু তাড়াহুড়ো করে দেহের সর্বত্র অক্সিজেন-পূর্ণ রক্তকোষ দ্রুত পৌঁছে দিতে। সুতরাং এখন আমরা বুঝলাম, অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে কেনো আমরা হয়রান হই- না হলে তো দেহের মধ্যে প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত অক্সিজেন সাপ্লাই নিশ্চিত হবে না। এছাড়া ব্যায়াম দ্বারা হয়রান হলে হার্টের বিট মাত্রা বাড়ার মধ্যে অনেক ফায়দা আছে। রক্ত দ্রুত শিরা-উপশিরায় চলাচল হলে দেহের উপকার হয়। শরীরের মেদ বা চর্বি কমে যায়। শিক্ষার্থীদের প্রতি উপদেশ, যেটুকু সম্ভব ব্যায়াম করবেন নিয়মিত। এতে হার্ট, দেহ ও স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।

রক্ত: সার্কুলেটরী সিস্টেমের কেন্দ্রীয় যন্ত্রটি হলো হার্ট। আমরা ইতোমধ্যে এ সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করেছি। হার্ট একটি পাম্প। সে কী পাম্প করবে? হ্যাঁ, সেটা হলো রক্ত। রক্ত এক জায়গায় স্থির থাকে না। পুরো দেহব্যাপী শিরা-উপশিরার একটি বিরাট নেটওয়ার্ক বা জাল আছে। রক্ত এসব শিরা-উপশিরার মাধ্যমে চলাচল করে। হৃদযন্ত্র জোর করে রক্ত চলাচল রাখে। এই রক্তে কী আছে?



রক্তকে **'জীবনের নদ'** [river of life] বলে। একজন পরিণত বয়স্ক মানুষের দেহে ৫ থেকে ৬ লিটার পরিমাণ রক্ত থাকে। এটা দেহের মোট ওজনের ৭ থেকে ৮ শতাংশ। রক্তের মূল কাজ হলো দেহের সর্বত্র অক্সিজেন নিয়ে যাওয়া। এরপর ফিরে আসার সময় কোষের বর্জ্য বহন করা। এই বর্জ্যের অধিকাংশ হলো কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস। বর্জ্য রক্তের মাধ্যমে চলে আসে আমাদের ফুসফুসে। নিঃশ্বাসের মাধ্যমে এসব বর্জ্য বের করে ফেলা হয় বায়ুমণ্ডলে। দেহের মধ্যে অক্সিজেন ট্রান্সপোর্ট বেঁচে থাকার জন্য জরুরী। মাত্র কয়েক মিনিট এই অক্সিজেন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম অকেজো হয়ে পড়লে মৃত্যু এসে যাবে। রক্ত শুধুমাত্র অক্সিজেন বহন করে না। খাদ্যে যেসব উপকারী বস্তু যেমন মেদ, প্রোটিন এবং কার্বহাইড্রেট রক্তের মাধ্যমেই দেহ-টিস্যুতে চলে যায়। দেহের জন্য এসব গুরুত্বপূর্ণ বস্তু অবশ্য ডাইজেস্টিভ সিস্টেম দ্বারা প্রসেস হয়ে থাকে।

আরো দু'টি বর্জ্য ইউরিয়া ও ইউরিক এসিড দেহ থেকে বের করতে হবে। রক্ত এগুলো নিয়ে যায় আমাদের কিডনিতে। সেখানে রক্ত থেকে আলাদা হওয়ার পর মূত্র হিসাবে বেরিয়ে আসে দেহ থেকে। আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বস্তু রক্ত বহন করে। একে বলে **'হরমোন'** [hormone]। এগুলো মূলত কেমিকেল বস্তু। দেহের কিছু বিশেষ ফাংশন

এসব হরমোন দ্বারা সংঘটিত হয়। হরমোনের মাধ্যমে এক দেহযন্ত্র দূরে থেকেও অপর দেহযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সুতরাং রক্ত শুধুমাত্র ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম নয়, কমিউনিকেশন সিস্টেমও পরিচালনা করে।

মানবদেহে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রক্তের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। মানবদেহের তাপমাত্রা ৩৭ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড [৯৮.৬ ডিগ্রী ফারেনহাইট] অথবা এর অতি কাছাকাছি। দেহের বিভিন্ন অংশে তাপমাত্রার তারতম্য রক্ত চলাচল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। চামড়ার শিরা-উপশিরার ব্যাস প্রয়োজনে কমে ও বাড়ে। আমরা যখন অতিরিক্ত গরম হয়ে যাই, শিরা-উপশিরার ব্যাস বৃদ্ধি হয়। ফলে অতিরিক্ত রক্ত চলাচল করে চামড়ার মধ্যে। চামড়া ঘর্মাক্ত হয়ে পড়ে এবং দেহের তাপ বেরিয়ে যায়। চামড়ায় অতিরিক্ত রক্ত থাকায় এর রং বদলে যায়। লালচে বা গোলাপী হয়ে ওঠে। অপরদিকে কারো দেহ বেশী ঠাণ্ডা হয়ে গেলে চামড়ায় রক্তের মাত্রা কমে যায়- এর রং অনেকটা বাদামী ও মরা-মরা লাগে।

আমরা এই অংশ শুরু করেছিলাম, **'কি আছে রক্তের মধ্যে'** এ প্রশ্ন করে। এখন জবাব দেবো। প্রথমত রক্তের মধ্যে একটি তরল পদার্থ আছে যার নাম **'প্লাজমা'** [plasma]। এর মাত্রা প্রায় ৫৫ শতাংশ। বাকী রক্ত তিনটি বিশেষ কোষের তৈরী। এগুলো হলোঃ ১. লাল রক্তকোষ [erythrocyte], সাদা রক্তকোষ [leukocyte] এবং প্লেটলেট [thrombocyte]।

প্লাজমাঃ হলদে রঙের প্লাজমা মূলত পানি এবং লবণের তৈরী। পানির পরিমাণ প্রায় ৯৫%। এতে আরো আছে গ্লুকোজ, মেদ, প্রোটিন, আমিনো এসিড, ভিটামিন এবং মিনারেল ইত্যাদি। সাগরজলের সমপরিমাণ লবণ আছে প্লাজমায়। বর্ণিত প্রতিটি বস্তুর পরিমাণ সতর্কতাসহ নিয়ন্ত্রণ রাখা জরুরী। আমাদের কিডনি ও লিভার এ কাজে নিয়োজিত আছে।

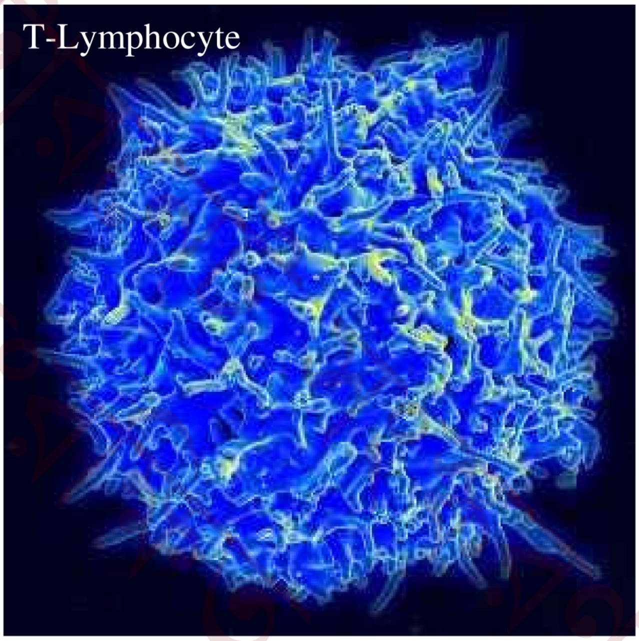
লাল রক্তকোষ [erythrocyte]: রক্তে এদের মাত্রা প্রায় ৪৫%। আগেই বলেছি লাল রক্তকোষের মূল কাজ হলো ফুসফুস থেকে অক্সিজেন সংগ্রহ করে দেহের সকল টিস্যুতে নিয়ে যাওয়া। মোটকথা দেহের প্রতিটি কোষে [যার দ্বারা সবকিছু সৃষ্ট] অক্সিজেন সাপ্লাই নিশ্চিত করতে প্রতি মুহূর্তে কাজ করে যাচ্ছে লাল রক্তকোষ। লাল রক্ত কোষের মূল উপাদান হলো প্রোটিন ও লৌহের তৈরী বস্তু যার নাম **'হিমোগ্লোবিন'** [hemoglobin]। এ বস্তুটিই ফুসফুসের মধ্যে চলন্ত অবস্থায় অক্সিজেন মলিকিউল **'গ্রেফতার'** করে। রক্তের লাল রঙের কারণও এই হিমোগ্লোবিন। যখন রক্ত দেহের টিস্যু দিয়ে চলন্ত থাকে তখন হিমোগ্লোবিন অক্সিজেন প্রতিটি কোষে ছেড়ে দেয়। লাল রক্তকোষে হিমোগ্লোবিন এতো বেশী যে, অন্যান্য কোষের তুলনায় এগুলোতে কিছু বস্তু অনুপস্থিত- যেমন নিউক্লিয়াস [কেন্দ্র]। হিমোগ্লোবিন নাইট্রিক এসিডও ক্যারী করে। এই বস্তুটি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে কাজে লাগে।

হিমোগ্লোবিনের অপর গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো দেহকোষের বর্জ্য কার্বন ডাইওক্সাইড ফুসফুসে নিয়ে আসা। এরপর আমরা নিঃশ্বাসের মাধ্যমে এই গ্যাস বায়ুমণ্ডলে ছেড়ে দিই। হিমোগ্লোবিনে অক্সিজেন থাকলে একে বলে **'অক্সিহিমোগ্লোবিন'** [oxyhemoglobin]। এতে যখন কার্বন ডাইওক্সাইড থাকে তখন একে বলে **'কার্বোক্সিহিমোগ্লোবিন'** [carboxyhemoglobin]।

লাল রক্তকোষের হায়াত বেশীদিন নয়ঃ মাত্র ১২০ দিন পরে এগুলো সার্কুলেশন অবস্থায় কিংবা প্লীহা নামক দেহযন্ত্রে ধ্বংস হয়ে যায়। এদিকে হাড্ডির মজ্জায় সৃষ্টি হয় নতুন রক্তকোষ।

রক্তের ধরন [Blood Type]: বেশ কয়েক জাতের রক্তকোষ আছে। তবে যে কোন ব্যক্তির রক্তকোষ মাত্র এক ধরনের। কোষের বাইরে কোন্ প্রকারের বস্তু আছে তা-ই নির্ধারণ করে এর ধরন। দেহে কৃত্রিম উপায়ে সাপ্লাই দিতে হলে একই ধরনের রক্ত হতে হবে। রক্ত মোট চার ধরনের: A, B, AB এবং O। অপর যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তাহলো Rh ফেক্টর। এর দ্বারা রক্তের ধরন নেগিটিভ না পজিটিভ তা নির্ধারিত হয়। অধিকাংশ মানুষের রক্তের ধরন হলো A+ [এ-পজিটিভ]।

সাদা রক্তকোষ [lymphocyte]: রক্তের মধ্যে মাত্র ১ শতাংশ কোষ হলো সাদা রক্তকোষ। সংখ্যায় ছোট্ট হলেও তাদের ফাংশন বা গুরুত্ব বিশাল। কারণ দেহের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতায় [immune system] এগুলো কেন্দ্রীয় দায়িত্ব পালন করে। আমাদের দেহের ইমিউন সিস্টেম রোগ-প্রতিরোধে প্রাথমিক ডিফেন্স হিসাবে সক্রিয় আছে। এই সিস্টেমে কমতি থাকলে বিরাট সমস্যা হবে। ঔষধ-পত্র তো **'এইড'** [Aid] বা সাহায্য ছাড়া কিছু নয়। দেহের ইমিউন সিস্টেমকে কার্যকর ও শক্তিশালী করার কাজে ঔষধ সাহায্য করে মাত্র। ইমিউন সিস্টেম নষ্ট হয়ে গেলে ঔষধে কাজ হবে না। ইমিউন সিস্টেম নষ্ট হওয়া রোগের নামই হলো এইডস্ [Acquired Immune Deficiency Syndrome]। যাক, সাদা রক্তকোষের পরিচিতি ও কার্যকারিতা নিয়ে আলোচনা দরকার।

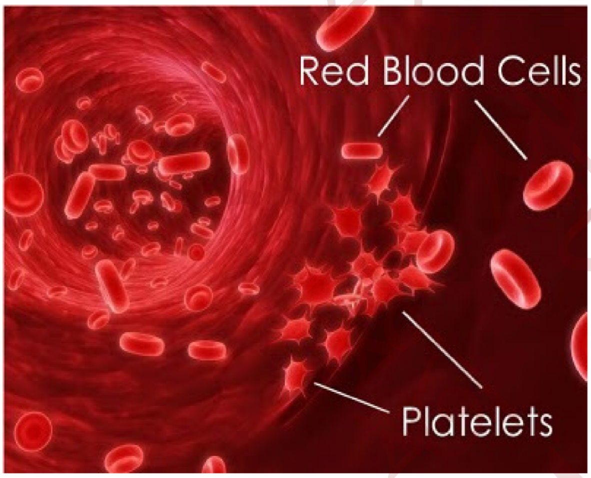


দেহের মধ্যে **'ফরেন এজেন্ট'** [foreign agent] প্রবেশ বা আত্মপ্রকাশ করলেই এই রক্তকোষ একে সরাসরি আক্রমণ করে। এখানে ফরেন এজেন্ট বলতে দেহের জন্য ক্ষতিকর বস্তু: যেমন জীবাণু, ভাইরাস, ছত্রাক এবং পরজীবী। ফরেন এজেন্ট হিসাবে নিশ্চিত হলেই রক্তের মাধ্যমে সাদা রক্তকোষ সেথায় যেয়ে এজেন্টকে জড়িয়ে ধরে। এই আক্রমণ হলো **'সুইসাইড হামলা'**। কারণ এজেন্টকে ধ্বংস করতে যেয়ে সাদা রক্তকোষ নিজেই ধ্বংস হয়ে যায়। সেকেন্ডারী হামলার জন্য সাদা রক্তকোষ কিছু বস্তু তৈরী করে যার নাম **'এ্যন্টিবডি'** [antibody]। সার্কুলেটরী সিস্টেমে এগুলো ছেড়ে দেওয়ার পর এজেন্টের উপর যেয়ে হামলা চালায়। এ্যন্টিবডিও ফরেন বস্তুকে জড়িয়ে ধরে। ফলে হয় হামলাকারী বস্তু অকেজো হবে না হয় এ্যন্টিবডি অন্য রোগ-প্রতিরোধ কোষের সাহায্য নেবে। এভাবে সে ক্ষতিকর কোষকে ধ্বংস করে ছাড়বে। তবে সাহায্য যদি দেহ থেকে না মিলে তখনই রক্তে বাইর থেকে ঔষধ হিসাবে সাহায্য দেওয়া যেতে পারে। ডাক্তারী বিজ্ঞানের কাজই এটা- রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতাকে কার্যকর কিংবা দ্রুততর করা। লিমফোসাইট ছাড়াও **'নিউট্রোফিল'** [neutrophil]. **'মনোসাইট'** [monocyte] এবং অন্যান্য সাদা রক্তকোষ আছে। তারা সবে মিলে আমাদের রোগ-প্রতিরোধ সিস্টেমকে সক্রিয় রেখেছে। সুতরাং আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে এসব কোষ যে কী পরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে তা সহজেই অনুমেয়।

প্লেটলেট [platelet]: আপনার শরীরের কোনো অঙ্গ [আল্লাহ না করুন] দুর্ঘটনাবশতঃ কেটে গেলো। রক্ত ঝরছে। দেহের মধ্যে যে পরিমাণ রক্ত আছে তার অধিকাংশ বের হয়ে গেলে বিরাট সমস্যা দাঁড়াবে। এটা বন্ধ করার

উপায় হলো বেন্ডেজ বাঁধা। কিন্তু এরপরও দেহের একটি কাজ আছে যার উপর নির্ভর করে রক্ত বন্ধ হওয়া। রক্তের মধ্যেই একটি কোষ আছে যার কাজ হলো রক্তের মধ্যে জমাট বাঁধানো। রক্তঝরা বন্ধ করা। এই কোষটির নামই প্লেটলেট [platelet]। নীচের পরের পৃষ্ঠার চিত্রটি দেখুন।

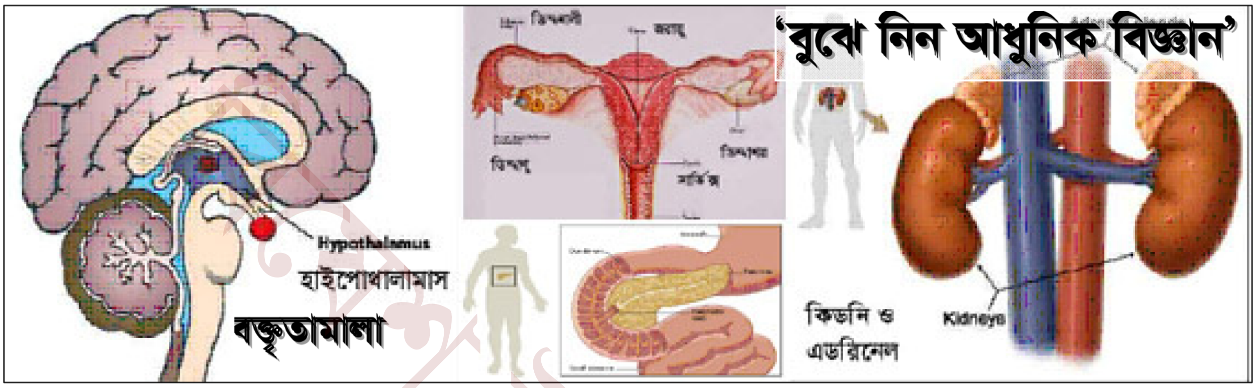
রক্তের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র কোষ হলো প্লেটলেট। কোনো রক্ত-শিরা ছিড়ে বা কেটে গেলে এসব কোষ এসে সেখানে **'ক্লট'** [জমাট] বাঁধে। কেটে যাওয়ার পরই রক্তে চলন্ত আশপাশের সকল প্লেটলেট এসে ক্ষতস্থানে জমাট বাঁধা শুরু করে। এলাকার প্লেটলেট সংখ্যা কাজের জন্য যথেষ্ট না হলে এটা **'মেসেঞ্জার'** [বার্তাবাহক] প্রেরণ করে দেহের অন্যান্য অংশে আরো প্লেটলেট ক্ষতস্থানে প্রেরণের জন্য। সুতরাং ক্ষতস্থান জোড়া লাগার ক্ষেত্রে প্লেটলেটের অবদান একান্ত জরুরী। রক্তে প্লেটলেট যথেষ্ট না থাকলে উপায় নেই।

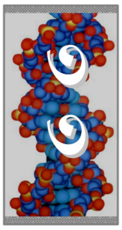


প্লেটলেট কোষের অপর নাম **'থ্রম্বোসাইট'** [thrombocyte]। প্রতি কিউবিক মিলিমিটার পরিমাণ রক্তে ২ লক্ষ ৫০ হাজার পর্যন্ত প্লেটলেট কোষ থাকে। এটা রক্তের সঙ্গে পুরো দেহব্যাপী নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ঘুরতে আছে। রক্ত বহনকারী রগ-শিরা-উপশিরায় কোথাও কোনো ধরনের ক্ষত দেখা দিলেই তারা এ্যকশনে যায়। অবশ্য সময় সময় 'ভুল' হয়ে থাকে। বেদরকারী রক্ত জমাট হওয়া থেকে ক্ষতির সম্মুখীনও হতে হয় সময় সময়।

প্রিয় ছাত্রবন্ধুরা! আজকের লেকচারের এক্ষুণি সমাপ্তি ঘটবে। আগামী লেকচারে আমার এনডোক্রিন [endocrine] সিস্টেমের উপর আলোচনার আশারাখি। আল্লাহ হাফিজ।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম





বক্তাঃ ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী, নেশন্যাল ডিপ্লোমা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ইংল্যান্ড।

স্থানঃ খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সুবিদ বাজার, সিলেট।

৬. জীববিদ্যাঃ পরিচিতি ও কার্যকারিতা

বক্তৃতা ৩৩ : প্রাণীজগৎ

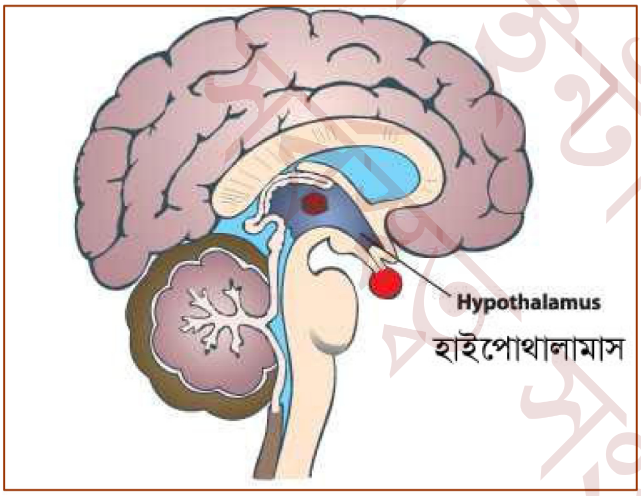
৩. ২. এনডোক্রিন সিস্টেম [Endocrine System]

এই সিস্টেমের কাজ হলো দেহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু **'সংবাদবাহক'** [messenger] কেমিকেল তৈরী করা। এসব কেমিকেল বস্তুকে বলে **'হরমোন'** [hormone]। সংবাদবাহক হিসাবে হরমোন একদল কোষের তথ্য ও নির্দেশনা অপরদল কোষে পৌঁছে দেয়। হেদের কার্যকারিতা সঠিক থাকতে এই ক্রিয়াটি জরুরী। কিছু বিশেষ দেহযন্ত্র আছে যাদের কাজ হলো এসব হরমোন তৈরী করা। হরমোন নিয়ন্ত্রণ করে বেড়েওঠা, টিস্যুর কার্যকারিতা, গর্ভকালীন বিভিন্ন কাজ নিশ্চিত রাখা, রক্তের মধ্যে সঠিক পরিমাণ চিনি, গ্লুকোজ ইত্যাদি সঠিক মাত্রায় রাখা। তাছাড়া মেটাবলিজম বা বিপাকতন্ত্র নিয়ন্ত্রণেও হরমোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যে ক'টি মৌলিক গ্রন্থি বা **'গ্ল্যান্ড'** [gland] দ্বারা এনডোক্রিন সিস্টেম গঠিত সেগুলো হলোঃ ১. হাইপোথালামাস [hypothalamus], ২. পিটুইটারি [pituitary], ৩. থাইরোইড [thyroid], ৪. প্যারাথাইরোইড [parathyroid], ৫. এড্রিনেল [adrenal], ৬. পিনিয়েল বডি [pineal body], ৭. ওভারি [ovary], ৮. প্যানক্রিস [pancreas] এবং ৯. টেস্টিজ [testis]। মেডিকেল বিজ্ঞানীরা বলেন, দেহের নন-এনডোক্রিন যন্ত্রাদি যেমন মস্তিষ্ক, হৃদযন্ত্র, ফুসফুস, কিডনি, লিভার,

থাইমাস, চামড়া এবং প্লাসেন্টা ইত্যাদিও প্রয়োজনে হরমোন তৈরী করতে পারে। আমরা এ লেকচারে উপরোক্ত ৯টি যন্ত্রের উপর আরো কিছু আলোচনার আশা রাখি।

১. হাইপোথালামাস [hypothalamus]

আমাদের ব্রেনের একটি ছোট্ট অংশ এটি। দেহের অভ্যন্তরীণ ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণে হাইপোথালামাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ব্রেনের এ অংশ মাত্র ১% জায়গা দখল করে রেখেছে। এর ওজন ৪ গ্রাম মাত্র। ছোট্ট হলেও তার কার্যকারিতা ব্যাপক। এটাই নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের যৌনসংক্রান্ত কার্যাদি, আবেগ, হরমোন সৃষ্টি এবং নার্ভাস সিস্টেমের দু'টি মূল শাখার একটি **'অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেম'** [autonomic nervous system] নিয়ন্ত্রণেও তার ভূমিকা আছে। নীচের চিত্রে আমাদের মগজে হাইপোথালামাসের অবস্থায় দেখানো হয়েছে।



কার্যকারিতা: আগেই বলেছি হাইপোথালামাসের অনেক ফাংশন আছে। অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেমের প্রতিক্রিয়া **'আক্রমণ'** কিংবা **'পলায়ন'**, **'ভয়'** অথবা **'চাঞ্চল্যতা'** ইত্যাদি সিগনাল প্রথমে হাইপোথালামাসে পৌঁছে। এখান থেকেই নির্দেশনা আসে হৃদযন্ত্রের কম্পন ও শ্বাস বৃদ্ধি এবং চোখের প্রশস্ততা ও অতিরিক্ত রক্ত সঞ্চালন। এসব ক্রিয়া থেকেই বুঝা যায় আমাদের মানসিক অবস্থা। হাইপোথালামাস রক্তে কি পরিমাণ গ্লুকোজ ও পানি আছে তার হিসাব রাখে। এগুলোর তারতম্যই নির্ধারণ করে আমরা ক্ষুদার্ত এবং পিপাসিত কি না। এই গ্ল্যান্ড আমাদের নিদ্রা এবং যৌনক্রিয়াও নিয়ন্ত্রণ করে। দেহের **'থার্মোস্টেট'** তথা তাপনিয়ন্ত্রক হিসাবেও এর ফাংশন কম না। কারণ **'বডি টেম্পারেচার'** [body temperature] নিয়ন্ত্রণে না থাকলে বিরাট সমস্যা হবে। রক্ত-শিরায় এটাই সৃষ্টি করে কম্পন, সংকোচন ও প্রসারণ। ফলে আমরা প্রয়োজন বোধ করি ঠাণ্ডা হেতু কাপড় পরার, আর গরমের সময় ফেন ছাড়ার কিংবা রৌদ্র থেকে গাছের ছায়ায় আশ্রয়ের।

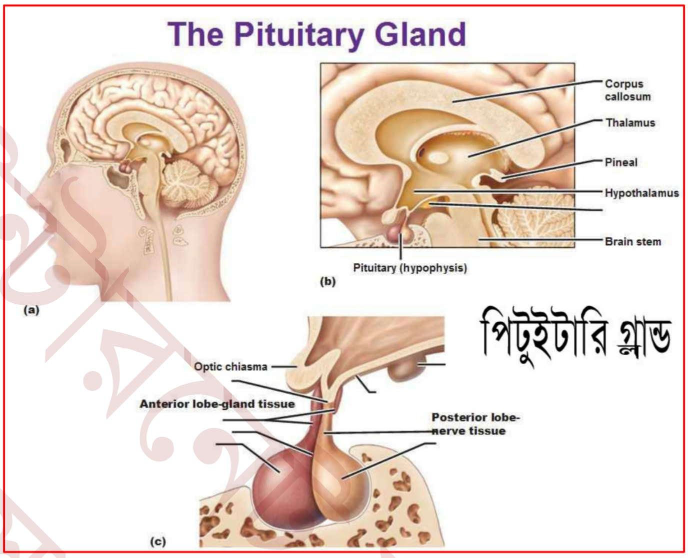
এনডোক্রিন সিস্টেমের সদস্য হিসাবে হাইপোথালামাস ব্রেনে স্থাপিত নিকটস্থ অপর গ্ল্যান্ড **'পিটুইটারি গ্ল্যান্ড'** [pituitary gland] দ্বারা নির্মিত হরমোন নিয়ন্ত্রণ করে। এসব হরমোনের দু'টি হলো **'অক্সিটোসিন'** [oxytocin] ও **'ভেইজোপ্রেসিন'** [vasopressin]। প্রথমটি শিশু জন্মের সময় মায়ের সর্ভাশয় সংকোচনসহ জন্মকালীন প্রসেস নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। এছাড়া মায়ের বুকের দুগ্ধ তৈরীতেও অক্সিটোসিন হরমোন সক্রিয় থাকে। শিশুদের ক্রন্দন শ্রবণ থেকেও অক্সিটোক্সিন তৈরী হতে পারে। হরমোন ভাসোপ্রেসিন আমাদের কিডনিতে সক্রিয় থাকে। শরীরের পানির মাত্রা নিয়ন্ত্রণে কিডনিকে এটা সাহায্য করে। রক্তে পানির মাত্রা বেড়ে গেলে হাইপোথালামাস অতিরিক্ত ভাসোপ্রেসিন তৈরীর নির্দেশ দেয় আর পানির মাত্রা কমে গেলে ভাসোপ্রেসিনের মাত্রাও কমানোর অর্ডার করে।

হাইপোথালামাসের একটি অংশ আছে যার কাজ হলো আমাদের দৈনন্দিন **'সার্কেডিয়ান রিদ্‌ম'** [circadian rhythm] নিয়ন্ত্রণ করা। দৈনিক ২৪ ঘণ্টার এই নিয়মতান্ত্রিকতা রক্তের মধ্যে হরমোনের মাত্রা থেকে সৃষ্টি হয়।

সাধারণত আলো ও আঁধার থেকে এই ক্রিয়ার সূত্রপাত হয়। আমাদের নিদ্রা, ক্ষুদা ইত্যাদি সময়মতো অনুভবের কারণই হলো সার্কেডিয়ান রিদ্‌ম।

২. পিটুইটারি [pituitary]

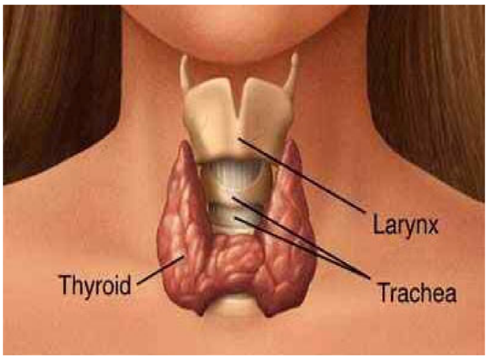
একে পুরো এনডোক্রিন সিস্টেমের মাস্টার গ্রন্থি বলা যায়। এখানে তৈরী হয় বিভিন্ন ধরনের হরমোন। দেহের অপর প্রায় সবগুলো এনডোক্রিন গ্রন্থি এসব হরমোনের সাহায্যে সক্রিয় ও কার্যকর থাকে। ইতোমধ্যে বলেছি, এই গ্লান্ডে তৈরী ভাসোপ্রেসিন হরমোন সমগ্র দেহের পানি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। আমাদের ব্রেনের হাইপোথালামাসের নিকটেই **‘শীম বিচিসদৃশ’** এই গ্লান্ডের অবস্থান। নীচের চিত্রটি দেখুন।



পিটুইটারি গ্লান্ড যেসব হরমোন তৈরী করে তার মধ্যে দেহবৃদ্ধি [যার কারণে হাড্ডি, উপাস্থি [cartilage] এবং অন্যান্য টিস্যুর মধ্যে কোষ-সংক্রান্ত ক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটে], থাইরোইড উদ্বুদ্ধকরণ হরমোন [এর কারণে থাইরোড মেটাবলিজম নিয়ন্ত্রক হরমোন রক্তে ছেড়ে দেয়], এ্যন্টি-ডাইরোটিক [এই হরমোনের কাজ হলো কিনডি থেকে প্রস্রাবের মধ্যে পানির মাত্রা কমানো] এবং প্রোলাক্টিন [নারীদের স্তন ও এর মধ্যে দুগ্ধ তৈরীতে এই হরমোন বিশেষ কার্যকরী] এখানে উল্লেখযোগ্য। পিটুইটারি গ্রন্থিকে হাইপোথালামাস সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করে।

৩. থাইরোইড [thyroid]

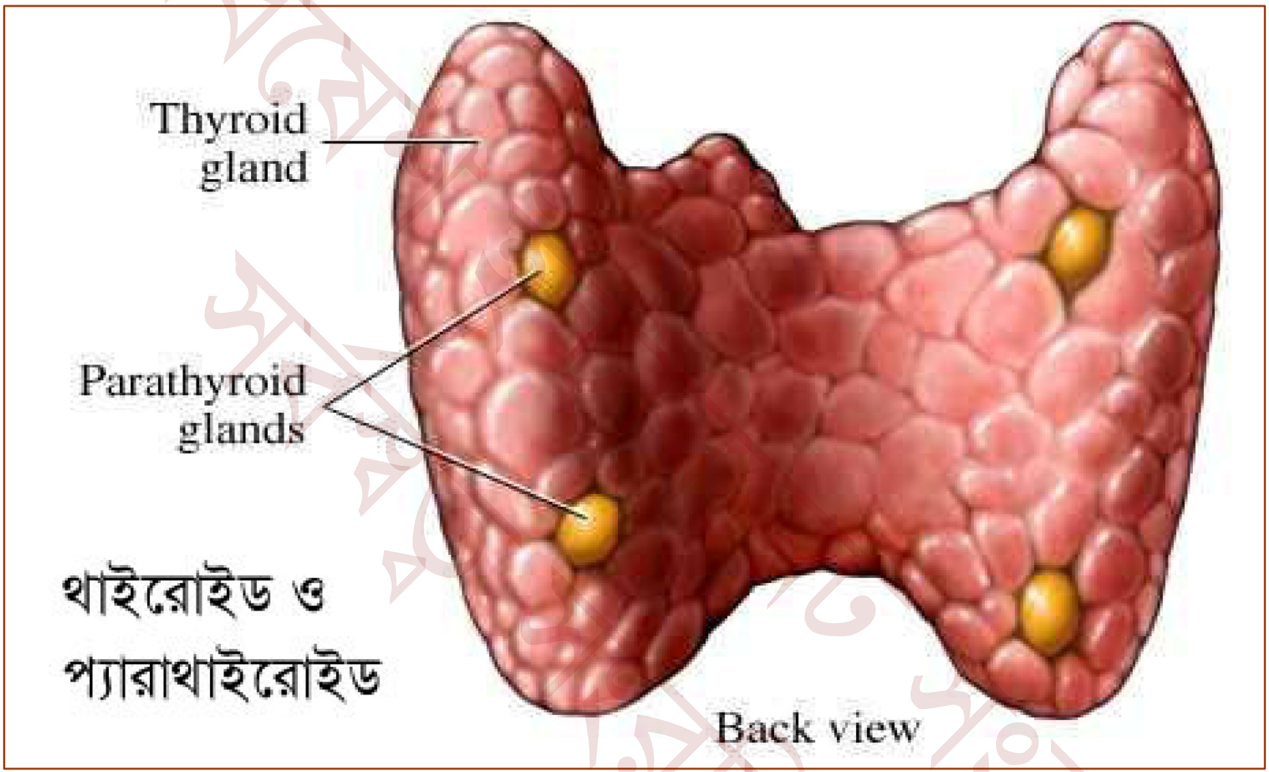
বাংলায় একে গলগ্রন্থি বলে। নীচের চিত্রটি দেখুন। বেড়েওঠা ও বিপাকতন্ত্রের জন্য জরুরী একটি হরমোন থাইরোইড গ্রন্থি থেকে উৎপাদন হয়। এই গ্রন্থির দু’টি অংশ আছে। উভয় অংশ একত্রে কাজ করে। মোট ওজন ২৮ গ্রাম।

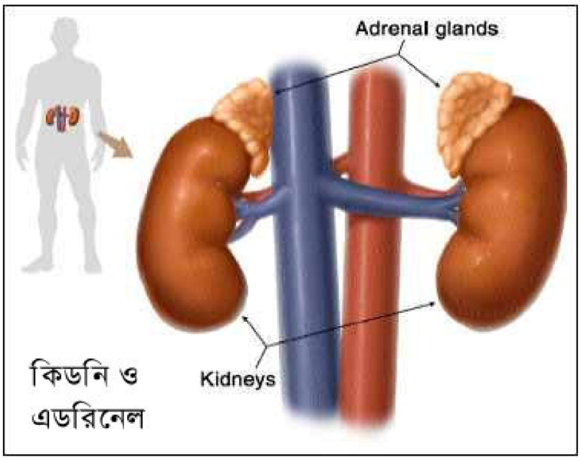


যে হরমোন এটি তৈরী করে তার নাম **‘থাইরোক্সিন’** [thyroxin]। কি পরিমাণ হরমোন এই গ্লান্ড বানাবে তার নির্দেশনা আছে মগজে স্থাপিত পিটুইটারি গ্লান্ড থেকে। টিএসএইচ [TSH - Thyroid Stimulating Hormone] নামক একটি হরমোন এই থাইরোইডে এসে উক্ত নির্দেশনা দেয়। আর টিএসএইচ পিটুইটারি তৈরী করবে কি না তা-ও নির্দেশিত হয় আরেক হরমোন থেকে যা তৈরী হয় হাইপোথালামাস গ্রন্থিতে। যে হরমোন থাইরোইড তৈরী করে তা একটি প্রোটিন, যার নাম **‘থাইরোগ্লোবুলিন’** [thyroglobulin]।

৪. প্যারাথাইরোইড [parathyroid]

থাইরোইড গ্রন্থির নীচে প্রায় ৪টি ছোট্ট [যাদের মোট ওজন ৫৬০ মিলিগ্রামের চেয়েও কম] হেদাংশ মিলে এই গ্রন্থিটি তৈরী হয়েছে। আমাদের রক্তের মধ্যে কি পরিমাণ কেলসিয়াম [কেলসিয়াম আয়োন] ও ফসফোরাস [ফসফেইট] আছে তা নিয়ন্ত্রণ করে এই গ্রন্থিগুলো মিলে। এগুলো **'প্যারাথোরমন'** [rarathormone] নামক একটি হরমোন তৈরী করে। এই হরমোনই উক্ত দু'টি বস্তুর পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের কাজটি সারে। নীচের চিত্রে প্যারাথাইরোইড গ্রন্থির অবস্থান দেখানো হয়েছে।





৫. এড্রিনেল [adrinal]

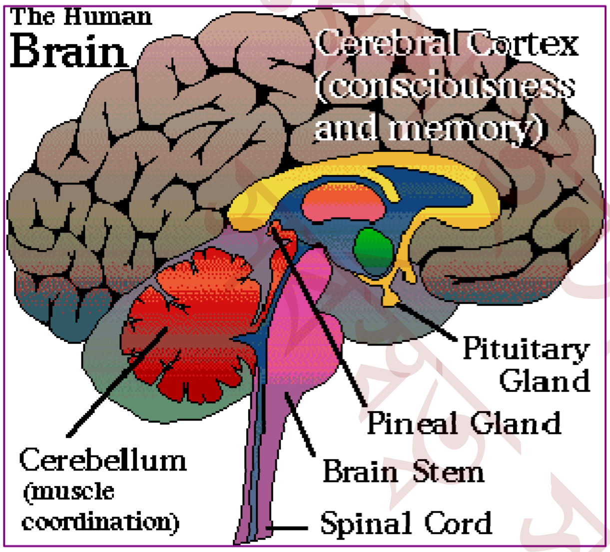
আমাদের উভয় কিডনির উপরে এই গ্রন্থিটির অবস্থান। এনডোক্রিন সিস্টেমে এই গ্রন্থির কার্যকারিতা গুরুত্ববহ। নীচের চিত্রে গ্রন্থির অবস্থান দেখানো হয়েছে।

এই গ্রন্থি থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ হরমোন রক্তে সংযুক্ত হয়। গ্রন্থির দু'টি আলাদা অংশ আছে। অভ্যন্তরীণ অংশের নাম **'মেডুলা'** [medulla]। বাইরের অংশের নাম **'করটেক্স'** [cortex]। প্রথমটি **'এপিনেফ্রিন'** [epinephrine] নামক হরমোন তৈরী করে। কঠিন, চাপপূর্ণ অবস্থার সময় এই হরমোন সক্রিয় থাকে। এই অংশ **'নরেপাইনফ্রাইন'** [norepinephrine] নামক আরেকটি হরমোন তৈরী করে। রক্ত চলাচল স্বাভাবিক রাখতে এটি সহায়তা করে।

বাইরের করটেক্স অংশ ৩০ ধরনের স্টেরোইড জাতীয় [ভিটামিনযুক্ত] হরমোন নিঃসরণ করে। কিন্তু বড় মাত্রায় অতি অল্পই তৈরী হয়। দেহে লবণ ও পানির সামঞ্জস্যতা রক্ষার্থে **'আলডোস্টেরোন'** [aldosterone] নামক একটি হরমোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এড্রিনেল গ্রন্থি এটি নিঃসরণ করে।

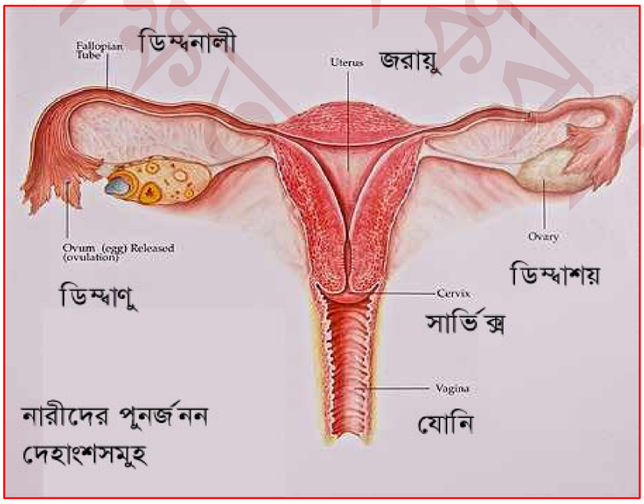
৬. পিনিয়েল বডি [pineal body]

আমাদের রক্তে **'মেলাটোনিন'** [melatonin] নামক হরমোন এই গ্রন্থি থেকেই আসে। এটি মস্তিষ্কের মধ্যে স্থাপিত। নীচের চিত্রটি দেখুন। এ গ্রন্থির অপর নাম **পিনিয়েল গ্লান্ড**। এই গ্রন্থির পূর্ণাঙ্গ কার্যকারিতা এখনো সম্পর্ণূরূপে জানা যায় নি। তবে মেলাটোনিন হরমোনটির কাজ হলো চামড়ার রঙ রদবদল করা। বায়োরিদম [biorhythm] বা স্বাভাবিক মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন ঘটায় এই হরমোন। সুতরাং ঘুমানো, হাটা কিংবা পুনর্জনন ক্রিয়া ইত্যাদি এই হরমোন নিয়ন্ত্রণ করে।



৭. ওভারি [ovary]

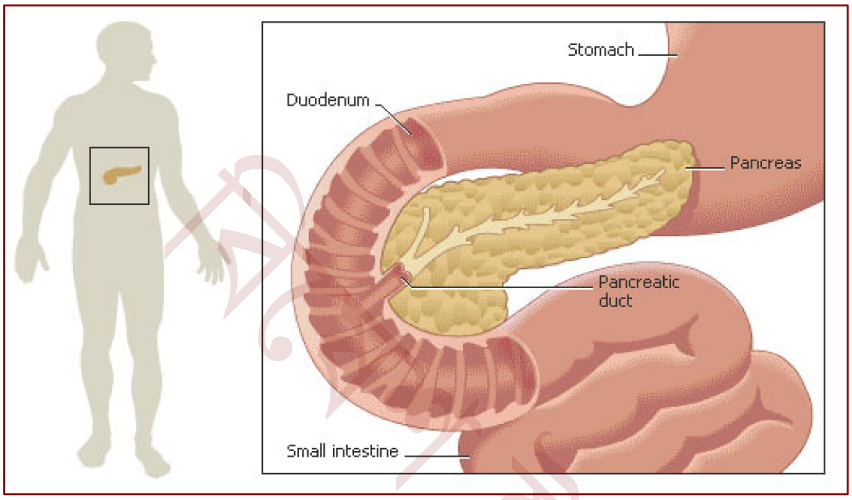
এই গ্রন্থিটি মহিলাদের দেহে বিদ্যমান। এটিই তৈরী করে পুনর্জনন **'ডিম্বকোষ'**। এগুলো দেখতে লম্বাটে, ৩.৮ সেন্টিমিটার দীর্ঘ। নারীদের জরায়ুর উভয়দিকে এদের অবস্থান। নীচের চিত্রটি দেখুন। তারা ফেলোপিয়ান টিউবের মাধ্যমে এতে সংযুক্ত থাকে। ওভারির একাংশে থাকে অসংখ্য বিভিন্ন আয়তনের থলে- যাদের প্রতিটির ভেতর রক্ষিত আছে ডিম্বকোষ। এসবই হলো নারীদের পুনর্জনন কোষ। যৌবনের শুরু থেকে পিরিওড বন্ধের পূর্ব পর্যন্ত প্রত্যেক মাসে ওভারি ডিম্বকোষ ছেড়ে দেয় পুরুষের শুক্রকোষ দ্বারা ফলনশীল হওয়ার জন্য। যদি না হয়, তাহলে জমাট বাধা রক্ত বেরিয়ে আসতে হবে দেহ থেকে। আর এটাই হলো নারীদের মাসিক পিরিওড।



ওভারি এনডোক্রিন সিস্টেমের একটি গ্রন্থিও বটে। অর্থাৎ সে-ও কিছু হরমোন তৈরী করে রক্তের মধ্যে যোগান দেয়। মাসিক পিরিওডকে নিয়মিত রাখতে এবং নারীদের যৌন ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণে এসব হরমোন বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

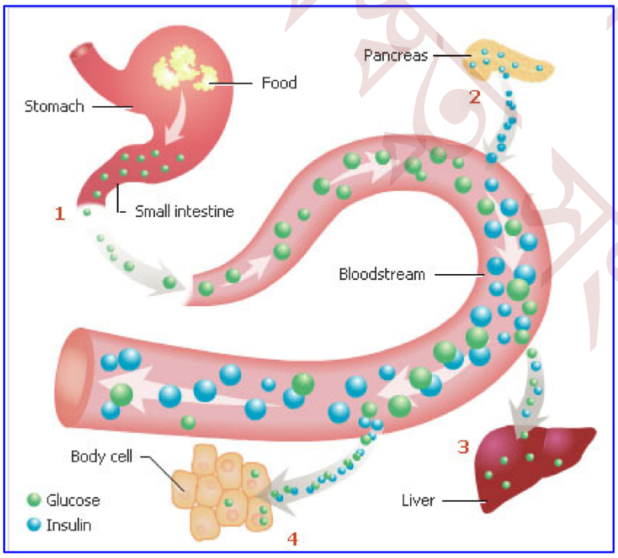
৮. প্যানক্রিস [pancreas]

এই গ্রন্থিটি সম্পর্কে জানা এখন সবার জন্যই জরুরী হয়ে ওঠেছে। আজকের যুগে ডায়াবেটিস নামক রোগটি মারাত্মকভাবে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। গোটা পৃথিবীব্যাপী অসংখ্য মানুষ এ রোগে ভুগছেন। এ রোগটির মূল কারণ কিন্তু প্যানক্রিস নামক এই গ্রন্থিটি।



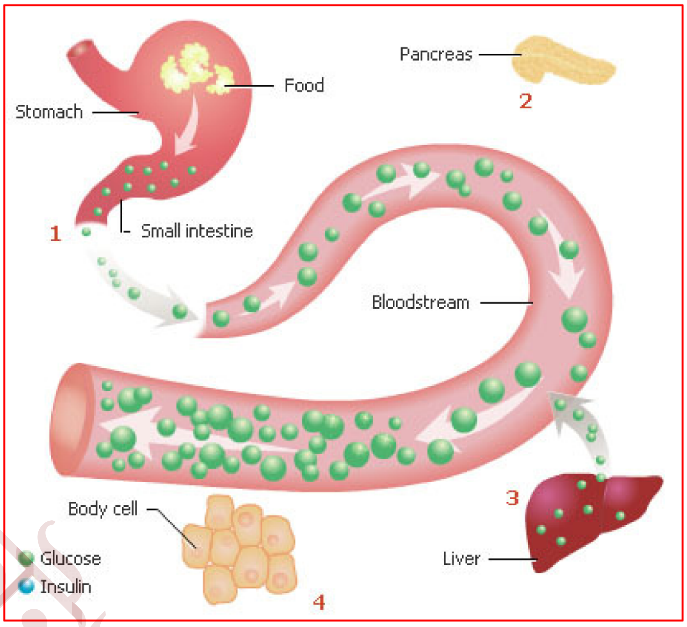
পাশের চিত্রে মানবদেহে প্যানক্রিসের অবস্থান ও তার আকার-নমুনা দেখানো হলো।

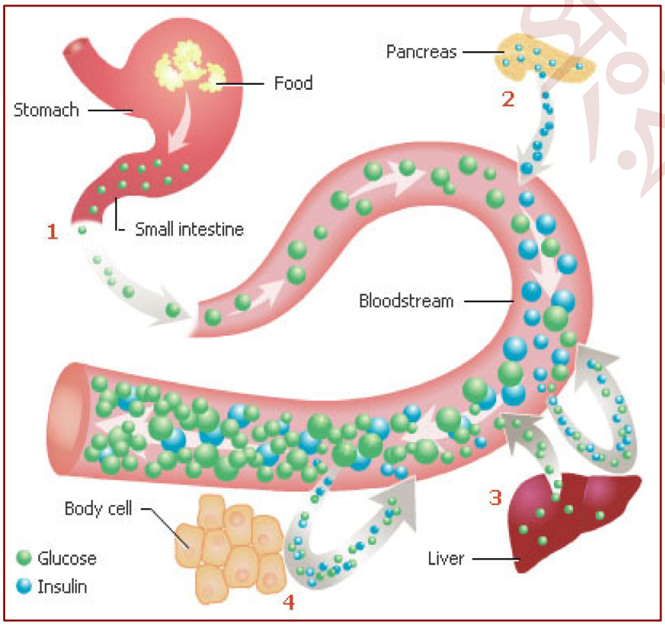
প্যানক্রিস ১৫ থেকে ২০ সেন্টিমিটার দীর্ঘ। আর তার প্রস্থ ৩.৮ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। এটা ১.৩ থেকে ২.৫ সেন্টিমিটার ঘন। ওজনে প্রায় ৮৫ গ্রাম। এক্সোক্রিন ও এনডোক্রিন সিস্টেমের একটি গ্রন্থি হলো এই প্যানক্রিস। খাদ্য হজমের জন্য জরুরী কিছু **এনজাইম** [enzyme] এটা আঁতের মধ্যে নিঃসরণ করে। এনডোক্রিস নিঃসরণ **'ইনসুলিন'** [insulin] হলো দেহের চিনি নিয়ন্ত্রণের জন্য একান্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্যানক্রিসে এই ইনসুলিন তৈরী হয়। সঠিক পরিমাণ ইনসুলিন তৈরীতে প্যানক্রিস ব্যর্থ হলেই ডায়াবিটিস রোগের সূত্রপাত ঘটে।



ডায়াবিটিস মেলাইটাস [diabetes mellitus]: এ রোগটির স্বরূপ আরো কিছু জানা আমাদের জন্য জরুরী মনে করে কিছু অতিরিক্ত ব্যাখ্যার প্রয়োজন বোধ করছি। বায়ের চিত্রে একজন স্বাস্থ্যবান ব্যক্তির ক্ষেত্রে ইনসুলিনের সফল কার্যকারিতা দেখানো হয়েছে। চারটি বিষয় জেনে নেওয়া জরুরী। এগুলো ১, ২, ৩ ও ৪ সংখ্যা দ্বারা চিত্রে দেখানো হয়েছে। এগুলোর ব্যাখ্যা হলো: **১. গ্লুকোজ রক্তের মধ্যে প্রবেশ করা:** আপনি যে খাবার খাবেন তাতে আছে গ্লুকোজ [বা চিনি]। এই চিনির প্রয়োজন আছে দেহের জন্য। হজম হওয়ার সময় খাদ্যের চিনি পাকস্থলী আলাদা করে পাঠিয়ে দেয় ছোট্ট ইনটেস্টিন বা আঁতে। ছোট্ট আঁত থেকে গ্লুকোজ বেরিয়ে এসে রক্তের মধ্যে প্রবেশ করে। **২. প্যানক্রিস ইনসুলিন তৈরী করে:** আমাদের প্যানক্রিস ইনসুলিন তৈরীর কারখানা। এটা একটি হরমোন যার কাজ চিনি নিয়ন্ত্রণ। দেহ যাতে সহজে গ্লুকোজ গ্রহণ করে নেয় সেটা নিশ্চিত করে ইনসুলিন। রক্তের মধ্যে ইনসুলিন যুক্ত হয় প্যানক্রিস থেকে। **৩. গ্লুকোজ লিভারে প্রবেশ করে:** লিভারের কোষে গ্লুকোজ প্রবেশ নিশ্চিত করতে ইনসুলিন সাহায্য করে। লিভার নিজের মধ্যে গ্লুকোজ গোদামজাত করে রাখে যাতে পরবর্তীতে অন্যান্য দেহকোষ এটা কাজে লাগাতে পারে। **৪. গ্লুকোজ দেহে প্রবেশ করে:** ইনসুলিন দেহের কোষসমূহে সহজে গ্লুকোজ প্রবেশ করতে সাহায্য করে। গ্লুকোজ কোষে ঢুকে এনার্জি সৃষ্টিতে কোষকে সাহায্য করে। এতো গেলো স্বাস্থ্যবান ব্যক্তির কথা। এবার জেনে নিন ডায়াবিটিস রোগির অবস্থা।

ডানে আমরা একই ধরনের চিত্র দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এটা টাইপ-১ ডায়াবিটিস রোগির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এখানেও চারটি সংখ্যা আছে। এগুলোর ব্যাখ্যা হলো: **১. গ্লুকোজ রক্তে প্রবেশ করে:** হজম হওয়ার সময় খাদ্যের চিনি পাকস্থলী আলাদা করে পাঠিয়ে দেয় ছোট্ট ইনটেস্টিন বা আঁতে। ছোট্ট আঁত থেকে গ্লুকোজ বেরিয়ে এসে রক্তের মধ্যে প্রবেশ করে। **২. প্যানক্রিস ইনসুলিন তৈরীতে ব্যর্থ:** প্যানক্রিস ইনসুলিন তৈরীতে ব্যর্থ বা অতি অল্প তৈরী করে। আর ইনসুলিন ছাড়া রক্তের মাধ্যমে গ্লুকোজ দেহকোষে ঢুকতে পারে না। পরিণামে গ্লুকোজ রক্তের মধ্যেই থেকে যায়। পরীক্ষার সময় গ্লুকোজের মাত্রা অতিরিক্ত হিসাবে ধরা পড়ে। **৩. লিভার গ্লুকোজ গ্রহণ করতে পারে না:** রক্তে ইনসুলিন না থাকায় লিভার গ্লুকোজ চুষে নিতে পারে না। বরং লিভার কিছুটা গ্লুকোজ রক্তের মধ্যে ছেড়ে দেয়। **৪. ক্রমে রক্তের মধ্যে গ্লুকোজ বাড়তে থাকে:** রক্তে ইনসুলিন না থাকায় হেদকোষ গ্লুকোজ গ্রহণ করতে পারে না। রক্তে অতিরিক্ত গ্লুকোজ জমা হয়। পরিণামে ডায়াবিটিসের সাথে সংশ্লিষ্ট মেডিকেল সমস্যাবলী দেখা দেয়।





টাইপ ১ ডায়াবিটিস রোগের মূল কারণ হলো প্যানক্রিস ইনসুলিন যথেষ্ট পরিমাণ প্রস্তুত করে না। অর্থাৎ প্যানক্রিসের কার্যকারিতার ব্যর্থতা। তবে অপর আরেক ধরনের ডায়াবিটিস আছে যার মূল কারণ হলো হেদকোষ ইনসুলিন সঠিকভাবে কাজে লাগাতে না পারা। এ ক্ষেত্রেও রক্তে ইনসুলিনের মাত্রা অতিরিক্ত হয়ে পড়ে। বায়ের চিত্রে ব্যাপারটি বুঝানোর চেষ্টা হয়েছে। **১. রক্তে গ্লুকোজের প্রবেশ:** সাধারণভাবেই পাকস্থলী থেকে আঁত হয়ে গ্লুকোজ রক্তের মধ্যে প্রবেশ করে। **২. প্যানক্রিস ইনসুলিন তৈরী করে:** প্যানক্রিস স্বাভাবিক মাত্রায় ইনসুলিন বানিয়ে রক্তে ছেড়ে দেয় ঠিকই। **৩. লিভার ইনসুলিন গ্রহণ করে না:** এটার কারণ অনেকটা হতে পারে। পরিণামে লিভার আরো কিছু মওজুদ থাকা ইনসুলিন রক্তের মধ্যে ছেড়ে দেয়। **৪. দেহের কোষগুলো ইনসুলিন নিতে চায় না:** দেহের কোষগুলো ইনসুলিন গ্রহণ করতে নারাজ। সুতরাং ইনসুলিন থাকাসত্ত্বেও রক্ত থেকে গ্লুকোজ কোষে ঢুকতে পারে না। ফলে অতিরিক্ত গ্লুকোজ ধীরে ধীরে রক্তের মধ্যে বেড়ে ওঠে। পরিণামে ডায়াবিটিস রোগের ফলে যেসব সমস্যার সৃষ্টি হয় তা দেখা দেয়।

প্রিয় শ্রোতা! আশাকরি উক্ত ব্যাখ্যা থেকে ডায়াবিটিস নামক ক্ষতিকর রোগের স্বরূপ আপনারা অনেকটা বেশী বুঝতে পেরেছেন। এ রোগের কারণ এখনও সঠিকভাবে জানা যায় নি। বিজ্ঞানীদের ধারণা, জেনেটিক ও পারিপার্শ্বিক কারণে ডায়াবিটিস হতে পারে। শরীরে অতিরিক্ত মেদ থাকলেও ডায়াবিটিস রোগে আক্রান্ত হওয়ার চান্স আছে। সুতরাং নিয়মিত ব্যায়াম ও খাদ্য গ্রহণ নিয়ন্ত্রতে রাখলে মারাত্মক এই রোগ থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে। আশারাখি শিক্ষার্থীরা বিষয়টি গুরুত্বসহ বিবেচনা করবেন নিজের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত রাখতে।

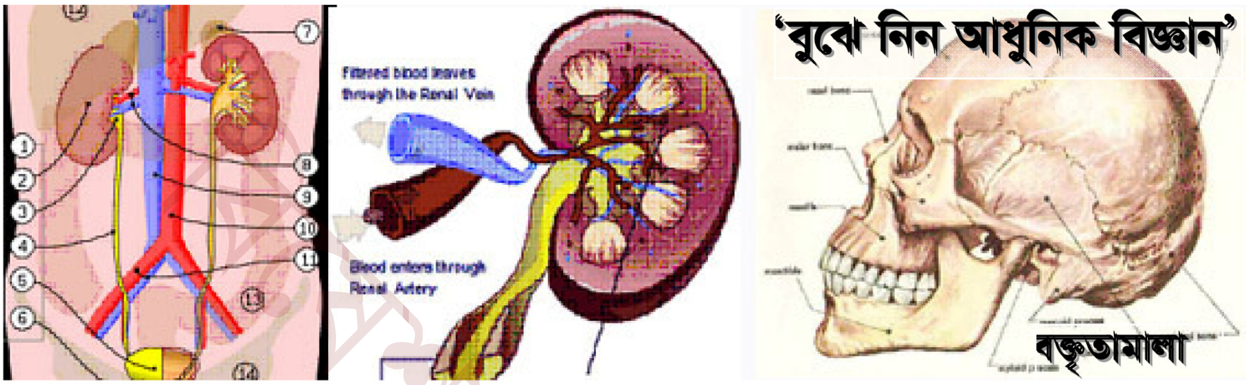
৯. টেস্টিজ [testis]

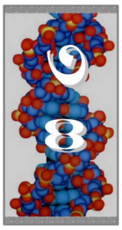
আজকের লেকচারের উদ্দেশ্য ছিলো পুরো এনডোক্রিন সিস্টেম সম্পর্কে যা বলার তা শেষ করা। এ পর্যন্ত সিস্টেমের ৭টি গ্রন্থির উপর সংক্ষিপ্ত আলেচনা হয়েছে। এখন আমরা সর্বশেষ গ্রন্থি টেস্টিজ নিয়ে এক দু'টো কথা বলবো। পুরুষাঙ্গের নিকটে ঝুলন্ত এই গ্রন্থিটির কোনো ছবি তুলে ধরার প্রয়োজন বোধ করছি না! আধুনিক মেডিকেল সাইন্স এ গ্রন্থি সম্পর্কে কী বলে তা-ই এখন সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করবো। ভেবেছিলাম, এ সম্পর্কে কিছু বলবো না- কিন্তু বিজ্ঞানের স্বার্থে মত পাল্টিয়েছি।

প্রত্যেক পুরুষের টেস্টিজ নামক দু'টি গ্রন্থি আছে। এগুলোকে বাংলায় পুরুষের অণ্ডকোষও বলে। অণ্ডকোষের মূল ফাংশন বা কাজ হলো শুক্রকোষ উৎপাদন। তবে এনডোক্রিম সিস্টেমের অংশ হিসাবে এসব গ্রন্থি **'এ্যানড্রোজেন'** [androgen] নামক যৌন হরমোনও নিঃসরণ করে। পুরুষের যৌন উদ্দীপক হরমোন **'টেস্টোস্টারোন'** [testosterone] এখানে উৎপাদন হয়। মুখে দাড়ি গজে ওঠা, কণ্ঠ গভীর হওয়া এবং দেহের পেশীর উন্নয়ন এই হরমোনই নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়া পুরুষের যৌনসংক্রান্ত চরিত্রকে এটা প্রভাবান্বিত করে।

এনডোক্রিন সিস্টেমের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানেই শেষ। মানবদেহের কার্যকারিতা সঠিকভাবে নিশ্চিত রাখতে আরো কয়েকটি সিস্টেম কাজে নিয়োজিত আছে। আমরা একে একে সবগুলোর উপরই সংক্ষিপ্ত এবং সাধারণ পরিচিতিমূলক আলোচনার আশার রাখি। আগামী লেকচারে মূত্রতন্ত্র বা **ইউরিনারি** [urinary] সিস্টেমের উপর আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ। সবাই উপস্থিত হবেন এই আশা রেখে শেষ করছি আজকের লেকচার।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম





বক্তা: ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী, নেশন্যাল ডিপ্লোমা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ইংল্যান্ড।

স্থান: খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সুবিদ বাজার, সিলেট।

ঙ. জীববিদ্যা: পরিচিতি ও কার্যকারিতা

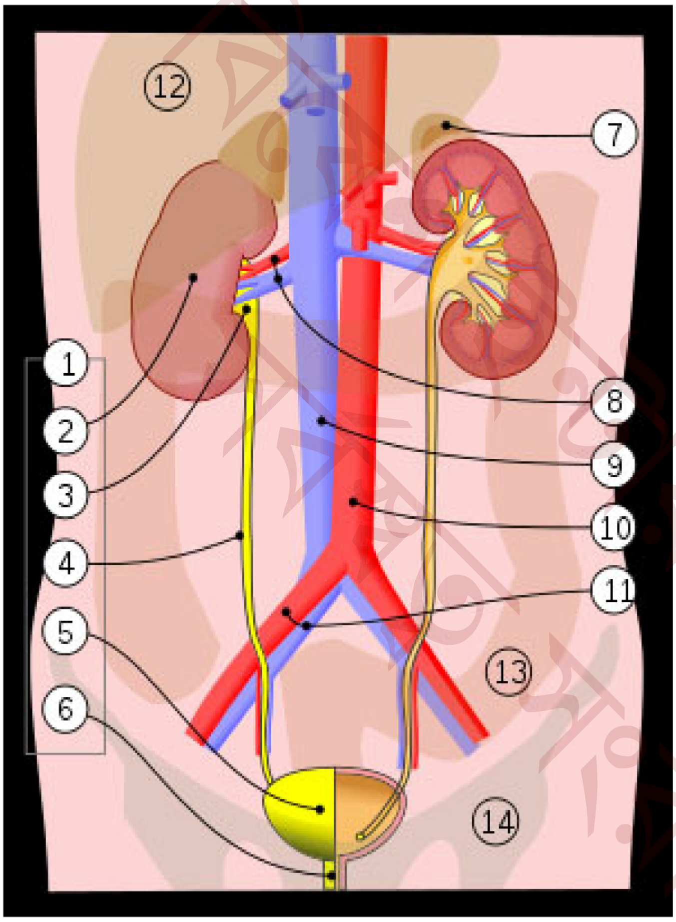
বক্তৃতা ৩৪ : প্রাণীজগৎ

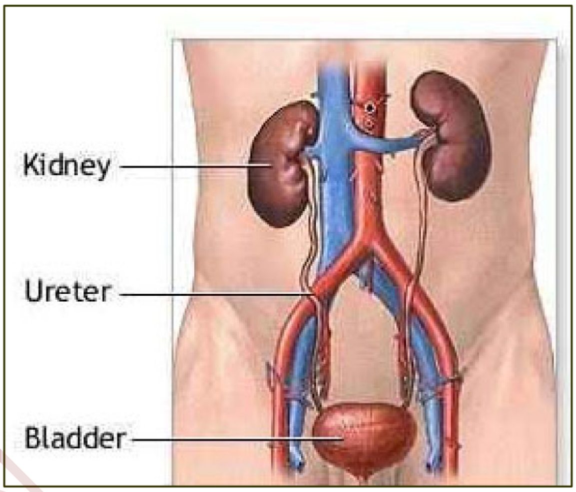
৩. ৩. ইউরিনারি সিস্টেম [urinary system]

মূত্রতন্ত্র একটি জটিল প্রক্রিয়া যা দেহ থেকে **'ইউরিন'** [urine] নিঃসরণ করে। ইউরিন বা মূত্র একটি হলদে রঙের তরল পদার্থ। এটি কিডনিতে উৎপাদন হয়। এতে থাকে গলে-যাওয়া দেহবর্জ্য এবং অতিরিক্ত পানি। মূত্র বা প্রস্রাবে আরো থাকে বিভিন্ন ধরনের কেমিকেল বস্তু। কিডনি যখন রক্তকে ছাঁকে তখনই এটা উৎপাদন হয়। প্রত্যহ অন্তত ১১০ লিটার পানিসর্বস্ব মূত্র কিডনি বের করে রক্ত ছেঁকে। ইউরিনারি সিস্টেমের প্রধান অরগ্যান বা দেহযন্ত্র হলো এই কিডনি। প্রিয় ছাত্র বন্ধুরা! আমাদের পেটের নীচের দিকে দু'টি কিডনি আছে। মূত্রতন্ত্র ঠিক কিভাবে কার্যকর আছে তা জানতে এই কিডনি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন জরুরী। সুতরাং আমরা এখন কিডনির উপর বিস্তারিত আলোচনা করবো। নীচের [পরের পৃষ্ঠার] চিত্রে পুরো সিস্টেমের একটি সংক্ষেপ ছবি ফুটে ওঠেছে। এর বিভিন্ন অংশের নাম নীচে উল্লেখ করছি।

মানব ইউরিনারি সিস্টেম: ১. সিস্টেম, ২. কিডনি [kidney], ৩. রিনেল পেলভিস [renal pelvis], ৪. ইউরিটার [uriter], ৫. ইউরিনারি ব্লাডার [urinary bladder], ৬. ইউরিথ্রা [urethra], ৭. আরডিনেল গ্লান্ড

[adrenal gland], ৮. রিনেল আরটারি এন্ড ভেইন, [renal artery and vein], ৯. ইনফেরিওর ভেনা কাভা [inferior vena caval], ১০. এবডোমিনেল এওরটা [abdominal aortal], ১১. কমন ইলিয়াক আরটারি এন্ড ভেইন [common iliac artery and vein], ১২. লিভার [liver], ১৩. লার্জ ইন্টেস্টিন [large intestine] এবং ১৪. পেলভিস [pelvis]।





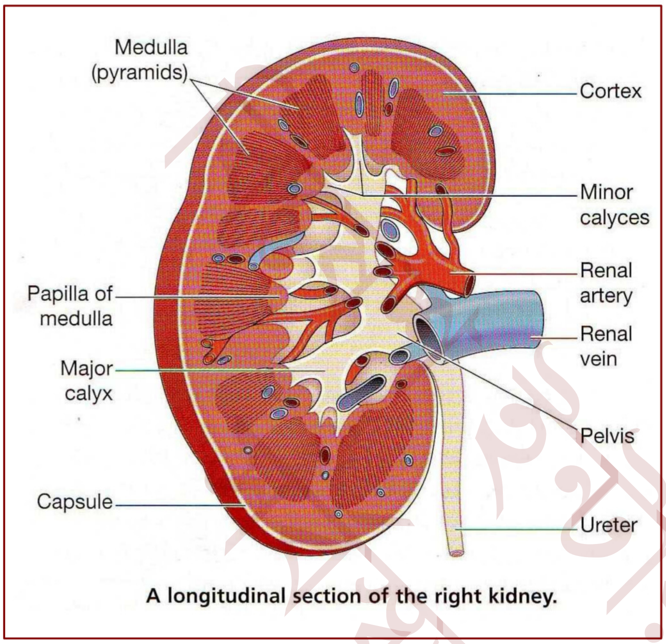
৩.৩.১. কিডনি বা বৃক্ক

কিডনির পরিচয় ও কার্যকারিতার উপর আলোচনাকালে বেশ ক'টি চিত্র তুলে ধরবো। শ্রোতারা নোট বইয়ের এসব চিত্রের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখবেন আশাকরি। প্রথমত আমাদের দেহে উভয় কিডনির অবস্থান উপরের চিত্রে তুলে ধরেছি। একে একটু স্টাডি করে নিলে ভালো হয়।

উপরের চিত্র থেকে স্পষ্ট, আমাদের কিডনিদ্বয় একটা আরেকটার সঙ্গে সংযুক্ত। ডানের কিডনি বায়েরটা থেকে একটু নীচে। উভয় কিডনি থেকে একটি টিউব বা পাইপ যুক্ত হয়েছে যৌনাঙ্গের কিছুটা উপরে স্থাপিত মূত্রথলে বা ব্লাডারে। সেখান হতে ইউরিন বেরিয়ে আসে দেহ থেকে। কিডনিদ্বয়ের অবস্থান জানার পর আমরা এবার মূল আলোচনা তথা কিডনির কার্যকারিতা সম্পর্কে ব্যাখ্যায় যেতে পারি।

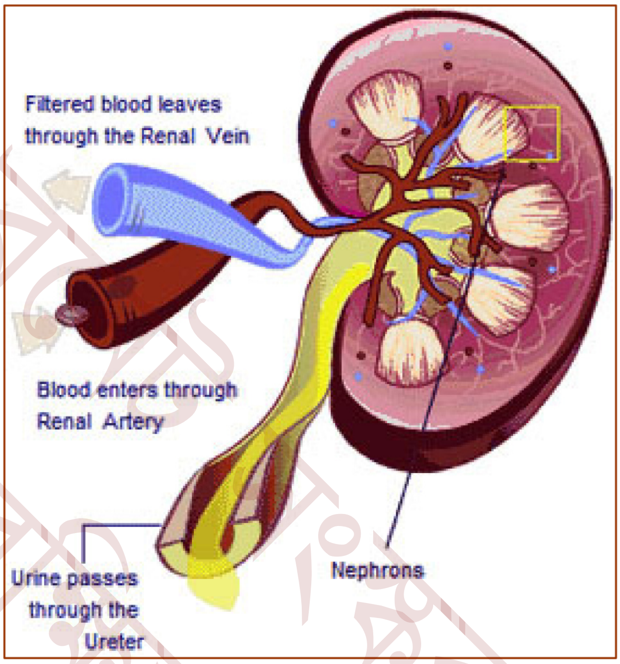
প্রথমত কিডনির বিভিন্ন অংশের উপর কিছুটা ব্যাখ্যার প্রয়োজন। কিডনি দেখতে অনেকটা সীমের বিচির মতো লাগে। নীচের [পরের পৃষ্ঠার] চিত্রে আমরা কাটা একটি কিডনির ছবি এঁকেছি। এতে [ইংরেজীতে] বিভিন্ন অংশের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিটি অংশের আলাদা ফাংশন আছে। যেমন: বাইরের অংশকে বলে করটেক্স [cortex]। এর নীচে আছে মেডালা [medulla]। এখানে ৮ থেকে ১৮টি পর্যন্ত মোচাকার অংশ আছে যাকে **'পিরামিড'** বলা হয়। এসব পিরামিডের সরুর দিকটি কিডনির কেন্দ্রের দিকে স্থাপিত। পিরামিডের ভেতর দিয়ে

করটেক্স বেড়ে একটি কাঠামো তৈরী করেছে যার নাম **'রিনেল কলাম'** [renal column]। কিডনির কেন্দ্রে একটি ফাঁকা অংশ আছে যার নাম **'রিনেল পেলভিস'** [renal pelvis]।



A longitudinal section of the right kidney.

বর্জ্যযুক্ত রক্ত দেহ থেকে রিনেল আর্টারি [renal artery] দিয়ে কিডনির ভেতর প্রবেশ করে। ছাঁকার পর ভালো রক্ত আবার রিনেল ভেইন [renal vein] দিয়ে বেরিয়ে এসে দেহের ভেতর চলে যায়। ছাঁকার সময় কিডনি রক্ত থেকে দূষিত পানি ও অন্যান্য রসায়নিক বর্জ্য ইউরিটার [ureter] পাইপের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেয় মূত্রথলে। সেখান থেকে বর্জ্য প্রস্রাব হিসাবে বেরিয়ে যায়। নীচের চিত্রটি দেখুন।



ফিল্টারিংয়ের কাজ যে অংশ করে তার নাম নেফ্রন [nephron]। সেখানে একটি ক্ষুদ্র অংশ আছে যার নাম গ্লমেরিউলাস [glomerulus]। দেহের মধ্যে কি পরিমাণ পটাসিয়াম [potassium], কেলসিয়াম [calcium] এবং হাইড্রোজেন দরকার তা এই অংশটি নিয়ন্ত্রণ করে। এটা বেদরকারী বস্তু যেমন ড্রাগ এবং খাদ্য সম্পূরক দ্রব্যাদি। নেফ্রনে ছাঁকা ইউরিন দীর্ঘ যে পাইপের মাধ্যমে মূত্রথলে চলে যায় তার নাম ইউরিটার।

অতি সংক্ষেপে কিডনির মূল ফাংশন নিম্নরূপ সংঘটিত হয়:

১. খাবার ও পানীয় আমাদের পাকস্থলীতে প্রবেশের পর তা হেদের জন্য উপকারী নিউট্রিয়েন বস্তুতে পরিণত হয়।

২. তবে সবই ব্যবহারযোগ্য নিউট্রিয়েন পরিণত হয় না- বর্জ্য হিসাবে তরল ও কঠিন পদার্থ থাকে। এগুলো সরিয়ে উপযোগী নিউট্রিয়েন রক্তে যোগান দিতে হবে।

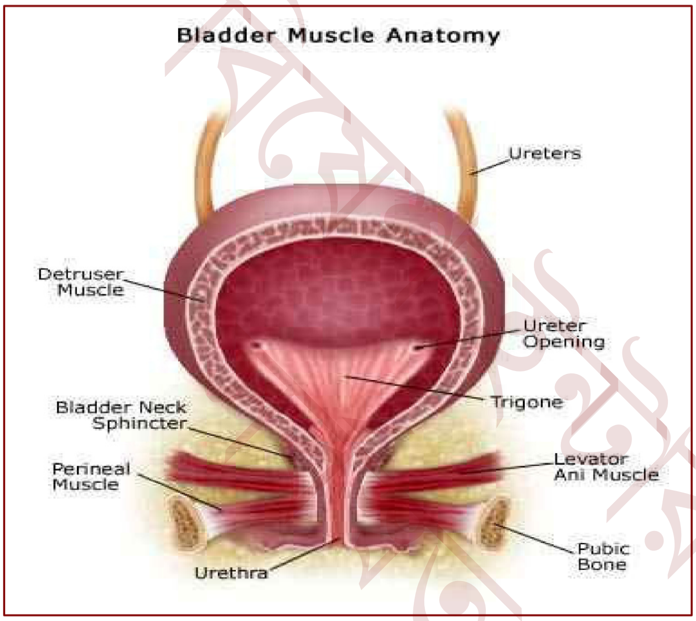
৩. কঠিন বর্জ্য পদার্থ বেরিয়ে যায় গুহ্যদ্বার হয়ে। অপরদিকে নিউট্রিয়েনসমূহ দেহ কাজে লাগায় এনার্জি, বৃদ্ধি, মেরামত এবং সার্বিক তত্ত্বাবধান নিশ্চিত রাখতে।

৫. নিউট্রিয়েনের মধ্যেও ইউরিনসহ বর্জ্য সৃষ্টি হয়। এগুলো প্রথমত রক্তের মধ্যে থাকে। কিডনিতে রক্ত প্রবেশ হওয়ার পর এগুলো ছেঁকে আলাদা করা হয়।

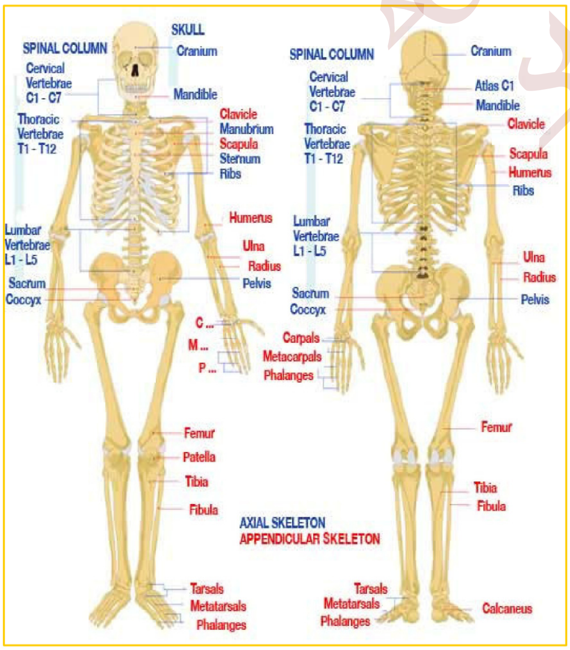
৬. বর্জ্য ও অতিরিক্ত পানি কিডনি থেকে চলে আসে ব্লাডারে। এখান থেকে চলে যায় প্রস্রাব হিসাবে বাইরে।

৩.৩.২. ব্লাডার [bladder] বা মূত্রথলে

মূত্রতন্ত্রের প্রধান দেহযন্ত্র হলো কিডনি। আমরা এতোক্ষণ কিডনি নিয়ে আলোচনা করেছি। ব্লাডার হলো পানীয় জমা রাখার একটি থলে। প্রতিনিয়ত কিডনি থেকে পানীয় এসে এই থলেতে জমা হয়। নীচে ব্লাডারের একটি চিত্র তুলে ধরেছি। একটু দেখে নিন।



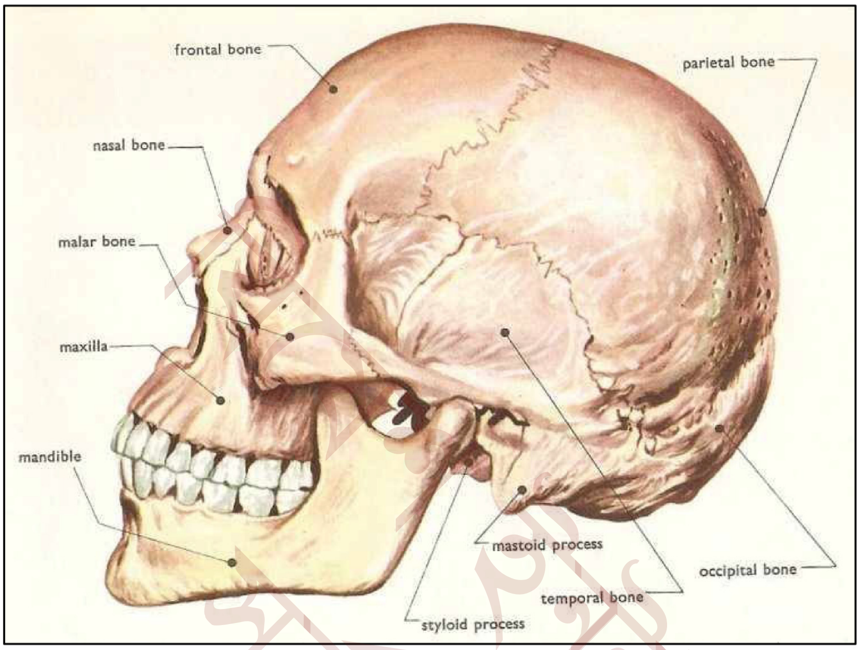
ইউরিটার পাইপের মাধ্যমে প্রস্রাব ব্লাডারে প্রবেশ করে। এরপর তা সময় সময় ইউরিথ্রা দ্বারা বেরিয়ে আসে। আমাদের ব্লাডার ৩০০ থেকে ৩৫০ লিটার মূত্র স্টোর করতে পারে। তবে এক সময় অতিরিক্ত প্রস্রাব জমা হয়ে যায় এবং তখন কিছুটা স্টোরেজ বের করার প্রয়োজন পড়ে। প্যারাসিমপাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম নামে একটি তন্ত্র কার্যকর আছে আমাদের দেহে। ব্লাডার পরিপূর্ণ হলে এই নার্ভাস সিস্টেম সাড়া দেয় ও ব্লাডার সংকোচন হতে থাকে। এভাবে ব্লাডার থেকে মূত্র বেরিয়ে আসে। অবশ্য শুধু নার্ভাস সিস্টেম যথেষ্ট নয়- ব্লাডার খোলার জন্য ব্যক্তির ইচ্ছাও জরুরী।



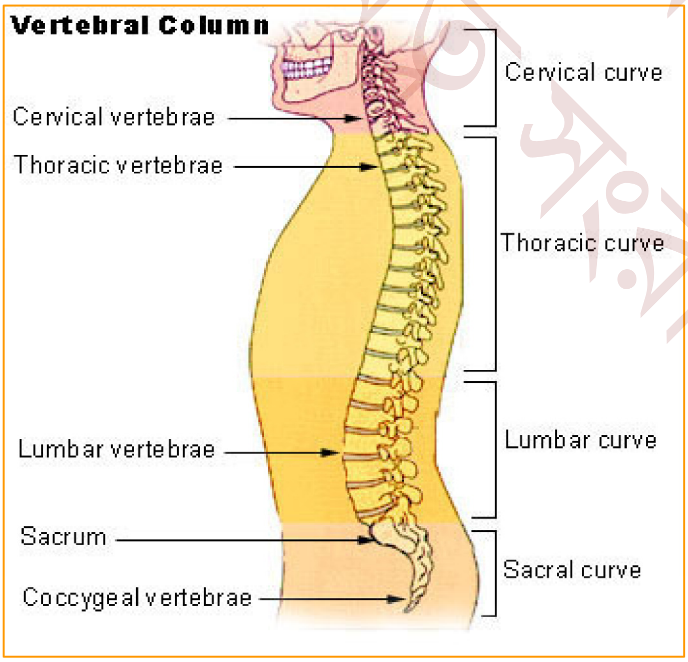
৩.৪. স্কেলেটেল সিস্টেম [skeletal system]

মানব কঙ্কালসার একটি শক্তিশালী তন্ত্র। পুরো কঙ্কালসারে মোট ২০৬ খানা হাড্ডি আছে। সবগুলো মিলেই মানবদেহের ভারসাম্য রক্ষা করে যাচ্ছে। বায়ের চিত্রে মানব কঙ্কালসারের সামন ও পেছনের দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। কঙ্কালের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি অংশ আছে। যেমন: মাথার খুলি, হাত-পা, পাঁজর, পেলভিস [শ্রোণী] এবং মেরুদণ্ড। আমরা এখন একে একে এসব কঙ্কালের উপর আলোচনা করবো।

মাথার খুলি: মানব মাথার খুলির কাজ অনেক গুরুত্বপূর্ণ। একে দু'টি আলাদা অংশে বিভক্ত করা যায়: ১. ক্রানিয়েল [cranial] ও ২. ফেসিয়েল [facial]। অর্থাৎ করোটি ও মুখের হাড্ডি। আমাদের মস্তিষ্ককে প্রথম অংশ ঘিরে রেখেছে। দ্বিতীয় অংশে আছে খুলির বাকী সকল হাড্ডি। নীচের (পরের পৃষ্ঠার) চিত্রে মাথার খুলির বিভিন্ন অংশ দেখানো হয়েছে।



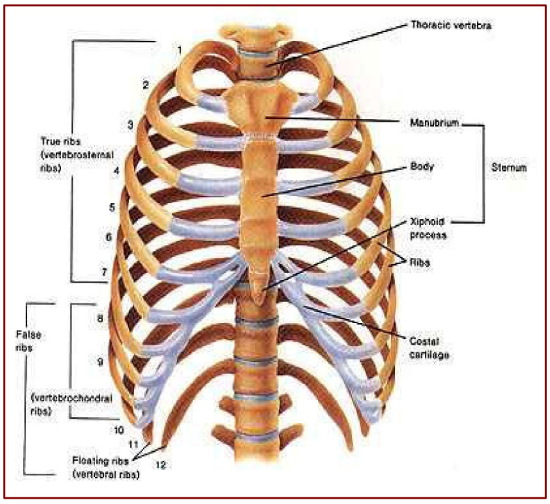
মানব খুলিতে মোট ২২টি হাড্ডি আছে। এদের নাম হলো: অক্সিপিটেল [Occipital], প্যারিটেল [Two Parietal] -দু'টি, ফ্রন্টেল [Frontal], টেম্পোরেল [Two temporal] -দু'টি, স্পেরোইড [Sphenoid], এথমোইড [Ethmoid], নেসেল [Two nasal] -দু'টি, সুপারিয়ার মেক্সিলারি [Two superior maxillary] -দু'টি, লাক্রিমল [Two lachrymal] -দু'টি, মেলার [Two malar], -দু'টি, পালেট [Two palate] -দু'টি, ইনফেরিয়াম রার্বিনেটেড [Two inferior turbinated] -দু'টি, ভমার [Vomer], এবং ইনফেরিয়ার মেক্সিলারি [Inferior maxillary]। খুলি আমাদের ব্রেন, চোখদ্বয়, মধ্যম ও অভ্যন্তরীণ কর্ণদ্বয়কে নিরাপত্তা দান করেছে।

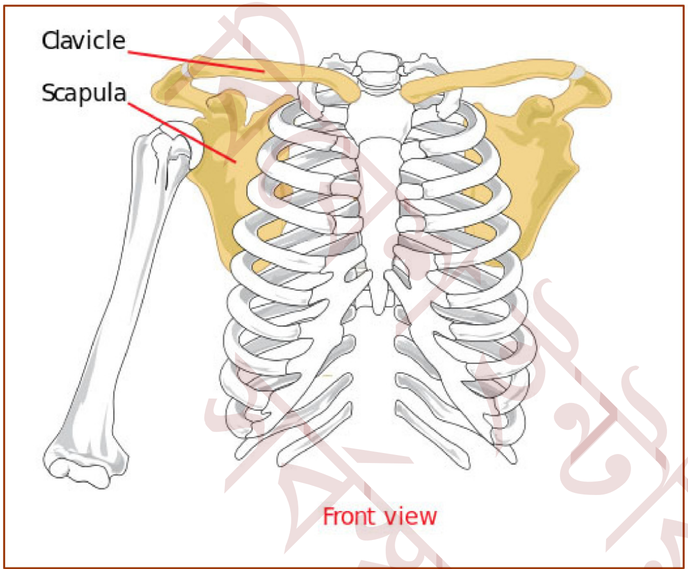


ভারটেব্রেল কলাম [Vertebral column]: এটাই আমাদের মেরুদণ্ড। এতে আছে মোট ৩৩টি হাড্ডি। নীচের চিত্রটি দেখুন। মেরুদণ্ডের মূল ফাংশন হলো স্পাইনেল কর্ড [spinal cord] বা মেরুরজ্জুকে নিরাপত্তা প্রদান।

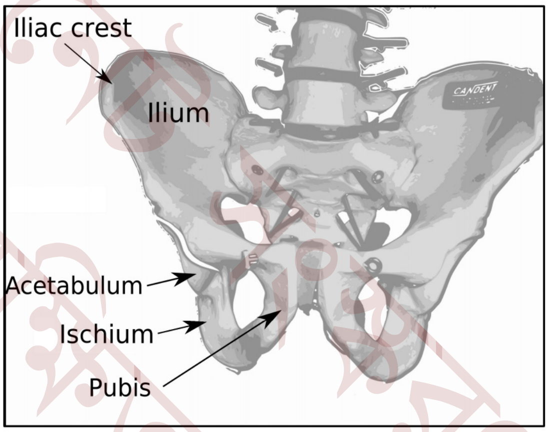
রিব কেইজ [rib cage] ও স্টেরনাম [sternum]: পাঁজর পিঞ্জর বা রিব কেইজে আছে ১২ জোড়া [২৪টি] হাড্ডি। থরেসিক কাভিটি [thoracic cavity] অঞ্চলের চতুর্দিকে পাঁজর অবস্থিত। থরেটিক কাভিটিতে যেসব দেহযন্ত্র আছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ক'টি হলো: ফুসফুস, হৃদযন্ত্র এবং বড় শিরাসমূহ। সুতরাং এগুলো নিরাপত্তা দানে সক্রিয় আছে আমাদের পাঁজর। নীচের [পরের পৃষ্ঠার] চিত্র দেখুন। অবশ্য বুকের দিকে স্টেরনাম [sternum] বা বক্ষাস্থি ও পেছনের দিকে মেরুদণ্ডের হাড্ডিগুলোও এসব দেহযন্ত্র নিরাপত্তায় সক্রিয় ভূমিকা রাখে।

ক্লাভিকল [clavicle] ও স্কাপুলা [scapula]: ক্লাভিকল বা কণ্ঠাস্থি এবং স্কাপুলা বা অংসফলক [কাঁধের প্রশস্ত অস্থি] আমাদের কাঁধকে নিরাপত্তা প্রদান করে। নিম্নের চিত্রে এসব অস্থি দেখানো হয়েছে।





ইলিয়াম [ileum]: শ্রোণী বা পেলভিস অংশের মূল অস্থি এটি। নিম্নের চিত্রটি দেখুন। ইলিয়ামের কাজ হলো মানবদেহের উরু, পরিপাক ও মূত্রতন্ত্রকে নিরাপত্তা দান।

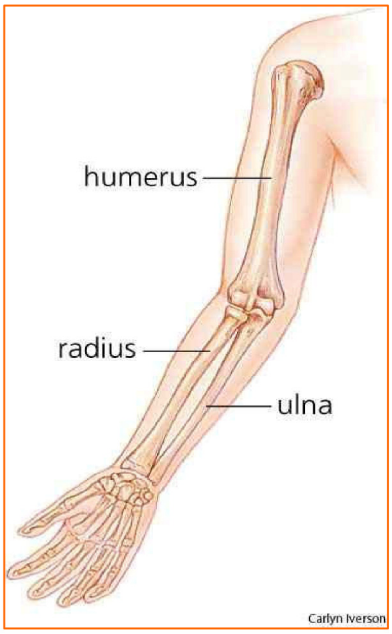


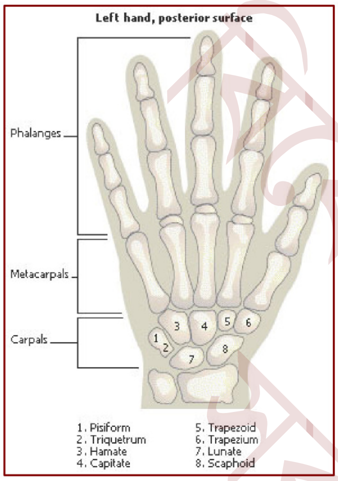
পাটেলা [patella], উলনা [ulna] ও রেডিয়াস [radius]: পাটেলাকে বাংলায় মালাইচাকি বলে। ইংরেজীতে নি ক্যাপ [knee cap] নামেও পরিচিত। এটাই আমাদের হাঁটুর বড় অস্থিখণ্ড। নীচের চিত্রে হাঁটুর এই হাড্ডিখণ্ড দেখানো হয়েছে।



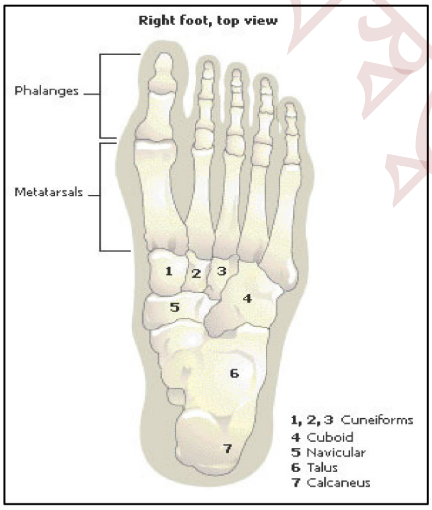
উলনাকে বাংলায় অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থি বলে! এটা আসলে আমাদের কনুই থেকে কব্জি পর্যন্ত অংশের হাড্ডি। সরল ভাষায় একে **'অভ্যন্তরীণ কনুই অস্থি'** বললেই চলবে। রেডিয়াসকে বাংলায় বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থি বলে। একে সরল ভাষায় **'বাইরের কনুই অস্থি'** বললেই হয়। নিম্নে (পরের পৃষ্ঠায়) এই দু'টো হাড্ডির চিত্র তুলে ধরেছি। পাটেলা আমাদের হাঁটুকে ও উলনা এবং রেডিয়াস কনুইকে নিরাপত্তা প্রদান করে। এছাড়া কাঁধ থেকে কনুই পর্যন্ত যে বড় হাড্ডি আছে তার ইংরেজী নাম হলো, হিউমারাস [humerus]। একে বংলায় বলে প্রগণ্ডাস্থি। আমরা বলতে পারি **'বাহুর অস্থি'**। নীচের (পরের পৃষ্ঠার) চিত্রে এটাও দেখানো হয়েছে।

কার্পাস [carpus]: হাতের কব্জিতে এই হাড্ডিগুলো আছে। হাতের কব্জির মধ্যে মোট ৮টি অস্থি বিদ্যমান। হাতের তালুতে আছে ৫টি এবং ১৪টি হাড্ডি আছে পাঁচটি আঙ্গুলের মধ্যে। এ নিয়ে হাতের মধ্যে মোট হাড্ডি সংখ্যা দাঁড়ালো ২৭টি। নীচের চিত্রে হাতের হাড্ডিসমূহ দেখানো হয়েছে।

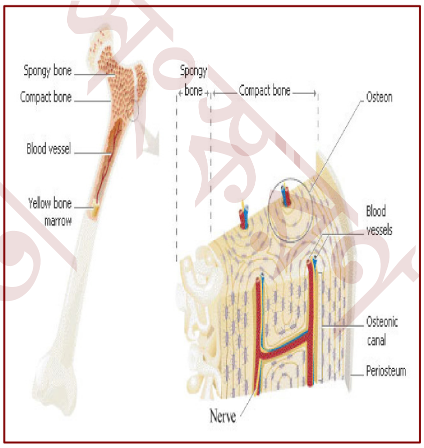




পায়ের পাতার কঙ্কালসার: পায়ের মধ্যে মোট ২৬টি হাড্ডি আছে। সর্বাপেক্ষা বড়ো দু'টি হাড্ডি পায়ের গোড়ালিতে অবস্থিত। প্রথমটিকে **'কালকেনিয়াস'** [calcaneus] বলে। আর দ্বিতীয়টির নাম **'টেইলাস'** [talus] বলে। নীচের চিত্রে যথাক্রমে সংখ্যা ৭ ও ৬ দ্বারা এ দু'টো চিহ্নিত করা হয়েছে।

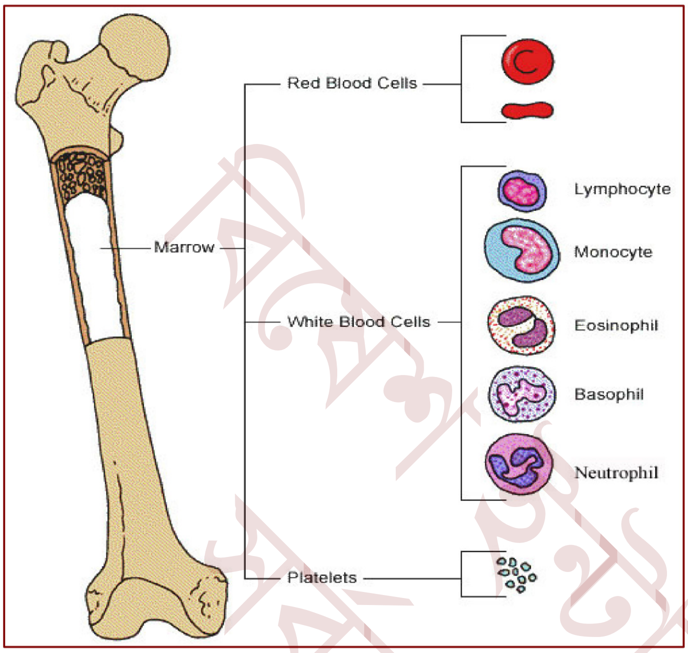


হাড্ডির মজ্জা: আমাদের হেদের হাড্ডিগুলোর মূল কাজ হলো বিভিন্ন দেহযন্ত্র ও পেশীর নিরাপত্তা দান এবং সামগ্রিকভাবে আমাদেরকে চলতে ফিরতে সাহায্য করা। কঙ্কালসার ছাড়া আমরা জেলির মতো হয়ে যেথাম! তবে হাড্ডির আরো কিছু কার্যকারিতা আছে। এর মধ্যে হাড্ডির মজ্জা এখানে সর্বাপেক্ষা বেশী উল্লেখযোগ্য। নীচের চিত্রটি দেখুন।



আমরা রক্ত সঞ্চালন তন্ত্রের উপর আলোচনাকালে বলেছি, হাড্ডির মজ্জায়ই লাল রক্তকোষসহ আরো কিছু কোষ সৃষ্টি হয়। উপরের চিত্রে একটি হাড্ডির ক্রস-সেকশন [কর্তিত অংশ] দেখাচ্ছে। মজ্জা স্পঞ্জের মতো একটি বস্তু। এতে অনেক রক্তনালী আছে। বাচ্চাদের প্রায় সকল মজ্জায়ই রক্তের বিভিন্ন কোষ সৃষ্টি হয়। তবে পরিণত বয়স্ক লোকদের হাড্ডির অভ্যন্তরস্থ লাল মজ্জায় এসব কোষ তৈরী হয় বেশী। লাল মজ্জা থাকে বুক, কোমর, মাথার খুলি, উরু ও হাতের উপরিভাগের হাড্ডির ভেতরে।

হাড্ডির মজ্জা হলো রক্ত উৎপাদনের কারখানা। সুতরাং হাড্ডির মজ্জায় যাতে প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে। সাধারণ স্বাস্থ্যবান লোকের মজ্জায় সবাই থাকে। কিন্তু সময় সময় কোনো কোনো উপাদানের ঘাটতি হেতু সমস্যাও হতে পারে। নীচের চিত্রে দেখানো হয়েছে যেসব গুরুত্বপূর্ণ রক্তকোষ হাড্ডির মজ্জায় উৎপাদন হয়।



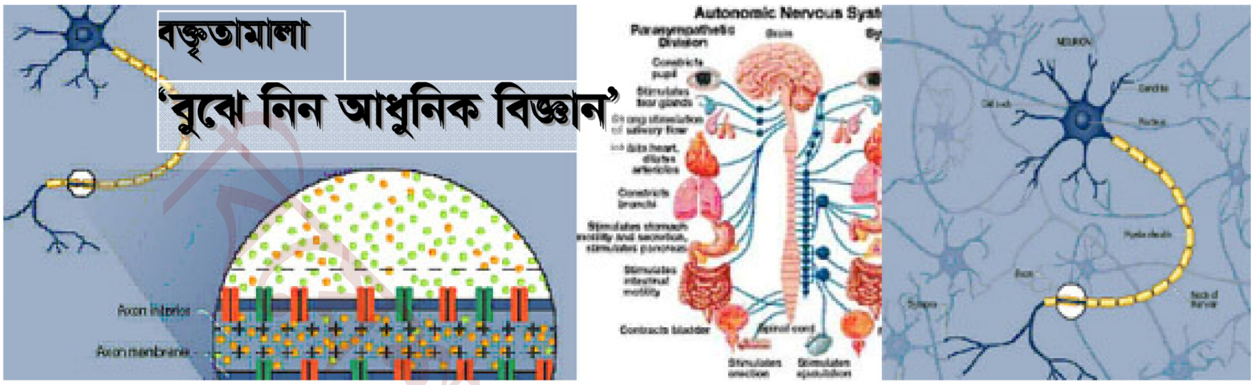
বায়ের চিত্রে দেখানো কোষগুলোর উপর আরো একটু ব্যাখ্যা তুলে ধরে আজকের লেকচারের ইতি টানবো। প্রথমেই জেনে নিই গুরুত্বপূর্ণ লাল রক্তকোষ সম্পর্কে।

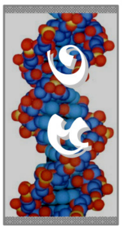
মজ্জায় তৈরী রক্তকোষসমূহ: ১. লাল রক্তকোষ: এটি সম্পর্কে ইতোমধ্যে আলোচনা করেছি। রক্তের তিন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ কোষের মধ্যে এটি অন্যতম। এ কোষই বহন করে অক্সিজেন আমাদের ফুসফুস থেকে। নিয়ে যায় দেহের প্রতিটি টিস্যু ও কোষে। এটা আবার কোষের বর্জ্য কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসও বহন করে নিয়ে আসে ফুসফুসে। আমরা তা বাইরে নিয়ে ছেড়ে দিই নিঃশ্বাসের মাধ্যমে।

২. সাদা রক্তকোষ: এই গ্রুপে আছে লিমফোসাইট [lymphocyte], মনোসাইট [monocyte], ইওসিনোফিল [eosinophil], বেসোফিল [basophil] এবং নিউট্রোফিল [neutrophil] কোষসমূহ। এগুলো মূলত দেহের রোগ-প্রতিরোধ তন্ত্রের সাথে সম্পৃক্ত। **'লিমফোসাইট'** ক্যান্সার কোষকে হামলা করে বিভিন্ন এ্যান্টিবডি তৈরী করে। এছাড়া এটাই ফরেন টিস্যু অগ্রাহ্যের জন্য দায়ী। **'মনোসাইট'** হাড্ডির মজ্জা ছাড়াও প্লীহায় তৈরী হয়। এর কাজ হলো মৃত কোষাংশ ও ফরেন বস্তু গিলে ধ্বংস করা। **'ইওসিনোফিল'** এলার্জিক প্রতিক্রিয়ার জন্য দায়ী। এছাড়া পরজীবী জীবাণু ধ্বংসে এ কোষগুলো ভূমিকা রাখে। **'বোসোফিল'**- এই সাদা রক্তকোষ রক্তের মধ্যে দোষ-ত্রুটি থাকলে সক্রিয় হয়। রক্তের মধ্যে বেশী পরিমাণ কোষ **'নিউট্রোফিল'** দেহের রোগ-প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিশেষ করে ইনফেকশন থেকে রক্ষার্থে এটা বিশেষ কার্যকরী।

৩. প্লেটলেট [platelet]: আমরা ইতোমধ্যে রক্ত সঞ্চালন সিস্টেম নিয়ে আলোচনাকালে এই কোষটির উপর বেশ কিছু বলেছি। এর মূল কাজ হলো রক্তের মধ্যে জমাট সৃষ্টি করা। চামড়া বা টিস্যু কেটে গেলে জমাট বাঁধা একান্ত জরুরী। প্লেটলেট ছাড়া তা সম্ভব নয়।

প্রিয় ছাত্র বন্ধুরা! মানবদেহের উপর আমাদের এ তথ্যানুসন্ধানের অংশ হিসাবে তিনটি তন্ত্রের উপর এ পর্যন্ত কিছু আলোচনা করলাম। আশারাখি এ থেকে সকলেই উপকৃত হবেন। মানবদেহ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানের শেষ কিন্তু এখনো হয় নি। আগামী লেকচারসমূহে আমরা অন্যান্য তন্ত্রের উপর বিস্তারিত আলোচনার আশা রাখি। এটুকু বলে আজকের লেকচার শেষ করছি। আল্লাহ হাফিজ।





বক্তাঃ ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী, নেশন্যাল ডিপ্লোমা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ইংল্যান্ড।

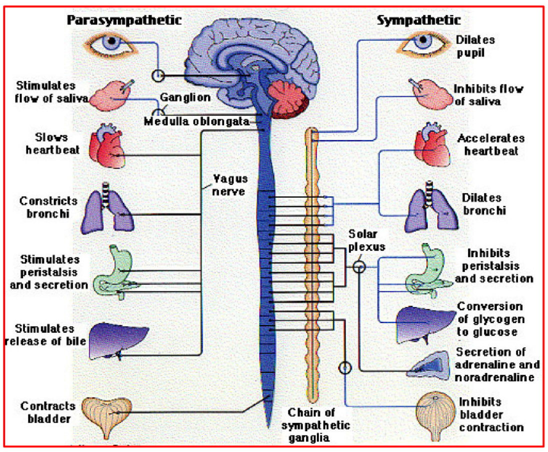
স্থানঃ খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সুবিদ বাজার, সিলেট।

ঙ. জীববিদ্যাঃ পরিচিতি ও কার্যকারিতা

বক্তৃতা ৩৫ : প্রাণীজগৎ

৫. নার্ভাস সিস্টেম [nervous system]

প্রিয় ছাত্রবন্ধুরা! বুঝে নিন আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শীর্ষক বক্তৃতামালার ৩৫তম সংযোজনে সবাইকে জানাচ্ছি উষ্ণ স্বাগত। আমরা গত দু'টি লেকচারে মানবদেহের বিভিন্ন কাঠামোর উপর আলোচনা করেছি। আজকের লেকচারেও তা অব্যাহত থাকবে। আর সম্ভবত, আরো দু'একটি বক্তৃতা যুক্ত করতে হবে বিষয়টির উপর তথ্যানুসন্ধান সমাপ্তির দিকে নিয়ে যেতে।



যাক, শিক্ষার্থী বন্ধুরা! মানব দেহখানা খুব জটিল ও কৌশলে সৃষ্ট। এতে **‘প্রাণ’** নামক চঞ্চল একটি উপাদান সংরক্ষিত থাকবে- সুতরাং দেহখানাও সেরূপ ডিজাইন হওয়া চাই, যাতে তা ঐ প্রাণ বা আত্মার জন্য বাসোপযোগী হয়। হিউম্যান বায়োলজিস্টরা পুরো মানবদেহের বিভিন্ন সিস্টেমকে

মোট ১২টি প্রধান তন্ত্রে বিভক্ত করে গবেষণা করেন। ইতোমধ্যে আমরা এদের চারটির উপর আলোচনা উপস্থাপন করেছি। আজকের লেকচারে পঞ্চম তন্ত্র যাকে বিজ্ঞানীরা **'নার্ভাস সিস্টেম'** [nervous system] বা স্নায়ুতন্ত্র বলেন- তাই হবে আলোচনার বিষয়।

৫.১. নার্ভাস সিস্টেম কি?

প্রথমেই আমরা মানবদেহ ও এর সফল কার্যকারিতার জন্য জরুরী সকল সিস্টেমের মতো নার্ভাস সিস্টেম কী তা জেনে নেবো। এরপর যেটুকু সম্ভব তথ্যভিত্তিক আলোচনা করবো বিষয়টির উপর আরো কিছুটা গভীর জ্ঞানার্জনের আশায়। মনে রাখা উচিৎ, **'বুঝে নিন আধুনিক বিজ্ঞান'** শীর্ষক এ লেকচারের মাধ্যমে বিজ্ঞানের বিশাল জগতের বিভিন্ন দিকের উপর আলোকপাতই শুধু উদ্দেশ্য। বাস্তবে এ বিরাট বিষয়ের উপর সুগভীর গবেষণা এ প্রসঙ্গে আদৌ সম্ভব নয়। যাক, এটুকু জানার পর এবার আমরা মানবদেহের গুরুত্বপূর্ণ এই পঞ্চম সিস্টেমের উপর আলোচনায় যেতে পারি।

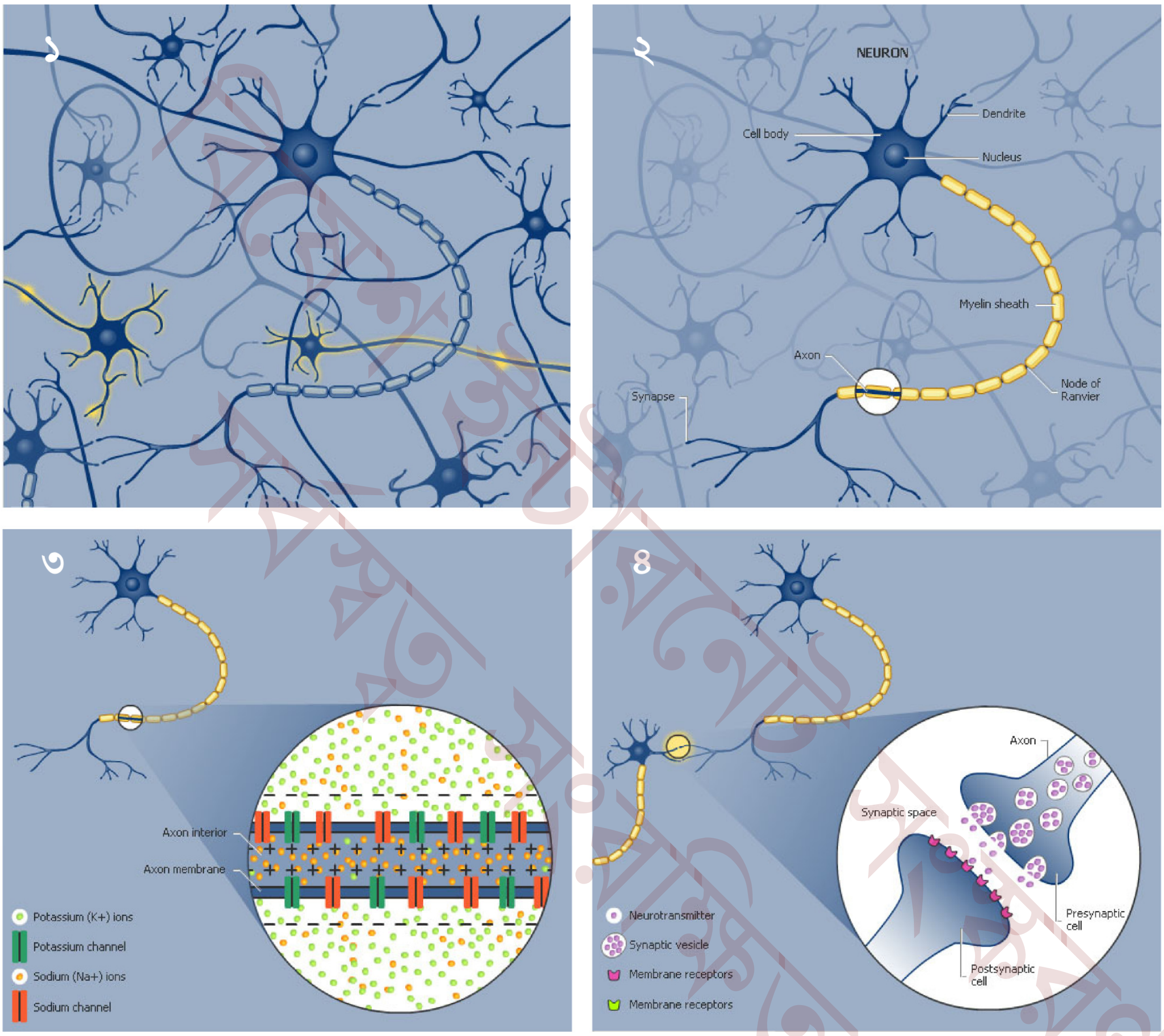
বাংলায় বলে স্নায়ুতন্ত্র। তবে ইংরেজী ও বাংলা এ উভয় শব্দ আলোচনার সময় প্রয়োগ করবো। আমাদের দেহের সকল ফাংশন সফলভাবে পরিচালনের জন্য বিভিন্ন যন্ত্রাংশের মধ্যে যোগাযোগ নিশ্চিত রাখতে হবে। আমরা যেভাবেই দেহকে বিভিন্ন অবস্থার প্রতিক্রিয়ায় কাজে লাগাই না কোনো তা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার জন্য একটি তন্ত্র সর্বদা কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের মগজ বা ব্রেন হলো এই তন্ত্রের কেন্দ্র। সব ধরনের **'স্টিমুলাই'** [stimuli] বা উদ্দীপনার নিয়ন্ত্রণ ও কর্মবিধায়ক হলো ব্রেন। এর সঙ্গে যুক্ত আছে পুরো দেহব্যাপী ব্যাপ্ত একটি স্নায়ুকোষ নেটওয়ার্ক। আর এই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে স্নায়বিক [নার্ভাস] যোগাযোগ নিশ্চিত হয়। স্টিমুলাই কিংবা **'মাসল মেকানিজম'** [muscle mechanism] বা পেশী কার্য-সাধন পদ্ধতি সফলভাবে এসব নার্ভকোষের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। পুরো স্নায়ুতন্ত্রের কেন্দ্রীয় দায়িত্ব পালন করে আমাদের ব্রেন। এজন্য একে **'সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম'** [central nervous system] হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এর অর্থ কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র।

৫.২. গঠন-কাঠামো ও কার্যকারিতা

মানবদেহে বিশেষ কিছু **'সেন্সরী'** [sensory] বা সংবেদনশীল কোষ আছে যাদের কাজ হলো দেহের বিভিন্ন অংশ বা এমনকি বাইর জগত থেকে প্রাপ্ত উদ্দীপক তথ্যাদি সংগ্রহ করা। এই কোষগুলোর নাম **'নিউরোন'** [neuron] বা স্নায়ুকোষ। এগুলো শুধুমাত্র তথ্যের প্রাপক নয় বরং তথ্য মুতাবিক অন্যত্র **'নার্ভ ইম্পাল্স'** [nerve impulse] বা স্নায়বিক প্রণোদন প্রেরণ করতে পারে। অর্থাৎ অবস্থা ভেদে ব্যবস্থা নিশ্চিত রাখতে এই কোষগুলো সর্বদা কাজ করে যাচ্ছে। স্নায়ুকোষ থেকে প্রাপ্ত ইম্পাল্স দেহের সাধারণ কোষে পৌঁছে প্রতিক্রিয়া করে। আর এভাবেই পুরো নার্ভাস সিস্টেম দেহব্যাপী যোগাযোগ রক্ষা করে সকল পেশী ও অন্যান্য তন্ত্রকে পরিচালনা করে যাচ্ছে। ঠিক কিভাবে এ কাজগুলো সম্পাদিত হয় তাই হবে এখনকার আলোচনা।

নার্ভ সেল [nerve cell]: প্রতিটি নার্ভ সেল বা কোষে আছে একটি কেন্দ্রীয় অংশ যেখানে অবস্থান করে সেলের **'নিউক্লিয়াস'** [nucleus] বা **'সেল বডি'** [cell body]। সেলে আরো এক দু'টো কাঠামো আছে যাকে **'এক্সন'** [axon] ও **'ডেনড্রাইট'** [dendrite] বলা হয়। সেল বডি থেকে ডেনড্রাইট কিছুটা দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। এদের কাজ, উদ্দীপনা গ্রহণ করা। অপরদিকে স্নায়ুকোষে এক্সন সাধারণত একটিই থাকে। এটা দীর্ঘ হতে পারে। এক্সনের কাজ হলো সেল বডি এলাকা থেকে নার্ভ ইম্পাল্স বা স্নায়বিক প্রণোদন কোষ থেকে কোষে ট্রান্সফার বা স্থানান্তর

করা। নার্ভ সেলের কাঠামো চিত্রে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। দেখুন নীচের চারটি ছবি। সেসাথে আলাদা আলাদা ব্যাখ্যাও পাঠ করুন।



নার্ভ সেল চিত্র-১: মানব নার্ভাস সিস্টেমের মূল হলো **‘নিউরন’** [বা নার্ভ সেল]। আমাদের দেহের সর্বত্র বিলিয়ন বিলিয়ন নার্ভ সেল আছে। এক অপূর্ব নেটওয়ার্কে সাজানো নিউরনগুলো মূলত যোগাযোগ ব্যবস্থা চালিয়ে যাচ্ছে আন্তঃদেহব্যাপী। এই যোগাযোগ নেটওয়ার্কের কেন্দ্র হলো **‘সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম’** [central nervous system]। আমাদের মস্তিষ্ক ও মেরুরুজ্জ মিলে এই নার্ভাস সিস্টেম গঠিত। যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্যারিয়ার বা বহনকারী হলো **‘ইলেকট্রিকেল ইম্পাল্স’** [electrical impulse] বা বৈদ্যুতিক প্রণোদন। দেহের ভেতর ও বাইরে কোনো ধরনের রদবদল হলেই নিউরন তা বুঝতে পারে। আমাদের চিন্তাশক্তি ও অনুভূতিকে নিউরন নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়া দেহের পেশী ও গ্রন্থিগুলোর নিয়ন্ত্রকও এই নিউরন।

নার্ভ সেল চিত্র-২: এখানে আমরা নার্ভ কোষের বিভিন্ন অংশ দেখতে পাচ্ছি। আমরা ইতোমধ্যে **'নিউক্লিয়াস'** [nucleus], **'সেল বডি'** [cell body], **'এক্সন'** [axon] ও **'ডেনড্রাইট'** [dendrite] কি, তা উল্লেখ করেছি। এ চিত্রে আরো কয়েকটি জিনিস দেখানো হয়েছে। যেমন: **'মাইয়েলিন শীত'** [myelin sheath], **'নোড অব রানভিয়ে'** [node of Ranvier] ও **'সিনাপ্স'** [synapse]। মাইয়েলিন শীত হলো স্নায়ু অন্তরণী পট্টি, নোড অব রানভিয়ে মানে স্নায়ু অন্তরণী পট্টির মধ্যস্থ ফাঁক এবং নার্ভের শেষের ফাঁককে বলে সিনাপ্স।

ইলেকট্রিকেল ইম্পাল্স [বৈদ্যুতিক সিগনাল] আসে ডেনড্রাইটে। এই সিগনালকেই বলে স্টিমুলাই [stimuli] বা উদ্দীপক। এরপর ইম্পাল্স সেল বডি থেকে এক্সন হয়ে চলতে থাকে অপর স্নায়ুকোষে স্টিমুলাই সৃষ্টির জন্য। যেমন: দেহের অপর কেনো নিউরন, গ্রন্থি কোষ কিংবা পেশীকে সক্রিয় করতে পারে এই স্টিমুলাই। এক্সনের চতুর্দিকে মাইয়েলিন নামক স্নায়ু অন্তরণী পট্টি আছে। এতে অনেক ফাঁক বিদ্যমান এবং এসব ফাঁকের নামই হলো নোড অব রানভিয়ে। আর এক্সনের একেবারে শেষে জাংশন আছে যার নাম সিনাপ্স। এক স্নায়ুকোষ থেকে অপরটিতে তথ্য প্রতিস্থাপন হয় এই সিনাপ্সের মাধ্যমে।

নার্ভ সেল চিত্র-৩: আমরা জানি আয়োন বলতে কি বুঝায়। এটা হলো চার্জ-হওয়া অণু বা এটম। এই চিত্রে আমরা এক্সনের অভ্যন্তর দেখতে পাচ্ছি। নিউরন যখন স্থির অবস্থায় থাকে, এক্সন রসায়নিক ব্যালান্স বজায় রাখে। এটা করতে যেয়ে কোষের অভ্যন্তরে অতিরিক্ত ধনাত্মক **'পোটাসিয়াম আয়োন'** [potassium (K+) ions] থাকা চাই। অপরদিকে কোষের বাইরে থাকতে হবে অতিরিক্ত ধনাত্মক **'সোডিয়াম আয়োন'** [sodium (Na+) ions]। যে মুহূর্তে কোন সিগনাল আসে, **'নোড অব রানভিয়ে'**তে মাইয়েলিন শীত জাগ্রত হয়ে ওঠে। এতে আয়োনগুলো লিক হতে বাধা থাকে না। পটাসিয়াম ও সোডিয়াম আয়োন স্থান পরিবর্তন করে। ফলে সৃষ্টি হয় বৈদ্যুতিক সিগনাল যা চলতে থাকে এক্সনের উপর দিয়ে।

নার্ভ সেল চিত্র-৪: আমরা ইতোমধ্যে বলেছি দু'টি নিউরের মধ্যস্থ ফাঁককে বলে **'সিনাপ্স'** [synapse]। সিগনাল একটি নিউরন থেকে অপরটিতে ট্রান্সফার হয় এই সিনাপ্সের মাধ্যমে। চিত্রে আমরা সিনাপ্স অংশটি বড়ো করে দেখিয়েছি। দেখাই যাচ্ছে, এই অংশে আছে এক্সন, নিউরোট্রান্সমিটার [neurotransmitter], সিনাপ্টিক ভেসিকল [synaptic vesicle], মেমব্রেন রিসেপ্টার [membrane receptor] ইত্যাদি। টেকনিকেল এসব ইংরেজী শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ নেই। তবে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি। নিউরোট্রান্সমিটার এর অর্থ হবে স্নায়ু-প্রেরক। ভেসিকল শব্দের অর্থ ক্ষুদ্র গর্ত বা থলে কোষ। সুতরাং সিনাপ্টিক ভেসিকল এর অর্থ দাঁড়ায় **'সিগনাল ফাঁকের কোষ থলে'**। ছবিতে এটি বৃত্তের মতো দেখানো হয়েছে যেখানে আছে একাধিক কোষ। মেমব্রেন শব্দের অর্থ ঝিল্লি। আর রিসেপ্টার মানে গ্রাহক। সুতরাং মেমব্রেন রিসেপ্টার এর অর্থ হবে ঝিল্লি গ্রাহক। যাক, ঠিক কিভাবে এক্সন থেকে এক্সনে সিগনাল প্রতিস্থাপন হয় সেটা জানাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য।

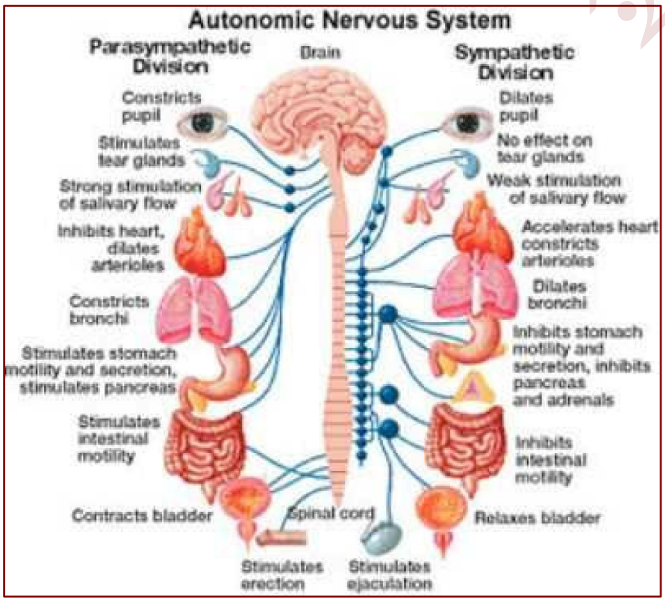
নিউরন সাইনাপ্সের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করে। স্নায়ুকোষের কেন্দ্র থেকে সিগনাল বা ইম্পাল্স প্রথমে সাইনাপ্সে পৌঁছে। এবার অপর স্নায়ুকোষের এক্সনে তা ট্রান্সফার হতে হবে। সাধারণত নিউরোট্রান্সমিটার নামক রসায়নিক বস্তুর মাধ্যমে এ কাজটি সম্পন্ন হয়। যেদিক থেকে ইম্পাল্স ট্রান্সফার হবে তাকে বলে **'প্রিসাইনাপ্টিক**

সাইড' [pre-synaptic side]। এখানে অনেক কোষ আছে। আর যেখানে ইম্পাল্‌স ট্রান্সফার হবে তাকে বলে **'পোস্টসাইনাপ্টিক সাইড'** [post-synaptic side]। সেখানেও অনেক কোষ আছে। ইম্পাল্‌স সিনাপ্সে পৌঁছার পর রসায়নিক ট্রান্সমিটার কোষগুলো তা গ্রহণ করে ফেরি করে নিয়ে প্রিসিনাপ্টিক সাইড থেকে পোস্টসিনাপ্টিক সাইডে। এভাবে সিগনালটি পরবর্তী নিউরন বা স্নায়ুকোষে স্থানান্তরিত হয়। এবার প্রথম নিউরনটি স্থির অবস্থায় ফিরে যায়। অপরদিকে ইম্পাল্‌স চলতে থাকে একটার পর আরেকটি নিউরন পেরিয়ে।

প্রিয় ছাত্রবন্ধুরা! আমরা উপরের চারটি চিত্র দ্বারা বুঝতে সক্ষম হলাম কিভাবে নিউরন বা স্নায়ুকোষ থেকে স্নায়ুকোষে স্নায়বিক সিগনাল বা ইম্পাল্‌স ভ্রমণ করে। এটা জানা আমাদের জন্য জরুরীও ছিলো। আপনার হাতের অঙ্গুলিতে যেভাবেই হোক ব্যথা পেলেন- তা কিভাবে সাথে সাথে আপনি বুঝতে পারেন, সে প্রশ্নের জবাব এসেছে উপরোক্ত ব্যাখ্যা থেকে। স্নায়ুকোষের মাধ্যমেই **'ব্যথার'** অনুভূতি আপনার ব্রেনে যেয়ে পৌঁছে। এরপর ব্রেন প্রয়োজনে জবাব দেয়। আপনার ব্যথার কারণ যদি আগুনের মধ্যে অঙ্গুলি স্পর্শ করা হয়, তাহলে সাথে সাথে ব্রেন থেকে সিগনাল আসবে হাত সরে নিতে। হ্যাঁ, হাত তো আপনি সরিয়ে নেবেনই- কিন্তু সরানোর একশন পেশির মাধ্যমে আঞ্জাম দিতে হবে। এই কাজটি সারার সিগনাল আসতে হবে ব্রেন থেকে।

বন্ধুরা! প্রথমেই বলেছি মানব নার্ভাস সিস্টেম একটি বিরাট বিষয়। এর উপর ভাসাভাসা কিছু জ্ঞানদান ছাড়া অত্র লেকচারে বেশী কিছু বলা সম্ভব নয়। আর স্বীকার করতেই হচ্ছে, আমি নিজেও এ বিষয়ে কোনো এক্সপার্ট নই! বিজ্ঞানের গবেষক হিসাবে মানবদেহের উপর যেটুকু জানতে পেরেছি বা জানার চেষ্টা করেছি তা-ই আপনাদেরকে বুঝিয়ে বলেছি। তবে এখনই অত্র লেকচার শেষ করছি না! আমাদের দেহের মধ্যে স্নায়বিক সিগনাল বা ইম্পাল্‌স ঠিক কিভাবে ভ্রমণ করে তা আমরা জেনেছি। তবে অপর আরেক বিষয় আমাদেরকে জানতে হবে। সেটা হলো এই প্রশ্নের উত্তর: আমাদের অজান্তে কিভাবে দেহের ভেতর অসংখ্য কাজ সম্পাদিত হয়? আসুন, খুব সংক্ষেপে এ ব্যাপারে আলোচনা করি।

অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেম [autonomic nervous system]



ব্যক্তির চেতনার নিয়ন্ত্রণহীন অনেক একশন দেহের ভেতর সংঘটিত হচ্ছে। এসব একশ যে সিস্টেমের মাধ্যমে সম্পাদিত হয় তাকেই বলে অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেম। আপনি কি কখনো ভেবেছেন, কিভাবে ঘুমন্তাবস্থায়ও আপনি শ্বাস-নিঃশ্বাস নেন? আরোও ভেবেছেন কি, কিভাবে খাদ্য-গ্রহণের পর হজম হওয়ার কাজটি শুরু হয়? আপনার লিভার, কিডনি ইত্যাদি কিভাবে ফাংশন করে? এসব প্রশ্নের জবাব খুঁজে বের করেছেন বিজ্ঞানীরা। পাশের চিত্রে অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেমের ক্রিয়া-কলাপ ফুটে ওঠেছে।

লক্ষ্য করুন, পুরো সিস্টেমের দু'টি মূল শাখা আছে। প্রতিক্রিয়াশীল কাজ সারতে যে শাখাটি সক্রিয়, তাকে বলে **'সিম্পাথেটিক ডিভিশন'**

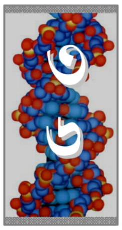
[sympathetic division]। অপরদিকে সর্বদা সক্রিয় শাখাকে বলে **'প্যারাসিম্পাথেটিক ডিভিশন'** [parasympathetic division]। ছবিতে দেহের বিভিন্ন যন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ ও কার্যকারিতা সম্পর্কে তথ্য দেওয়া আছে। আমরা সংক্ষেপে এগুলোর বর্ণনা দিচ্ছি।

সিম্পাথেটিক ব্রাঞ্চঃ একে বাংলায় **'সংবেদনশীল শাখা'** বলা যায়। এই শাখার কাজের মধ্যে আছেঃ ১. চোখের মণি অশ্রুতে ভিজিয়ে দেওয়া [দুঃখ, বেদনা, ব্যাথা বা অতি-আনন্দের সময়]। ২. জিহ্বার মধ্যে লালা প্রবাহ বন্ধ করা [পিপাসা হেতু জিহ্বা শুকিয়ে যাওয়া]। ৩. ফুসফুসের মধ্যে বাতাস নেওয়া সহজ করা। ৪. হৃদযন্ত্রের স্পন্দন বৃদ্ধিকরণ [ভয়, ক্লান্তি, ব্যায়াম ইত্যাদির প্রতিক্রিয়ায়]। ৫. [শেষ হয়ে গেলে] পরিপাকতন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধকরণ। ৬. লিভার থেকে গ্লুকোজ ছেড়ে দেওয়া সক্রিয় করা। ৭. রক্তচাপ বৃদ্ধিকরণ ও কমানোর হরমোন কিডনিতে তৈরীকরণ। ৮. মূত্রথলে শিথিলকরণ। ৯. মলনালী সংকোচন।

প্যারাসিম্পাথেটিক ব্রাঞ্চঃ একে বাংলায় **'অসংবেদনশীল শাখা'** বলা যায়। এই শাখার কাজ হলো উপরোক্ত সিম্পাথেটিক শাখার ক্রিয়ার বিপরীত ক্রিয়া সম্পাদন করা। যেমনঃ ১. চোখের মণি শুকানো। ২. জিহ্বায় লালা সৃষ্টি। ৩. হৃদযন্ত্রের কম্পন মাত্রা কমানো। ৪. ফুসফুসের মধ্যে বাতাস ঢুকানো কঠিন করা। ৫. পরিপাকতন্ত্রের ক্রিয়া শুরু করা। ৬. পিত্তাশয় সক্রিয়করণ। ৭. মূত্রথলে সংকোচন। ৮. মলনালী শিথিলকরণ।

মোটকথা, অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেমের মাধ্যমে আমাদের দেহের শ্বাসক্রিয়া, রক্তসঞ্চলন, হজমক্রিয়া এবং মূত্রতন্ত্র নিয়ন্ত্রিত হয়। বলা যায় দেহ পরিচালনের এই চারটি তন্ত্রের সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করে অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেম। যাক, নিউরোলজির উপর আর বেশি কিছু না বলে প্রিয় শ্রোতা বন্ধুদেরকে মানসিক কষ্ট থেকে রেহাই দিতে চাই! যারা এই শাখার উপর দীর্ঘদিন অধ্যয়ন করেন তাদেরকে বলে **'নিউরোলজিস্ট'**। নিশ্চয় এসব বিশেষজ্ঞ ডাক্তার সাহেবদের কথা আপনারা শুনেছেন। বিষয়টি খুব জটিল, আমি নিজেও এ ব্যাপারে বেশী গভীরে যাওয়ার ক্ষমতা রাখি না। সুতরাং এ্যানাটমির পঞ্চম সিস্টেম স্নায়ুতন্ত্রের উপর সংক্ষিপ্ত এই আলোচনার এখানেই শেষ। আগামী লেকচারে আমরা ষষ্ঠ ও সপ্তম সিস্টেম তথা সামন ও পেছন পেশীর উপর বক্তৃতা প্রদানের আশা রাখছি। সবাইকে এতে আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো শেষ করছি। আল্লাহ হাফিজ।





বক্তা: ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী, নেশন্যাল ডিপ্লোমা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ইংল্যান্ড।

স্থান: খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সুবিদ বাজার, সিলেট।

ঙ. জীববিদ্যা: পরিচিতি ও কার্যকারিতা

বক্তৃতা ৩৬ : প্রাণীজগৎ

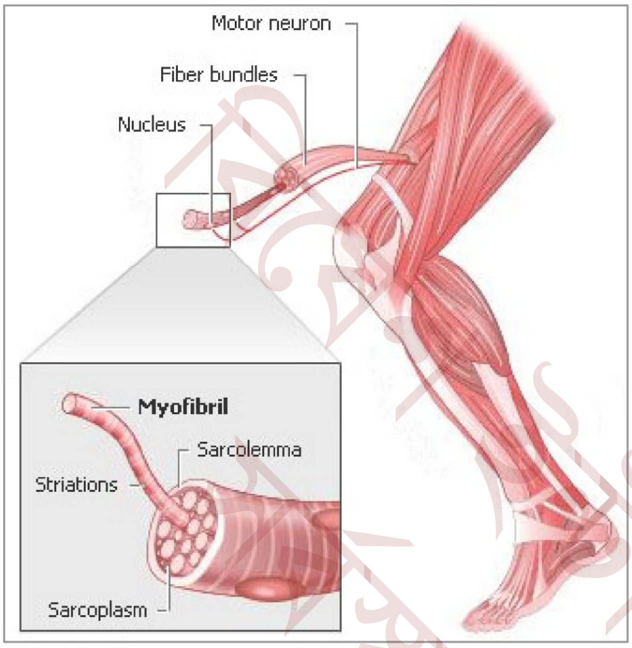
মানবদেহ

'বুঝে নিন আধুনিক বিজ্ঞান' শীর্ষক বক্তৃতামালার ৩৬তম সংযোজনে সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক মুবারকবাদ। প্রিয় ছাত্রবন্ধুরা! মানবদেহের সৃষ্টিকৌশলের উপর আমরা ইতোমধ্যে বেশ কিছু তথ্যসম্বলিত আলোচনা করেছি। তবে জানার আরো অনেক কিছু বাকী। বাস্তবে মেডিকেল বিজ্ঞান এখনো আমাদের দেহ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তথ্যাদি উদঘাটন করে নি। একই কথা সত্য পুরো বিজ্ঞানজগতের বেলাও। যাক, আজ আমরা মানবদেহের আরো দু'টি তন্ত্রের উপর আলোচনা করার প্রয়াস পাচ্ছি। এগুলো হলো সামন ও পেছন পেশী। আসলে উভয়টি একই সিস্টেম। তবে বিজ্ঞানীরা দু'টি ভাগে বিভক্ত করে গবেষণা করেন সুবিধার্থে।

৬ ও ৭. সামন ও পেছন পেশীতন্ত্র

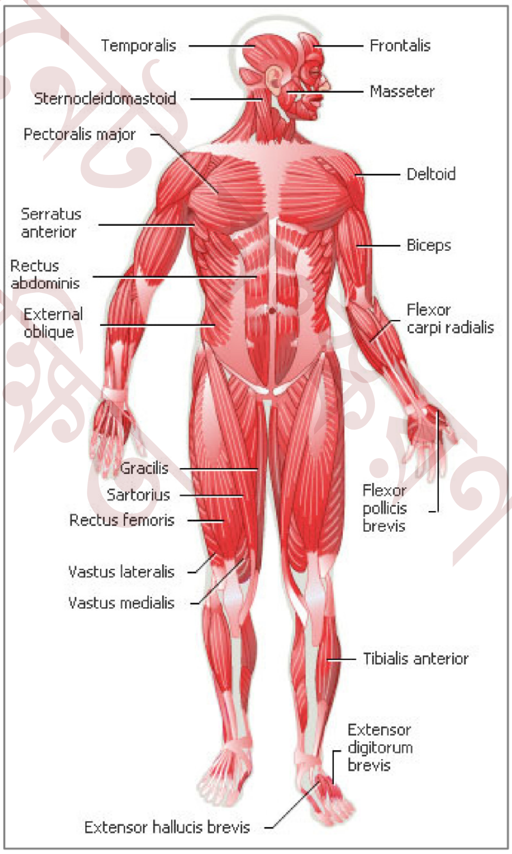
নার্ভাস সিস্টেম বা স্নায়ুতন্ত্র থেকে উদ্ভুত **'স্টিমুলাস'** [stimulus] বা ক্রিয়ার উদ্দীপনা দ্বারাই দেহের যাবতীয় পেশী, টিস্যু কিংবা দেহযন্ত্র সক্রিয় হয়ে ওঠে। আমরা ইতোমধ্যে নার্ভাস সিস্টেম নিয়ে আলোচনা করেছি। পেশী মূলত চামড়ার নীচে কঙ্কালসারের সাথে সংযুক্ত মাংসাশী বস্তু। এগুলো আসলে **'মাইওফাইব্রিল'** [myofibril] নামক

এক ধরনের সূক্ষ্ম সূতার মতো জিনিষ। এটা গঠিত হয়েছে বিভিন্ন ধরনের জটিল প্রোটিন [protein] থেকে। দেখুন নীচের চিত্রটি।



মানবদেহের মোট ওজনের ৩৫% পেশীর মধ্যে নিহিত। এ সবই সৃষ্ট মাইওফাইব্রিল সুতা থেকে। পেশী যখন প্রয়োজনের তাগিদে সংকোচন হয় তখন এই মাইওফাইব্রিল সক্রিয় থাকে। মনে করুন আপনি হাত মুষ্টিবদ্ধ করবেন। প্রথমে এটা করার ইচ্ছা থেকে স্নায়বিক সিগনাল আসবে হাতের ঐসব পেশীতে যাদের মাধ্যমে এ ক্রিয়াটি সম্পাদন হয়। সিগনাল পাওয়ার সাথে সাথে মাইওফাইব্রিল সক্রিয় হয়ে ওঠবে। সংকোচন করবে পুরো পেশী সিস্টেমকে। আপনার হাত তখন মুষ্টিবদ্ধ হবে।

সামন পেশী: মানবদেহের সামনের পেশীতন্ত্র সবগুলোর মতোই বেশ জটিল একটি নেটওয়ার্ক। এই পেশীজাল দ্বারা আবৃত পুরো মানব-কঙ্কালসার। দেখুন নীচের চিত্রটি।



ডানের চিত্রে বিভিন্ন অংশের **'ডাক্তারি'** নাম ইংরেজীতে লিখিত আছে। এসব শব্দের বঙ্গানুবাদ করতে যাচ্ছি না- কারণ, আমাদের তথ্যানুসন্ধান তেমন গভীর নয়! আমরা তো আর ডাক্তার হবো না! তবে এটুকু জানা দরকার, চিহ্নিত ও নামকরণকৃত জায়গাসমূহে বিশেষ কিছু পেশী অংশ আছে, যাদের কাজ হলো বিশেষ কিছু ক্রিয়া করা। আসলে, এসব অংশের পেশী দ্বারাই আমরা নড়াচড়া, হাটা-চলা ও প্রতিপক্ষের সঙ্গে মুষ্টিযুদ্ধ কিংবা কুস্তি-লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে সক্ষম হই। বিজ্ঞানের ভাষায় এসব ক্রিয়াকে বলে **'ভলোন্টারী মুভমেন্ট'** [voluntary movement] যার বাংলা হলো **'ঐচ্ছিক বিচলন'**। আপনার ইচ্ছা হলো দেহের পেশীশক্তি কাজে লাগাবেন। যেমন: হরতালের আগের দিন ককটেল ফাটাবেন কিংবা কারো গাড়ি পুড়াবেন! মগজে পেশীশক্তি এভাবে কাজে লাগানোর ইচ্ছা তখনই কার্যকরী হবে যখন আপনার শরীরের প্রয়োজনীয় অংশে পেশীগত সংকোচন শুরু হবে। আপনার হাত ককটেল ছুঁড়ে মারবে পেশীর সংকোচন ও শিথিলতার মাধ্যমে। সুতরাং যে কোনো পেশীশক্তি প্রয়োগ নির্ভর করে **'মানব মন'** [human mind] এর উপর। আর ইচ্ছাশক্তি মনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ইচ্ছার উদ্রেক হলেই দেহের স্নায়ুতন্ত্র থেকে নির্দিষ্ট পেশীকে সক্রিয় করতে সিগনাল আসে। আর তা থেকেই শেষ ক্রিয়া সম্পাদন হয়। এভাবে আমরা দেহকে কাজে লাগাই।

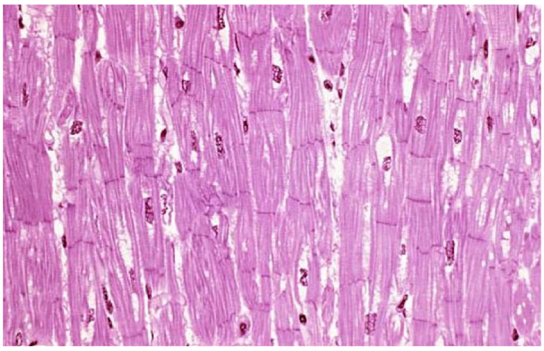
৬ ও ৭. ক. বিভিন্ন ধরনের পেশী

তিন ধরনের পেশী আছে মানবদেহে। **১. কঙ্কালসার পেশী, ২. হৃদযন্ত্রের পেশী ও ৩. মসৃণ পেশী**। পেশী মানুষকে শক্তি দান, ব্যালান্স, চলাচল ক্ষমতা, দাঁড়ানো ও দেহব্যাপী তাপ নিশ্চিত রাখে। আমরা এবার উক্ত তিন ধরনের পেশীর উপর আরো কিছু জানার চেষ্টা চালাবো।

১. কঙ্কালসার পেশী [skeletal muscle]: মেরুদণ্ডী প্রাণীদেহের মূল পেশী এটি। এসব পেশী দেহের হাড্ডির সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। এতে আছে স্নায়ুকোষ যা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে। আংশিকভাবে হলেও কঙ্কালসার পেশী মানুষের চেতনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এ কারণেই এর অপর নাম **'ঐচ্ছিক পেশী'** [voluntary muscle]। যেসব টিস্যুর মাধ্যমে হাড্ডির মধ্যে এই পেশী সংযুক্ত থাকে তাদের নাম হলো **'টেন্ডন'** [tendon]। এগুলো বড় আয়তনের রশির মতো। স্কেলেটেল পেশী সংকোচনের মাধ্যমেই পুরো কঙ্কালে নড়াচড়া নিশ্চিত হয়। সুতরাং আমাদের হাটা, চলা, পা-হাত বাঁকা করা ইত্যাদি কাজ ওসব পেশী সংকোচনের দ্বারা সম্ভব হচ্ছে।



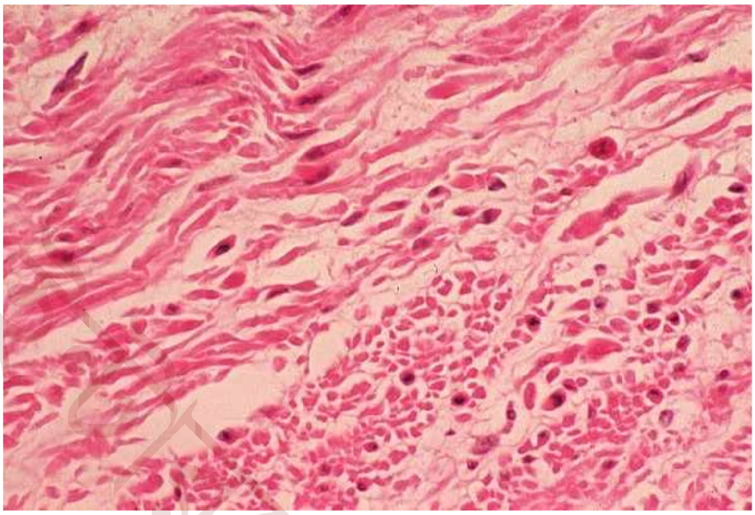
২. হৃদযন্ত্রের পেশী [heart muscle]: এর অপর নাম **কার্ডিয়াক মাসল** [cardiac muscle]। বুঝতেই পারছেন এটা কোন্ গুরুত্বপূর্ণ পেশী। মানবদেহে রক্ত চলাচল যে পাম্প নিশ্চিত রাখে তা-ই আমাদের হৃদযন্ত্র বা হার্ট। যে শক্তিশালী পেশীর দ্বারা হৃদযন্ত্র ঘটিত তা-ই হলো কার্ডিয়াক পেশী। দেখুন নীচের চিত্রটি।



কার্ডিয়াক মাসলের সকল কোষ বিশেষভাবে একটা আরেকটার সঙ্গে সংযুক্ত আছে। আমাদের জন্মের বেশ পূর্ব থেকে [অর্থাৎ মায়ের গর্ভে অবস্থানকাল থেকে] মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত হৃদযন্ত্রের পেশী অনবরত সংকোচন ও শিথিল হতে থাকে। এরূপ পারিশ্রমিক কাজের জন্য পেশীর প্রতিটি কোষে যথেষ্ট পরিমাণ অক্সিজেন সাপ্লাই চাই। এটা নিশ্চিত হয় ফুসফুস থেকে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত কোষে কোষে প্রবহমান থাকার মাধ্যমে। সুতরাং এই রক্ত-প্রবাহে বাধার সৃষ্টি হলে বিরাট সমস্যা হবেই। আর সমস্যা যখন বেশী হয়ে পড়ে তখনই হৃদযন্ত্রের ক্রিয়ায় গণ্ডগোল বেধে যায়- অর্থাৎ হার্ট এটাক করে।

আমাদের হৃদযন্ত্রের পেশী **'ঐচ্ছিক নিয়ন্ত্রণে'** নয়। ইতোমধ্যে বর্ণিত **'অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেম'** [autonomic nervous system] দ্বারা এর গতি বা হার্ট-রেট নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু সত্যিকার অর্থে এই সিস্টেম এর চালক নয়। হৃদযন্ত্রের স্পন্দন বা পেশীর সুনির্দিষ্ট ছন্দযুক্ত সংকোচন ও শিথিল হওয়ার সঠিক কারণ ও কৌশল সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান এখনো সীমিত।

৩. মসৃণ পেশী [smooth muscle]: আমাদের দেহের চামড়া, অভ্যন্তরীণ দেহযন্ত্র, পুনর্জনন তন্ত্র, বড় রগ ও শিরা এবং বর্জ্য নির্গতকরণ তন্ত্রে এসব পেশী পাওয়া যায়। মসৃণ পেশী অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এসব পেশী সংকোচন **ঐচ্ছিক নয়- অনৈচ্ছিক**। প্রয়োজনে এগুলো সংকোচন ও শিথিল হয়। যেমন, আমাদের পরিপাকতন্ত্রের কাজ হলো খাদ্যকে বড় ও ছোট আঁতের ভেতর দিয়ে পরিচালনা করা। এটা করতে যেয়ে আঁতের মসৃণ পেশী ছন্দে ছন্দে সংকোচ ও শিথিল হয়। একইভাবে মূত্রাশয়, গর্ভাশয়, ভাওয়েল, রক্তশিরা এবং অন্যান্য দেহাভ্যন্তরের যন্ত্রাদিতে প্রয়োজনীয় সংকোচন ও শিথিলতা নিশ্চিত করে এই পেশী।

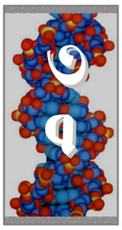


এ লেকচারের ইতি এক্ষুণি হবে। তবে উপসংহারে কয়েকটি বাক্য উচ্চারণ করতে চাচ্ছি যা সকলের জন্য উপকারী হবে বলে আমার বিশ্বাস। বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন, দেহের পেশী তার নিজের কোষে থাকা কেলসিয়াম ছেড়ে সংকোচন ক্রিয়া শুরু করে। ধারণা করা হয়, কেলসিয়াম রিলিজ হওয়ার মূল কারণ হলো কোষের বাইরের দিকে বৈদ্যুতিক পরিবর্তন। সুতরাং পেশীকে সময় সময় ব্যায়ামের মাধ্যমে সক্রিয় করতে হবে। ব্যায়ামের দ্বারা সক্রিয় পেশী হয়ে ওঠে শক্তিশালী ও কার্যকর। এরূপ পেশীকে বলে **'ইন টোন'** [in tone] বা স্বাভাবিক। অধিক হারে পেশীকে কাজে লাগালে পেশী **'হাইপারট্রোফি'** [hypertrophy] অবস্থায় উপনীত হতে পারে। এর অর্থ পেশীর আয়তন বৃদ্ধি। এ কারণেই নিয়মিত ব্যায়াম দ্বারা পেশী শক্তি বৃদ্ধি পায়, শরীর হয়ে ওঠে **'মাসকুলার'** [muscular]। পেশীর প্রতিটি কোষ বড়ো হয়ে ওঠে। অপরদিকে পেশীকে বেশী অলস বা অকেজো করে রাখলে বিপরীত অবস্থার সৃষ্টি হয়। পেশী **'এট্রফি'** [atrophy] অবস্থায় পৌঁছে যেতে পারে। এই অবস্থা হলো অত্যন্ত দুর্বলতা। কারণ এরূপ ক্ষেত্রে পেশীর আয়তন কমে যায়, দেহ শুকিয়ে পড়ে। কোনো কোনো রোগের কারণ এটি। যেমন, **প্যারালাইসিস** [paralysis] বা পক্ষাঘাত রোগ। এ ক্ষেত্রে পেশীর আয়তন এতোই কম হয়ে পড়ে যে, এটা আর কার্যকরী থাকে না।

প্রিয় ছাত্র-বন্ধুরা! আমি আশা করবো আপনারা সর্বদা ব্যায়াম করবেন। ব্যায়ামের মাধ্যমে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া উন্নততর হয়। প্রতিটি দেহকোষে অক্সিজেন সাপ্লাই নিশ্চিত থাকে এবং পেশী বেড়ে শক্তিশালী হয়। আগামী লেকচারে আবারো দেখা হবে- এই আশা ব্যক্ত করে আজকের মতো শেষ করছি। আল্লাহ হাফিজ।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম





বক্তা: ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী, নেশন্যাল ডিপ্লোমা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ইংল্যান্ড।

স্থান: খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সুবিদ বাজার, সিলেট।

৬. জীববিদ্যা: পরিচিতি ও কার্যকারিতা

বক্তৃতা ৩৭ : প্রাণীজগৎ

৩.৮. রেসপিরেটরি সিস্টেম [respiratory system]

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা! মানবদেহের উপর আমাদের তথ্যানুসন্ধানের অংশ হিসাবে এ পর্যন্ত মোট ৭টি তন্ত্র নিয়ে আলোচনা করেছি। আজকের লেকচারে অষ্টম সিস্টেম নিয়ে সংক্ষিপ্ত কথাবার্তার আশা রাখি। এই সিস্টেমের নাম 'রেসপিরেটরি সিস্টেম [respiratory system]'। বাংলায় বলা যায়, **'শ্বাসক্রিয়া তন্ত্র'**।

পুরো দেহযন্ত্র সক্রিয় ও বেঁচে থাকার মৌলিক একটি উপাদান হলো অক্সিজেন। এটি সর্বত্র প্রতিনিয়ত সাপ্লাই দিতে একদল অরগ্যান সর্বদা কাজ করে যাচ্ছে। সুতরাং বলা যায়, রেসপিরেটরি সিস্টেম [respiratory system] মানে এসব দেহযন্ত্রের কর্ম-ক্রিয়াকে বুঝায়। আমরা একে একে এসব যন্ত্রের উপর আলোচনা করবো। এর পূর্বে আরো এক দু'টো কথা বলে রাখছি।

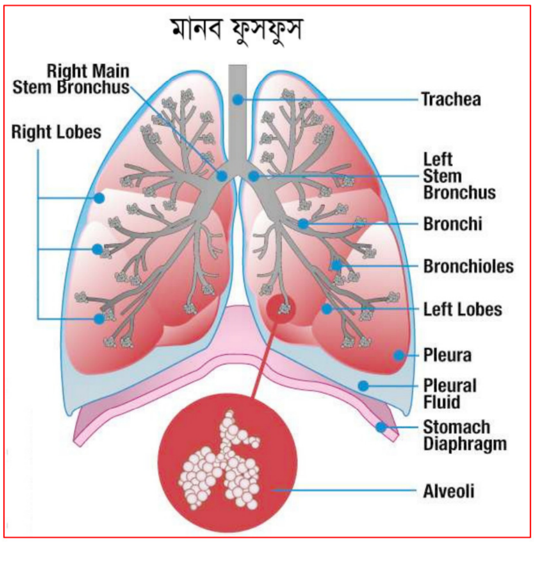
আমাদের দেহ মূলত হাজার হাজার কোটি কোষের সমন্বয়ে সৃষ্ট। সব কোষই অক্সিজেনের উপর নির্ভরশীল। শ্বাসক্রিয়া তন্ত্রের কাজ হলো এসব কোষে অক্সিজেন সাপ্লাই নিশ্চিত করা। সেসাথে কোষের বর্জ্য হিসাবে চিহ্নিত **'কার্বন ডাইওক্সাইড'** [carbon dioxide] গ্যাস সংগ্রহ করে বাইরে নিয়ে আসতে হবে। এই গ্যাসটি বেশিক্ষণ দেহের ভেতর থাকলে মারাত্মক ক্ষতি হবে। এই গ্যাস দেহ থেকে সরিয়ে ফেলার গুরুত্বপূর্ণ কাজটিও শ্বাসক্রিয়া

সম্পন্ন করে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। সুতরাং আমরা এই পৃথিবীতে যতদিন বেঁচে থাকি তার প্রতিটি মুহূর্তে শ্বাসক্রিয়া আমাদের চেতন ও অবচেতন অবস্থায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই **'জীবন রক্ষাকারী'** দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। মাত্র ক'টি মিনিট যদি শ্বাসক্রিয়া তন্ত্রের কাজে বড় ধরনের বাধার সৃষ্টি হয় তাহলে মানুষের মৃত্যু অনিবার্য হয়ে পড়বে। কারণ দেহের সকল টিস্যু অক্সিজেনের অভাবে অক্রিয় হয়ে যাবে। আর অক্রিয় দেহ-টিস্যু মৃতের সমান।

যাক, আজ আমরা মানব শ্বাসক্রিয়া তন্ত্রের উপর আলোচনা করবো। অবশ্যই আমাদের আলোচনা সীমিত ও সংক্ষিপ্ত হবে। প্রথমেই আমরা রেসপিরেটরী সিস্টেমের মূল দেহযন্ত্র **'ফুসফুসের'** [lungs] উপর কিছুটা তথ্য তুলে ধরার প্রয়াস পাচ্ছি।

৩.৮. ক. আমাদের ফুসফুস [lungs]

নাক ও মুখ দ্বারা বাইর থেকে শ্বাসের মাধ্যমে বাতাস ভেতরে নেওয়া হয়। এটা তো সবার জানা। এরপর এই বাতাস পুনরায় বের করে নিয়ে আসি আমরা। বাতাস ভেতরে নেওয়া ও পুনরায় বের করার মধ্যে রহস্য কি? আসলে বাতাসে বেশ ক'টি গ্যাস বিদ্যমান। এর মধ্যে দেহের জন্য জরুরী গ্যাসটির নাম অক্সিজেন [oxygen]। এটুকু জেনে আমরা বলতে পারি শ্বাসের মাধ্যমে ভেতরে বাতাস নেওয়ার রহস্যের কারণ অনেকটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে। এই অক্সিজেন গ্রহণের জন্যই শ্বাস গ্রহণ। বাতাসে কিন্তু শুধুমাত্র অক্সিজেন গ্যাস নয়- এতে আরো কয়েকটি গ্যাস আছে। রক্তকোষের মাধ্যমে দেহের প্রত্যেকটি কোষে এই অক্সিজেন যেতে হবে। সুতরাং এমন একটি যন্ত্র চাই যার কাজ হবে বাইর থেকে প্রাপ্ত বাতাস হতে অক্সিজেন আলাদা করে রক্তকোষে সাপ্লাই দেওয়া। এই কাজটিই আঞ্জাম দিচ্ছে আমাদের ফুসফুস। অবশ্য ফুসফুসের কাজ এটুকুই নয়। কোষের বর্জ্য **'কার্বন ডাইঅক্সাইড'** গ্যাস রক্তকোষ সমগ্র দেহ থেকে সংগ্রহ করে ফুসফুসে নিয়ে আসে। এই গ্যাস দেহের জন্য ক্ষতিকর। যে কোন উপায়ে এই বর্জ্য দেহ থেকে বের করা চাই। এ কাজটিও ফুসফুস করে থাকে। সুতরাং বুঝাই যাচ্ছে, আমাদের ফুসফুস হলো **'গ্যাস এক্সচেঞ্জ মেশিন'** [gas exchange machine]। নীচের চিত্রটি দেখুন।

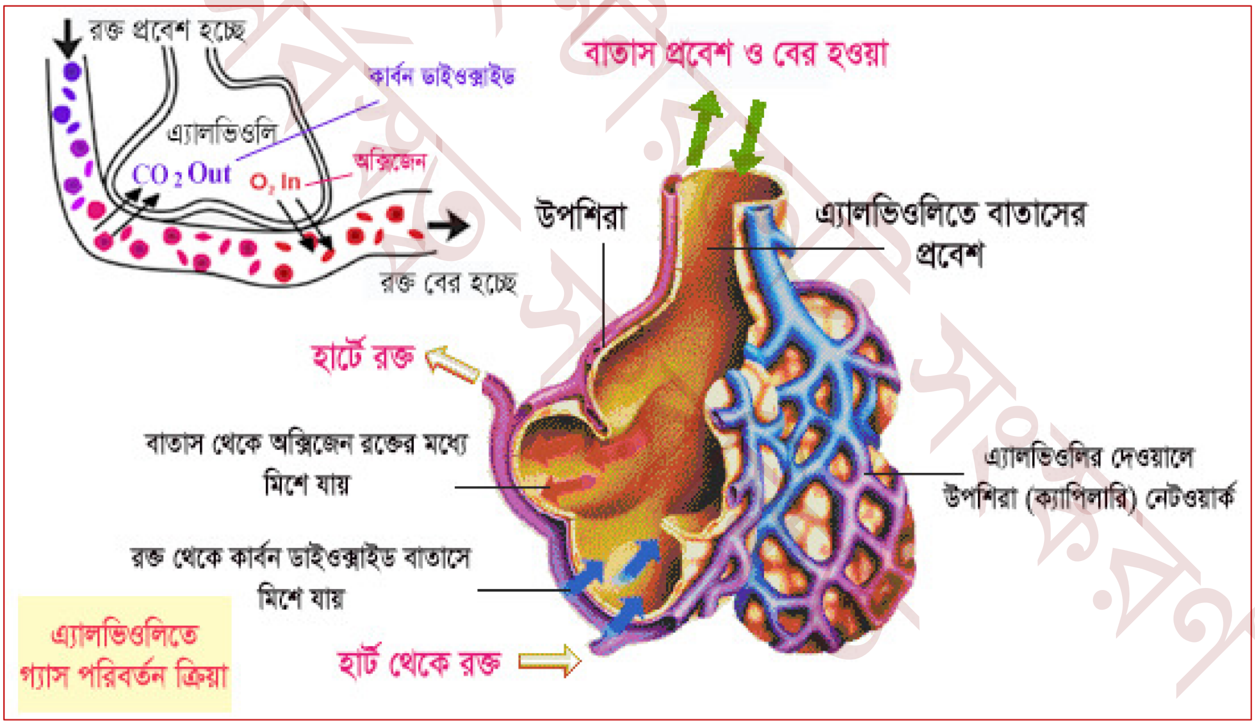


আমাদের ফুসফুস মূলত দু'টি। একটি ডানদিকে ও আরেকটি বামদিকে অবস্থিত। ডানেরটি বায়েরটি থেকে আয়তনে কিছুটা বড়। আয়তনে পার্থক্যের মূল কারণ হলো বায়ের দিকে আমাদের হৃদযন্ত্র অবস্থিত। সুতরাং বায়ের ফুসফুস কিছুটা ছোট্ট হওয়ার দরকার। উভয় ফুসফুস একটা আরেকটার সঙ্গে সংযুক্ত আছে। সংযুক্তির অংশ দিয়েই বাতাস ও রক্ত ফুসফুসে প্রবেশ ও বের হয়।

গ্যাস এক্সচেঞ্জ এলাকা: বলেছি, আমাদের ফুসফুস একটি গ্যাস এক্সচেঞ্জ যন্ত্র। এবার জেনে নেবো, এই গ্যাস পরিবর্তন কোন্ অঞ্চলে সাধিত হয়। তিনটি আলাদা এলাকায় এই এক্সচেঞ্জ ক্রিয়া কার্যকরী হয়। এগুলো হলো: বাতাস-কক্ষ, রক্ত-কক্ষ ও টিস্যু-কক্ষ। টিস্যু-কক্ষের কাজ হলো বাতাস ও রক্তকে একত্রিত করা। এর ফলে গ্যাস পরিবর্তন ক্রিয়া সম্ভব হয়। একই সময় টিস্যু-কক্ষ উভয়কে যারতার অবস্থানে রাখাও নিশ্চিত করে। উভয় ফুসফুসের ভেতরে টিস্যু কক্ষের মোট অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রফল ১৪০ বর্গমিটার। শ্বাসের মাধ্যমে প্রবেশ-হওয়া গ্যাস বাতাস থেকে রক্তে মিশে এবং রক্ত থেকে বাতাসে মিশে। এই কাজটি টিস্যু-কক্ষের ভেতরই সংগঠিত

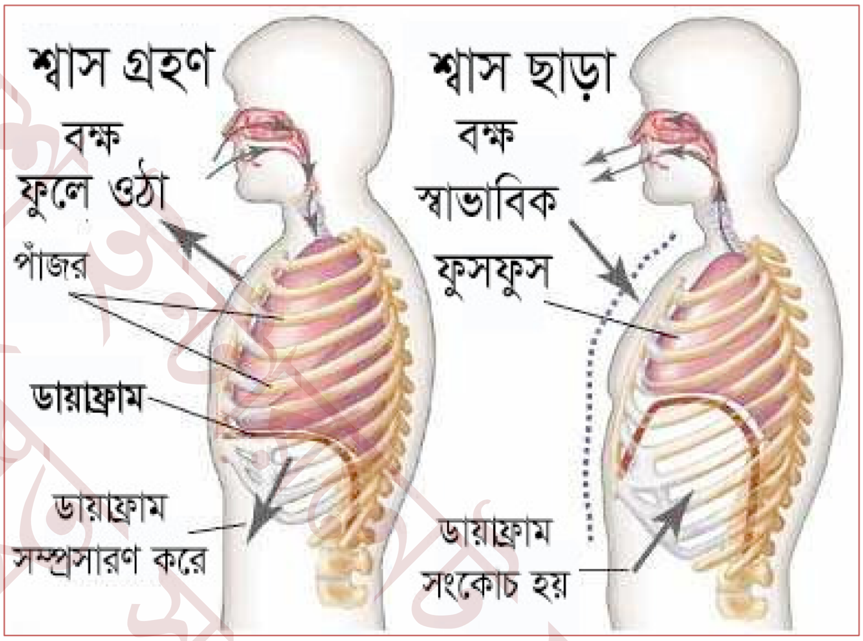
হয়।

মুখ, নাক ও ট্রাকিয়া: ফুসফুসে অক্সিজেন প্রবেশ হওয়া নিশ্চিত রাখতে কয়েকটি দেহযন্ত্র একসাথে সক্রিয় আছে। আগেই বলেছি, মুখ ও নাক দিয়ে বাতাসের সাথে গ্যাস ফুসফুসের ভেতর প্রবেশ করে। পথে থাকে **'লারিংক্স'** [larynx] এবং **'ট্রাকিয়া'** [trachea]। প্রথমটিকে বাংলায় বাগযন্ত্র বলে। বুঝতেই পারছেন, এর অর্থ হলো কথা বলার যন্ত্র। দ্বিতীয়টির বাংলা নাম হলো শ্বাসনালী। এ শব্দটিও স্ব-ব্যাখ্যাত। এই নালী বুকের কাছে যেয়ে দু'টি ভাগে বিভক্ত হয়েছে। এই উভয় নালীকে বলে **'ব্রঙ্কাই'** [bronchi]। বাংলায় ব্রঙ্কাই শব্দের প্রতিশব্দ হলো **'শ্বাসনালী!'**। আমি এখানে আশ্চর্যবোধক চিহ্ন দিয়েছি এ কারণে যে, ব্রঙ্কাই শব্দের অর্থ তা-ই লিখা আছে বাংলা একাডেমীর ইংরেজী বাংলা অভিধানে। ব্রঙ্কাই বহুবচন। এর একবচন হলো **'ব্রঙ্কাস'** [bronchus]। প্রতিটি ব্রঙ্কাস আবার অনেকগুলো শাখায় বিভক্ত হয়েছে। সবগুলো মিলে যে টিউব সিস্টেম সৃষ্টি হয়েছে তাকে বলে **'ব্রঙ্কাইয়াল টিউব্স'** [bronchial tubes]। আমাদের ফুসফুসের ভেতর এসব টিউব প্রবেশ করে আরো ছোট্ট ছোট্ট অংশে বিভক্ত হয়ে **'এ্যালভিওলি'** [alveoli] নামক অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র থলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। পরিণত বয়স্ক ব্যক্তির ফুসফুসে অন্তত ৬০ কোটি এ্যালভিওলি আছে। শ্বাস গ্রহণের পর এসব থলেতে অক্সিজেন প্রবেশ করে।



রক্তকোষের সঙ্গে অক্সিজেন মিশ্রণ ও কার্বন ডাইওক্সাইড বেরকরণ: এ্যালভিওলির চতুর্দিকে অসংখ্য উপশিরা বা ক্যাপিলারি আছে। সেখানে হৃদযন্ত্রের আরটারির মাধ্যমে রক্ত এসে অক্সিজেন নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে। লাল রক্তকোষের সঙ্গে অক্সিজেন মিশে যায়। ইতোমধ্যে রগ বা শিরা থেকে কার্বন ডাইওক্সাইড গ্যাস এ্যালভিওলিতে চলে আসে। আমরা যখন নিঃশ্বাসের মাধ্যমে বাতাস বের করি, তখন এই গ্যাস এ্যালভিওলি থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। সুতরাং একবার শ্বাস নেওয়া ও বের করার মধ্যে একদিকে অক্সিজেন রক্তকোষে মিশে ও অপরদিকে কার্বন ডাইওক্সাইড বেরিয়ে আসে বাইর বায়ুমণ্ডলে। শিশুর জন্মের পর থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এই ক্রিয়া চলতে থাকে।

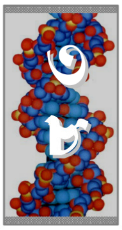
ডায়াফ্রাম [diaphragm]: আমাদের ফুসফুসের মধ্যে অক্সিজেন ঢুকাতে ও ফুসফুস থেকে কার্বন ডাইওক্সাইড বের করতে একটি দেহযন্ত্র সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করে। এই যন্ত্রের নাম **'ডায়াফ্রাম'** [diaphragm]। আমাদের বুকের নীচের অংশে ডায়াফ্রামের অবস্থান। শ্বাস গ্রহণের সময় পেশীসর্বস্ব এই ডায়াফ্রাম সম্প্রসারণ করে এবং নিঃশ্বাসের সময় এটি সংকোচ হয়। সুতরাং শ্বাস-নিঃশ্বাস- হোক তা ঐচ্ছিক বা অনৈচ্ছিক, ডায়াফ্রামের সম্প্রসারণ ও সংকোচ ক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। নীচের চিত্রটি দেখুন।



প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা! আশাকরি রেসপিরেটরী সিস্টেমের মূল কাজ সম্পর্কে আপনারা এখন অনেকটা বেশী জ্ঞানবান হতে পেরেছেন। এই সিস্টেমের আসল কর্ম দেহের ভেতর জীবন রক্ষাকারী উপাদান অক্সিজেন গ্যাস রক্তের মধ্যে যোগান দেওয়া। একই সময় জীবনের জন্য ভীষণ ক্ষতিকর কোষসৃষ্ট বর্জ্য কার্বন ডাইওক্সাইড গ্যাস দেহ থেকে বায়ুমণ্ডলে বের করে ফেলা। আজকের লেকচার এটুকুই। আগামী লেকচারে যোগ দেওয়ার জন্য সবাইকে আবারো আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই শেষ করছি। আমরা তখন ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের উপর আলোচনা করবো, ইনশাআল্লাহ্! আল্লাহ হাফিজ।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম





বক্তা: ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী, নেশন্যাল ডিপ্লোমা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ইংল্যান্ড।

স্থান: খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সুবিদ বাজার, সিলেট।

ঙ. জীববিদ্যা: পরিচিতি ও কার্যকারিতা

বক্তৃতা ৩৮ : প্রাণীজগৎ

৩.৯. ডাইজেস্টিভ সিস্টেম [digestive system]

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা! মানবদেহের উপর ধারাবাহিক আলোচনার অংশ হিসাবে আজ আমরা **'পরিপাকতন্ত্র'** [digestive system] নিয়ে আলোচনার প্রয়াস পাচ্ছি। মজাদার খাবার তৈরী করে মুখ-গহ্বরে আমরা প্রবেশ করি। গলদ্ধকরণের পর এই খাবার থেকে পুষ্টিকর দ্রব্য দেহে প্রবেশ করে রক্তের মাধ্যমে। আর বর্জ্য মলদ্বার দিয়ে বেরিয়ে যায়। ঠিক কোন্ উপায়ে এই পুরো তন্ত্রটি কাজ করে তা-ই জানা হবে আজকের লেকচারে- অন্তত এটাই আশা করছি। সুতরাং সবার মনোযোগ একান্ত কাম্য।

৩.৯. ক. পরিপাকতন্ত্রের দেহযন্ত্রাদি

সকল তন্ত্র সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনের জন্য আমাদের পুরো দেহ তার যাবতীয় যন্ত্রাংশ দ্বারা সরাসরি ও নেপথ্যে কাজ করে যাচ্ছে। তবে প্রত্যক্ষভাবে কিছু দেহযন্ত্র বিশেষ কোনো তন্ত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত আছে। পরিপাক বা ডাইজেস্টিভ তন্ত্রের সঙ্গে যে ক'টি মূল দেহাংশ জড়িত তাদের নাম ও ডিউটি সম্পর্কে জানা একান্ত দরকার। নিম্নে এ ব্যাপারে তথ্যাদি তুলে ধরছি।

মুখগহ্বর [mouth]: আমাদের মুখগহ্বর থেকেই পরিপাকতন্ত্রের ক্রিয়ার সূত্রপাত। যে মুহূর্তে আপনি মুখের ভেতর খাবার ঢুকিয়ে কামড় দেবেন সে মুহূর্ত থেকেই পরিপাকতন্ত্র সক্রিয় হয়ে ওঠবে। দন্ত দ্বারা কামড়ানোর মাধ্যমে খাদ্যকে ভেঙ্গে গলদ্ধকরণের জন্য উপযোগী করতে হয়। অবশ্য বোনাস হিসাবে আমরা উপভোগ করি খাদ্যের মজাদার স্বাদটুকু।

গলা [throat]: খাদ্যের পরবর্তী স্টেশন হলো গলা। এখান থেকে খাদ্য চলে যায় খাদ্যনালীতে।

খাদ্যনালী [esophagus]: এটা একটি দীর্ঘ পেশীসর্বস্ব টিউব বা নল। একে ইংরেজীতে **'ইসোফাগাস'** [esophagaus] বলে। গলা থেকে পাকস্থলী পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি। খাদ্যকে গলা থেকে পাকস্থলী পর্যন্ত পৌঁছানো এর কাজ। **'পেরিস্টালসিস'** [peristalsis] নামক পদ্ধতিতে খাদ্যনালী সংকোচ হয়ে হয়ে খাদ্যদ্রব্য পাকস্থলীতে ডেলিভারি দেয়। পাকস্থলীর সঙ্গে খাদ্যনালীর সংযুক্তির একটু আগে **'উচ্চ চাপসম্পন্ন'** একটি এলাকা আছে। এই অঞ্চলকে **'লোয়ার এসোফাগিয়েল স্ফিনস্টার'** [lower esophageal sphincter] বলে। বাস্তবে এখানে একটি কপাটক বা ভাল্ব [valve] আছে। এর কাজ হলো খাদ্যদ্রব্য ইসোফাগাসে ফেরৎ আসতে বারণ করা।

পাকস্থলী [stomach]: মানব পাকস্থলী একটি থলের মতো। তার দেওয়ালগুলো খুব শক্ত পেশী দ্বারা তৈরী। খাবার ধারণ করা ছাড়াও এটি মিশ্রণ ও চুর্ণন-যন্ত্র হিসাবে দায়িত্ব পালন করে থাকে। খাদ্য পরিপাক করতে যেয়ে এ কাজ দু'টো সম্পাদন জরুরী। কিভাবে? ঝাঁকুনি কিংবা আছড়ানোর মাধ্যমে অবশ্যই নয়! পাকস্থলী খুব শক্তিশালী 'অম্ল' [acid] ও 'এনজাইম' [enzyme] বা অনুঘটক তৈরী করে। এগুলো খাদ্যকে ভেঙ্গে ভর্তা ও তরল পদার্থে পরিণত করে ছাড়ে। পাকস্থলী থেকে খাদ্য এই অবস্থায় বেরিয়ে ক্ষুদ্রান্ত্রে বা ছোট্ট আঁতে প্রবেশ করে।

ক্ষুদ্রান্ত্র [small intestine]: এটা একটি দীর্ঘ পাইপ। এতে আছে তিনটি অংশ: **'ডুওডেনাম'** [duodenum], **'জেজুনাম'** [jejunum] এবং **'ইলিয়াম'** [ileum]। এসব অদ্ভুত নামকরণ কেন? আমি বলতে পারবো না। তবে এগুলোর কাজ কি তা জেনে নিলেই হয়- তাই না? আপনি যদি ক্ষুদ্র অন্ত্রকে টেনে সোজা করেন তাহলে এর দৈর্ঘ্য হবে ২০ ফুট থেকেও বেশী! পেটের মধ্যে এটি পেঁচানো অবস্থায় আছে।

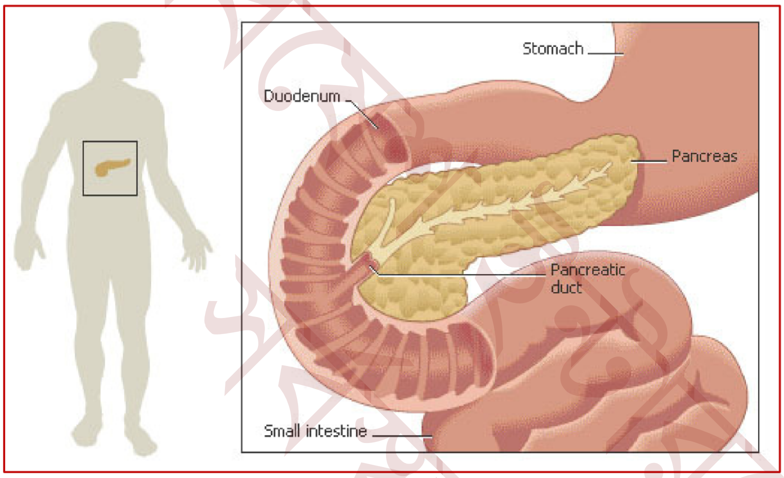
ছোট্ট এই আঁত পাকস্থলীর কাজকে আরো সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দিতে থাকে। খাদ্যকে ভেঙ্গে আরো ক্ষুদ্র করে। তাকে সাহায্য করে আমাদের লিভার ও প্যানক্রিস। উভয় দেহযন্ত্র ছেড়ে দেয় বিভিন্ন ধরনের **'এনজাইম'** [enzyme] ও **'বাইল'** [bile] বা পিত্তরস। রক্ত থেকে বর্জ্য সরানো এবং খাদ্যে থাকা মেদকে পরিপাক করতে পিত্তরস সাহায্য করে। ছোট্ট আঁতেও সংকোচন ও **'টিপানোর'** কাজ অব্যাহত থাকে। কারণ পরিপাক করা খাদ্যকে বিভিন্ন রসায়নিক দ্রব্যের সাথে মেশানো ছাড়াও সামনের দিকে এগিয়ে নিতে হবে।

ইতোমধ্যে অদ্ভুত নামকরণে ভূষিত ক্ষুদ্রান্ত্রের তিনটি অংশের কথা বলেছি। এবার এদের কাজ কি তা বুঝিয়ে দেবো। প্রথমটি তথা **'ডুওডেনাম'** এর দায়িত্ব হলো খাদ্য পরিপাকের কাজটি অব্যাহত রাখা। **'জেজুনাম'** ও **'ইলিয়াম'** অংশের কাজ হলো শরীরের জন্য উপকারী খাদ্যের মধ্য থেকে চুষে বের করা পুষ্টিকারক দ্রব্যাদি রক্তের মধ্যে যুক্ত করা। আর ক্ষুধা নিবারণ ছাড়া খাবার গ্রহণের মূল উদ্দেশ্যই এটি।

তিনটি দেহযন্ত্র আমাদের পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্রের সাহায্যার্থে একত্রে সক্রিয় থেকে খাবার পরিপাকের কাজটি

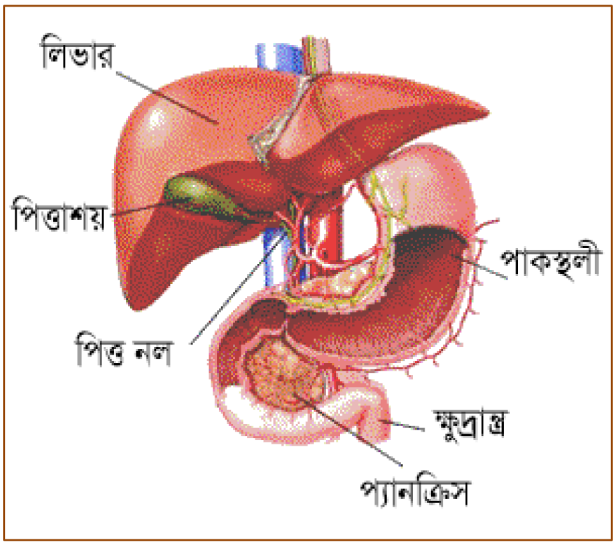
নিশ্চিত রাখে। আমরা এবার এ তিনটির উপর অতি সংক্ষিপ্তভাবে কিছুটা অতিরিক্ত বর্ণনা তুলে ধরার প্রয়াস পাচ্ছি।

প্যানক্রিস [pancreas]: একে বাংলায় **'অগ্ন্যাশয়'** বলে। এটি একটি দীর্ঘ, সরু গ্রন্থি। পেটের উপরিভাগে পাকস্থলী ও প্লীহার পেছনে আড়াআড়িভাবে এটি স্থাপিত আছে। প্যানক্রিস একই সঙ্গে পরিপাকতন্ত্রের জন্য জরুরী **'এনজাইম'** [enzyme] ও রক্তে চিনি নিয়ন্ত্রণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ **'হরমোন'** [hormone] **'ইনস্যুলিন'** [insulin] এবং **'গ্লুকেজন'** [glucagon] তৈরী করে। এছাড়া অন্ত্রের জন্য উপকারী **'পলিপেপটাইড'** [polypeptide] এবং **'সোমাটোসটাটিন'** [somatostatin] নামক দু'টি বস্তুও তৈরী করে এই প্যানক্রিস।



আমাদের ক্ষুদ্রান্ত্রে খাদ্য থাকাকালে প্রটিন, মেদ ও কার্বহাইড্রেট ভেঙ্গে ফেলার প্রয়োজন দাঁড়ায়। প্যানক্রিসে তৈরীকৃত এনজাইম এ কাজটি সারে। ফলে খাদ্যের উপকারী অংশটুকু রক্তের মাধ্যমে দেহের সকল টিস্যু, পেশী ও কোষে যেয়ে পৌঁছতে সক্ষম হয়।

লিভার [liver]: বাংলায় লিভারকে **'যকৃৎ'** বলে। এটা মানবদেহের সর্ববৃহৎ গ্রন্থি। তার ফাংশন বা কার্যাবলী অত্যন্ত জটিল ও বহুমুখী। তার মৌলিক কাজ হলো: **ক. প্রটিন, কার্বহাইড্রেট** ও **মেদ** নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবহারে সাহায্য করা; **খ.** সে **কলেস্টরেল** ও **পিত্তরস উৎপাদন করে; গ. লাল রক্তকোষ 'হিমোগ্লবিন'** [hemoglobin] ভেঙ্গে **'বাইলিরুবিন'** [bilirubin] নামক বর্জ্য তৈরী হয়, হাড্ডির মজ্জা ও যকৃৎ এটি তৈরী করে থাকে; **ঘ. কিছু ড্রাগ সৃষ্টি ও পরিচালনে যকৃৎ এটি সক্রিয়;** এবং **ঙ. দেহের জন্য উপকারী ও জরুরী কার্বহাইড্রেট পরিচলন ও সংরক্ষণে আমাদের লিভার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।**

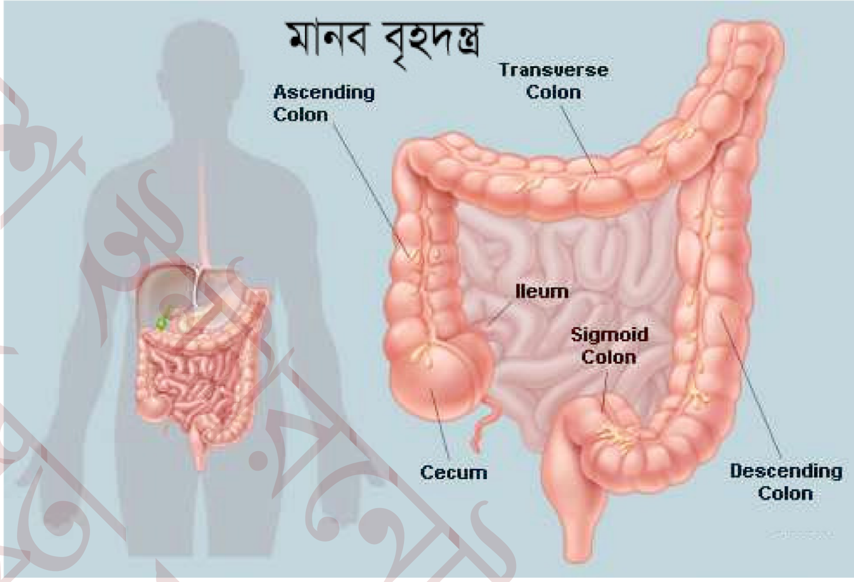


লিভারে সৃষ্ট পিত্তরস আমাদের পরিপাকতন্ত্রের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান। লিভারে এটি তৈরী হওয়ার পর নিম্নে ব্যাখ্যাত **'গলব্লাডার'** থলেতে জমা হয়।

৩. গলব্লাডার [gallbladder]: এটা ছোট্ট একটি থলে। এতে রক্ষিত থাকে লিভারে সৃষ্ট পিত্তরস। বাংলায় গলব্লাডারকে 'পিত্তকোষ' বা **'পিত্তাশয়'** বলে। কথ্য ভাষায় **'পিত'** বলে সম্বোধন করা হয়।

লিভার থেকে পিত্তরস **'সিস্টিক ডাক'** [cystic duct] নামক একটি রাস্তায় পিত্তাশয়ে প্রবেশ করে। আমরা যখন খাবার গ্রহণ করি, পিত্তাশয় কিছুটা সংকোচ হয়। এর ফলে ভেতরে সংরক্ষিত তরল পিত্তরস বেরিয়ে আসে ও প্রবেশ করে ছোট্ট অন্ত্রে। পিত্তরস পরিপাক কার্যে সহায়তা করে।

বৃহদন্ত্র [large intestine]**:** এটাকে বাংলায় 'ভড়'ও বলে। ইংরেজীতে একে **'কলন'** [colon] নামেও সম্বোধন করা হয়। ছোট্ট অন্ত্র থেকে তরল খাদ্য এতে প্রবেশ করে। এই অন্ত্রের মূল কাজ হলো খাদ্যের পানি চুষে নেওয়া; বিভিন্ন বস্তুর সল্যুশন যেমন লবণ (সোডিয়াম-ক্লোরিন) নিয়ন্ত্রণে রাখা; মলদ্বার দিয়ে বেরিয়ে আসার পূর্ব পর্যন্ত খাদ্যের বর্জ্য (মল) গুদামজাত করে রাখা; এবং **'মিউকাস'** [mucus] নামক পিচ্ছিল তরল পদার্থ বানানো। এই পদার্থ অন্ত্রের বস্তুকে চলন্ত রাখতে সাহায্য করে।

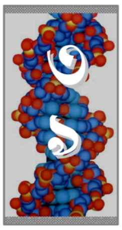


ক্ষুদ্র ও বৃহদন্ত্রের সংযুক্তি স্থলে একটি কপাটক আছে। এই ভাল্ব দিয়ে ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ অন্ত্রে প্রত্যেক দিন অন্তত দেড় থেকে দুই লিটার খাদ্যদ্রব্য প্রবেশ করে। তবে বৃহদন্ত্র এ থেকে অধিকাংশ পরিপাকযোগ্য বস্তু বের করে দেহের মধ্যে চুষে নেয়। বাকী যা থাকলো তা-ই **'মল'** হিসাবে গণ্য। এই অংশ আর দেহের জন্য পরিপাকযোগ্য কিংবা উপকারী নয়। মলদ্বার দিয়ে তা অবশেষে বেরিয়ে আসে। মলের মধ্যে অপরিপাকযোগ্য বস্তু ছাড়াও আরো থাকে অকেজো মিউকাস কোষ, মৃত ব্যাক্টেরিয়া বা জীবাণু এবং ব্যাক্টেরিয়া দ্বারা পরিপাক হয় নি এমন খাদ্যাংশ।

প্রিয় শ্রোতাবৃন্দ! আজকের লেকচারের ইতি এক্ষুণি টানবো। মানবদেহের বাকী তিনটি তন্ত্রের উপর আলোচনার দরকার। লেকচার ৩৯ ও ৪০ দ্বারা তা কাভার করার আশা রাখি। এটাও আশা করে বিদায় নিচ্ছি, আপনারা সবাই ওসব লেকচারে উপস্থিত হবেন ও মনোযোগসহ শ্রবণ করবেন। আল্লাহ হাফিজ।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম





বক্তা: ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী, নেশন্যাল ডিপ্লোমা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ইংল্যান্ড।

স্থান: খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সুবিদ বাজার, সিলেট।

৬. জীববিদ্যা: পরিচিতি ও কার্যকারিতা

বক্তৃতা ৩৯ : প্রাণীজগৎ

৩.১০. ইমিউন সিস্টেম [immume system]

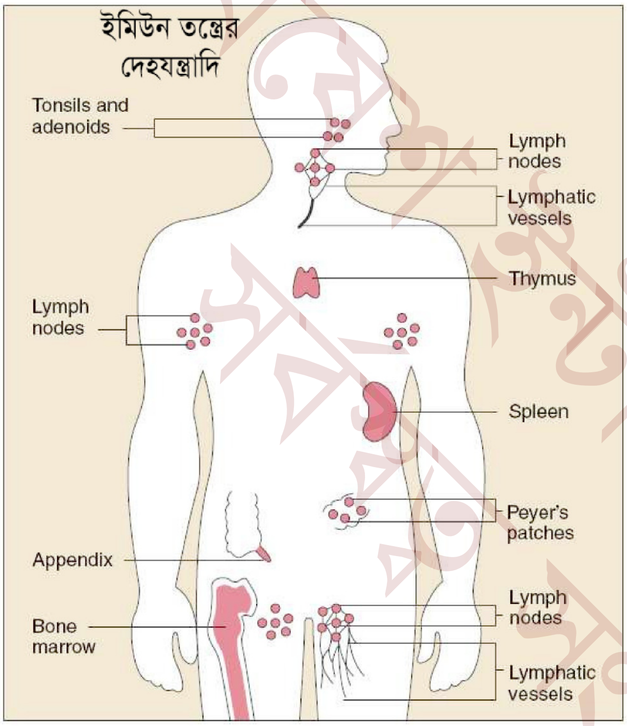
শ্রোতা বন্ধুরা! ওয়েলকাম টু লেকচার ৩৯। মানবদেহের উপর আমাদের আলোচনা আজও অব্যাহত থাকবে। বিজ্ঞানীরা মানবদেহের ফাংশনকে মোট ১২টি তন্ত্রে বিভক্ত করে গবেষণা করে থাকেন। ইতোমধ্যে আমরা ৯টি তন্ত্রের উপর তথ্যানুসন্ধান চালিয়েছি- অতি সংক্ষেপে অবশ্যই। আজকের লেকচারের ফোকাস হবে দশম তন্ত্র **'রোগ প্রতিরোধ'** [immune] নিয়ে- অতি সংক্ষেপে অবশ্যই! আশা রাখি সকলের মনোযোগ সুদৃঢ় থাকবে।

৩.১০. ক. ইমিউন পরিচিতি

আমাদের পারিপার্শ্বিকতায় অসংখ্য বস্তু আছে যা আমাদের দেহের জন্য ক্ষতিকর ও রোগ-ব্যাধির কারণ। পুরো দেহযন্ত্র সঠিকভাবে কার্যকরী হওয়া ও মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত রাখতে প্রয়োজন একটি শক্তিশালী ডিফেন্স সিস্টেমের। এই ডিফেন্স সিস্টেমের নামই **'ইমিউন'** [immune] বা রোগ প্রতিরোধ।

প্রতিরক্ষার মূল হলো **'দুশমন সনাক্তকরণ'**। হামলার পূর্বে দুশমনকে চিনতে হবে। দেহের জন্য ক্ষতিকর সকল বস্তুকে বলে 'এ্যান্টিজেন' [ধহঃরমবহ]। কোষ, ভাইরাস, ফাঙ্গি (ছত্রাক) ও ব্যাক্টেরিয়ার (জীবাণু) উপরে এ্যান্টিজেন

বস্তু অবস্থান করে। ইমিউন সিস্টেম এই এ্যান্টিজেন সনাক্ত করার পর ওসব ক্ষতিকর উপাদান ধ্বংস করে দেয়। ফরেন (অপরিচিত) বস্তু, ড্রাগ, কেমিক্যাল, বিষদ্রব্য ইত্যাদিতেও এ্যান্টিজেন থাকতে পারে। যে কোন বস্তুতে এ্যান্টিজেন থাকলেই ‘ইমিউন প্রতিক্রিয়া’ [রসসঁহব ৎবংঢ়ড়হংব] হয়। এ্যান্টিজেনই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সক্রিয় করে তুলে। অর্থাৎ এ্যান্টিজেন যুক্ত দ্রব্যাদি দেহের জন্য ক্ষতিকর। ইমিউন সিস্টেম এসব দ্রব্য ধ্বংস করে দেয়। আমাদের দেহে প্রটিন নামক কোষ আছে। এগুলো দেহের জন্য উপকারী। প্রটিনেও এ্যান্টিজেন আছে। কিন্তু ইমিউন সিস্টেম এসব এ্যান্টিজেন কি তা বুঝে। সুতরাং এ্যান্টিজেন যুক্ত প্রটিন ইমিউন সিস্টেমের আক্রমণ থেকে নিরাপদ।



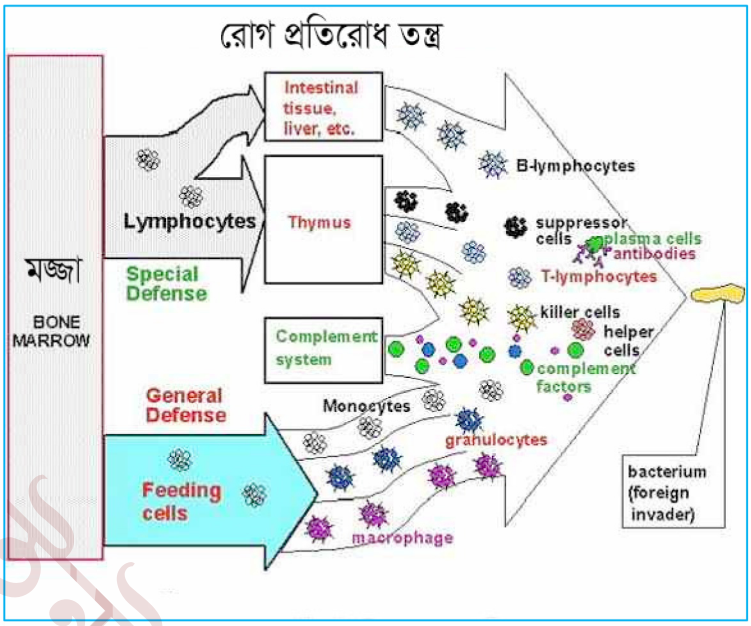
৩.১০.খ. রোগ প্রতিরোধে সক্রিয় বিভিন্ন দেহযন্ত্র ও কোষ

দেহের ভেতর একদল কোষ ও কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিশেষ দেহযন্ত্র আছে। রোগ-ব্যাধি প্রদানকারী বিভিন্ন উপাদান যেমন রোগ জীবাণু কিংবা দেহের জন্য ক্ষতিকর এ্যান্টিজেন যুক্ত কোন বস্তু ইত্যাদির উপর এগুলো আক্রমণ চালায়। ফরেন ক্ষতিকর বস্তু ধ্বংস করে আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষায় সহায়তা করে।

আমাদের দেহে জীবাণু, ভাইরাস ও ছত্রাক জাতীয় রোগসৃষ্টিকারী উপাদান যাতে সহজে ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে তার ব্যবস্থা দেহের চামড়া নিশ্চিত করে রেখেছে। কিন্তু এরপরও রোগ সৃষ্টিকারী ক্ষতিকর উপাদান দেহের ভেতর বিভিন্ন উপায়ে প্রবেশ করে ফেলে। সুতরাং দেহকে রক্ষার্থে দলে দলে কোষ, মলিকিউল এবং অরগ্যান বা দেহযন্ত্র মিলে আক্রমণকারী বস্তুকে ধ্বংস করার কাজে নিয়োজিত আছে। রোগ প্রতিরোধ সিস্টেম কতটুকু সফল তার উপর নির্ভর করে কোনো ব্যক্তির স্বাস্থ্যরক্ষা।

দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দু’ ধরনের। প্রথমটি হলো জন্মগত এবং দ্বিতীয়টি অভিযুজ্য তথা প্রয়োজনমাফিক। জন্মগত রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা হলো সাধারণ- যেমনঃ চামড়া, অশ্রু, শ্লেষ্মা, থু-থু, কাটা-পোড়ার পর দ্রুত টিস্যু ফুলে ওঠা ইত্যাদি প্রাথমিক রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসাবে কাজ করে। সুতরাং প্রাথমিক এসব জন্মগত রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা আমাদের জন্য বিশেষ উপকারী। কিন্তু এরপরও এগুলো যথেষ্ট নয়। কারণ আত্মরক্ষার এই প্রথম প্রতিরক্ষা লাইন যদি কোন ক্ষতিকর উপাদান অতিক্রম করে বসে- যা প্রায়ই ঘটে, তাহলে কী হবে? এ ক্ষেত্রে ওসব বিশেষ মলিকিউল, কোষ ও যন্ত্রাদি মিলে আরেক প্রতিরক্ষা লাইন তৈরী করে। এই ডিফেন্স সিস্টেম অনেকটা শত্রুর স্বরূপ-নির্ভর- অর্থাৎ বিশেষ শত্রুকে পরাজিত করার একটি নতুন উপায়। আর এখানেই শেষ নয়। অনুরূপ শত্রু দ্বারা আবারো আক্রান্ত হলে একই ভাবে ডিফেন্স তৈরীর একটি স্থায়ী ব্যবস্থাও রোগ প্রতিরোধ সিস্টেম করে রাখে। শেষোক্ত এই অভিযুজ্য ক্ষমতা আমাদের দেহে থাকার দরুনই স্থায়ী ভেকসিনেশন (টিকাদান) সম্ভব হয়।

অভিযুজ্য রোগ প্রতিরোধ সিস্টেমের চারটি আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমতঃ আক্রমণকারী দেহে প্রবেশের পর এটা সক্রিয় হয়ে ওঠে- এর আগে নয়। দ্বিতীয়তঃ এটা একমাত্র ঐ বিশেষ আক্রমণকারীকে হামলা করে। তৃতীয়তঃ প্রথমবার হামলার পর সফল হওয়ার পরে এই ক্ষমতাটি সংরক্ষিত থাকে যাতে ভবিষ্যতে অনুরূপ আক্রমণকারীকে ধ্বংস করা যায়। বছরের পর বছর পর্যন্ত এই ব্যাপারটি সংরক্ষিত থাকে এবং দ্বিতীয়বার শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে তা আরো সফলতা অর্জন করে। চতুর্থতঃ এটা সাধারণ দেহ-বস্তুকে আক্রমণ করে না- শুধুমাত্র ওসব জিনিসই হামলার শিকার হয় যেগুলো নন-আত্ম (আমাদের দেহের নয়, বা এলিয়েন) বলে পরিচিত হয়।



অভিযুজ্য রোগ প্রতিরোধ সিস্টেমের দু'টি উপশাখা আছে। এগুলো হলো হিউমোরাল ও কোষ মধ্যস্থতাকারী রোগ প্রতিরোধ প্রতিক্রিয়া। প্রথম ধরনের প্রতিক্রিয়ার সময় 'এ্যান্টিবডি' [ধহঃরনড়ফু] নামক এক ধরনের প্রোটিন দেহের তরল পদার্থ ও রক্তের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। এসব প্রোটিন আক্রমণকারীর দেহে জড়িয়ে ধরে তাকে খতম করে ছাড়ে। হিউমোরাল প্রতিক্রিয়া কোষের বাইরে সংঘটিত হয়- যেমন জীবাণু এবং বিষাক্ত জিনিস ধ্বংসকরণ। এই একই প্রতিক্রিয়া কোষের ভেতর ভাইরাস প্রবেশেও বাধাদান করে থাকে।

যখন কোষ-মধ্যস্থতাকারী প্রতিরোধ ক্রিয়াশীল হয় তখন, যেসব কোষ অন্য কোষকে ধ্বংসের ক্ষমতা রাখে ওগুলো সক্রিয় হয়ে ওঠে। তবে এরা বেপরোয়াভাবে কোষ ধ্বংসের কাজে লেগে যায় না- একমাত্র ওসব কোষকে তারা আক্রমণ করে ধ্বংস করে, যাদের ভেতর থেকে ক্ষতিকর 'এ্যান্টিজেন' [ধহঃরমবহ] (রোগ জীবাণুর মতো উপাদান) বেরিয়ে আসে কিংবা যেসব কোষ নষ্ট হয়ে পড়েছে। এভাবে বেছে বেছে কোষ ধ্বংসের ক্ষমতা এরা রাখে। বিজ্ঞানীরা বলেন, এসব কোষ এরূপ 'বুদ্ধিসম্পন্ন' ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে আমাদের দেহকে সংরক্ষণের নিমিত্তে। শুধু তাই নয়- ক্যান্সারের মতো রোগ দ্বারা 'কপি' করা কিছু কোষকেও এরা ধ্বংস করে দিতে পারে। আমরা অন্যত্র রোগ-প্রতিরোধের সঙ্গে সম্পৃক্ত এসব কোষ নিয়ে আলোচনা করেছি। নিম্নে এগুলো সম্পর্কে আবারো কিছু তথ্য তুলে ধরলাম।

সাদা রক্তকোষঃ এই গ্রুপে আছে **'লিমফোসাইট'** [lymphocyte], **'মনোসাইট'** [monocyte], **'ইওসিনোফিল'** [eosinophill], 'বেসোফিল' [basophil] এবং **'নিউট্রোফিল'** [neutrophil] কোষসমূহ। এগুলো মূলত দেহের রোগ-প্রতিরোধ তন্ত্রের সাথে সম্পৃক্ত। **'লিমফোসাইট'** ক্যান্সার কোষকে হামলা করে বিভিন্ন এ্যান্টিবডি তৈরী করে। এছাড়া এটাই ফরেন টিস্যু অগ্রাহ্যের জন্য দায়ী। **'মনোসাইট'** হাড্ডির মজ্জা ছাড়াও প্লীহায় তৈরী হয়। এর কাজ হলো মৃত কোষাংশ ও ফরেন বস্তু গিলে ধ্বংস করা। **'ইওসিনোফিল'** [eosynophil] এলার্জিক প্রতিক্রিয়ার জন্য দায়ী। এছাড়া পরজীবী জীবাণু ধ্বংসে এ কোষগুলো ভূমিকা রাখে। **'বেসোফিল'** রক্তের মধ্যে দোষ-ত্রুটি থাকলে সক্রিয় হয় ও তা নিশ্চিহ্ন করে। রক্তের মধ্যে বেশী পরিমাণ কোষ হলো **'নিউট্রোফিল'**। এটা দেহের

রোগ-প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিশেষ করে ইনফেকশন থেকে রক্ষার্থে এটা বিশেষ কার্যকরী।

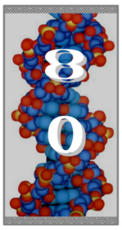
প্লেটলেট [platelet] এর মূল কাজ হলো রক্তের মধ্যে জমাট সৃষ্টি করা। চামড়া বা টিস্যু কেটে গেলে জমাট বাঁধা একান্ত জরুরী। অন্যথায় রক্তঝরা বন্ধ হবে না। প্লেটলেট ছাড়া তা সম্ভব নয়।



প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা! মানবদেহের ইমিউন বা রোগ প্রতিরোধ তন্ত্রের উপর বক্তৃতা এটুকুই। অতিরিক্ত আর কিছু বলা যাচ্ছে না। বাস্তবে, মানব বায়োলজি [যঁসধহ নরড়ষড়মু] বিজ্ঞানের একটি 'স্পেশালাইজ্‌ড' বিষয়। এটা আসলে মেডিকেল বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সুতরাং এ বিষয়টির উপর আমার নিজেরও জ্ঞান সীমিত! আমরা যা আলোচনা করছি তা 'পরিচিতিমূলক' তথ্যাদি মাত্র। আর এ কারণেই আগামী লেকচারেও মানবদেহের পুনর্জনন তন্ত্র নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন। আশারাখি সবাই উপস্থিত হবেন।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম





বক্তা: ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী, নেশন্যাল ডিপ্লোমা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ইংল্যান্ড।

স্থান: খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সুবিদ বাজার, সিলেট।

ঙ. জীববিদ্যা: পরিচিতি ও কার্যকারিতা

বক্তৃতা ৪০ : প্রাণীজগৎ

৩. ১১. পুরুষ রিপ্রোডাক্টিভ [male reroductive] এবং ১২. মহিলা রিপ্রোডাক্টিভ [female reproductive] তন্ত্র

লেকচার ৪০-এ সবাইকে জানাচ্ছি উষ্ণ স্বাগত। প্রিয় সন্ধানী বন্ধুরা! আজকের লেকচারের বিষয়বস্তু কিছুটা স্পর্শকাতর। ভাবছিলাম এর উপর বক্তব্য প্রদান করবো না। কিন্তু আমরা বিজ্ঞানের উপর আলোচনা করছি। মানবদেহের সম্ভবত সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ একটি তন্ত্রকে উপেক্ষা করা আদৌ ঠিক হবে না, যদিও বিষয়টি খুব **'টাচি'!** যাক গুরুত্বপূর্ণ এই তন্ত্রটি হলো পুনর্জনন। ইংরেজীতে বলে 'reproduction'। আশাকরি শ্রোতা বন্ধুরা আমাকে ক্ষমা করবেন। বিভিন্ন বিষয় বুঝাতে যেয়ে ইচ্ছাকৃতভাবেই **'ছবি'** ও **'চিত্রাঙ্কন'** নোটে সম্পৃক্ত করি নি। দু'টি মাত্র ছবি আছে। এ দু'টো দ্বারা পুরুষ ও নারীর যেসব দেহাংশ পুনর্জননের সঙ্গে জড়িত শুধু ওগুলোই দেখানো হয়েছে।

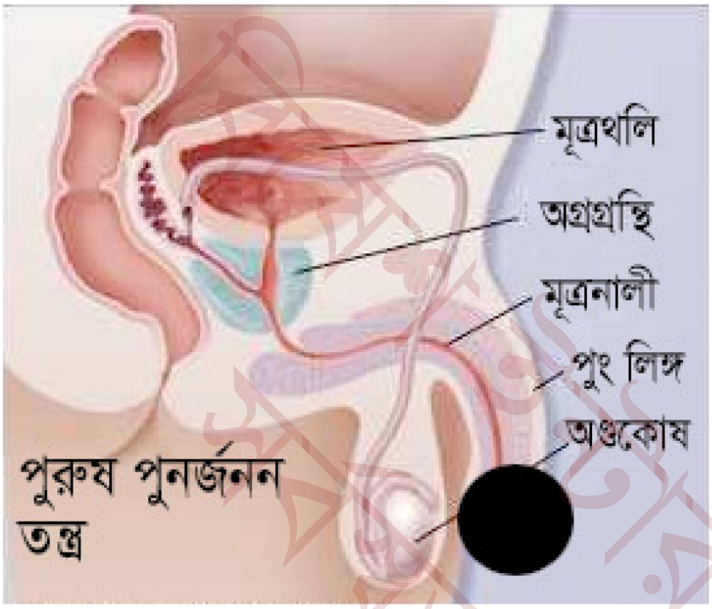
৩. ১১. ক. পুরুষ পুনর্জনন দেহযন্ত্র [organs]

পুরুষের পুনর্জনন দেহযন্ত্রগুলোর মূল কাজ ৩টি:

১. শুক্র কোষ ও পিচ্ছিল তরল পদার্থ [sperm and semen] তৈরী এবং এগুলোকে পরিবহন নিশ্চিত করা।

২. যৌনক্রিয়ার সময় মহিলা পুনর্জনন পথে শুক্রকোষ ছেড়ে দেওয়া।

৩. পুরো পুনর্জনন ক্রিয়াকে সক্রিয় ও প্রাণবন্ত রাখতে **'পুরুষ যৌন উদ্দীপক রস'** [male sex hormones] তৈরী করা।



পুনর্জননের সঙ্গে সম্পৃক্ত দেহযন্ত্রাদি পুরুষদের ক্ষেত্রে মূল দেহের বাইরে অবস্থান করে। অপরদিকে মহিলাদের ক্ষেত্রে ওগুলোর অবস্থান দেহের ভেতর। পুরুষদের দেহযন্ত্রাদির উপর এবার একে একে ব্যাখ্যা তুলে ধরবো।

পুং লিঙ্গ [penis]: যৌনক্রিয়ার মূল পুরুষাঙ্গ এটি। এর মধ্যে তিনটি অংশ আছে: ১. মূল: তলপেটের দেওয়ালে এটি সংযুক্ত, ২. কাণ্ড: সম্পূর্ণ বাইরের অংশ এবং ৩. মাথা: এটা আকারে মোচাকার। জন্মক্ষণে এই অংশটুকু পাতলা চামড়ায় আবৃত থাকে। স্বাস্থ্যরক্ষার্থে এই চামড়াটুকু কেটে ফেলা হয়ে থাকে। এভাবে কাটার নামই **খত্না**। মাথায় একটি ছোট্ট রাস্তা আছে যার মধ্য দিয়ে প্রস্রাব ও শুক্রকোষ বেরিয়ে আসে।

পুং লিঙ্গ সম্পর্কে এ পর্যন্ত যা বলেছি তা শ্রোতাদের কারো অজানা আছে বলে আমি মনে করি না। এরপরও পরিপূর্ণতার খাতিরে এসব কথা বলতে হলো। অজানা আরো অনেক ব্যাপার আছে যা এখনই বুঝিয়ে দেবো। আপনারা যদি অনুমতি দেন! যেমন:

ক. পুরুষ লিঙ্গের মধ্যে আছে বেশ কিছু অতিসংবেদী **'স্নায়ুকোষ'** [nerve cell]।

খ. তিনটি বৃত্তাকার কক্ষ মিলে এটি তৈরী হয়েছে। এসব চেম্বার বিশেষ ধরনের স্পঞ্জের মতো টিস্যু দ্বারা সৃষ্ট। এসব টিস্যুর মধ্যে বড়ো বড়ো ফাঁকা জায়গা আছে। যৌন উত্তেজনা হলেই এসব ফাঁকা জায়গা রক্তে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

গ. পুনর্জনন কোষের নাম শুক্র। যে তরল পদার্থে সকল শুক্র থাকে তার নাম **'সিমেন'** [semen]। অসংখ্য শুক্রকোষসহ সিমেন বেরিয়ে আসে। শুক্রকোষ নারীদের ডিম্বকোষের ভেতর প্রবেশ করলেই গর্ভধারণ ক্রিয়া শুরু হয়। সিমেন বের হওয়ার সময় এর সাথে প্রস্রাব যাতে যুক্ত না হয় সেজন্য অগ্রগ্রন্থির মুখ সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

খ. **অণ্ডকোষের থলে [scrotum]:** একে বাংলায় **'মুষ্ক'** বলে। এটি একটি বিশেষ ডিজাইনের থলে। অণ্ডকোষ এরই মধ্যে অবস্থান করে। অনেক নার্ভ সেল ও রক্তশিরায় পরিপূর্ণ পুরো থলেটি। এটা **'আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের'** কাজও করে। কারণ একটি বিশেষ তাপমাত্রায় পুরুষের শুক্রকোষ উৎপাদন হয়ে থাকে। আমাদের দেহের অন্যান্য অংশের তাপমাত্রা থেকে কিছুটা কম তাপ থাকতে হবে অণ্ডকোষে। মুষ্কের দেওয়ালে কিছু বিশেষ পেশী আছে। এদের কাজ হলো প্রয়োজনে পুরো থলেকে সংকোচ কিংবা বড়ো করা। এভাবে করার উদ্দেশ্য হলো বেশী ঠাণ্ডার সময় অণ্ডকোষকে দেহের তাপ দ্বারা উষ্ণকরণ ও গরমের সময় ঠাণ্ডাকরণ। সুতরাং গ্রীষ্মকালে অণ্ডকোষের থলের আয়তন বৃদ্ধি ও শীতে সংকোচন হওয়ার কারণ এখন সবার নিকট স্পষ্ট হলো। ঠিক না?

গ. অণ্ডকোষ: ইতোমধ্যে শ্রোতাবন্ধুরা অণ্ডকোষের মূল কাজ কি তা অবশ্য জেনে নিয়েছেন: এটা তৈরী করে পুরুষ পুনর্জনন তন্ত্রের মূল উপাদান শুক্রকোষ। মুষ্কে থাকা উভয় অণ্ডকোষ আকারে ডিম্বাকৃতির। **'স্পারমেটিক কর্ড'** [spermatic cord] নামক কিছু টিস্যু দ্বারা উভয়টি সংরক্ষিত। আমি জানতাম সকল পুরুষের দু'টি অণ্ডকোষ আছে। কিন্তু এ লেকচারের নোট লেখার সময় তথ্য বেরিয়ে আসলো, কিছু মানুষের নাকি একটি মাত্র অণ্ডকোষ আছে! যাক শুক্রকোষ সৃষ্টির কারখানা এসব অণ্ডকোষ **'টেস্টোস্টেরোন'** [testosterone] নামক একটি গুরুত্বপূর্ণ যৌন উদ্দীপক রসও [sex hormone] বানায়। অণ্ডকোষের ভেতর অসংখ্য ঘোরানো পেঁচানো **'পাইপ'** আছে। এগুলোকে বলে **'সোমনিফেরাস টিউবিউল'** [somniferous tubule]। এসব পাইপই শুক্রকোষ সৃষ্টির কাজটি আঞ্জাম দেয়।

৩. ১২. মহিলা পুনর্জনন দেহযন্ত্র [organs]

পুনর্জনন একটি যৌথ ক্রিয়ার নাম। অর্থাৎ পুরুষ ও নারীর পুনর্জনন তন্ত্র একটা আরেকটার সম্পূরক ব্যবস্থা। আমরা ইতোমধ্যে পুরুষদের পুনর্জনন তন্ত্রের উপর আলোচনা করেছি। এবার নারীদের পুনর্জননের উপর কিছুটা তথ্য তুলে ধরবো। এবারও বলে রাখি, বিজ্ঞানের উপর এই লেকচারসমূহ অপূর্ণ থেকে যাবে যদি আমরা **'টাচি'** এই বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে যাই। তবে শ্রোতা বন্ধুদেরকে আশ্বস্ত করছি এই বলে যে, আমাদের আলোচনা হবে সীমিত ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানভিত্তিক। মহিলা পুনর্জননের তন্ত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত একটি মাত্র চিত্র এখানে তুলে ধরবো। সঙ্গত করণেই এই স্বেচ্ছা-সীমিতকরণ।

সকল দেহতন্ত্রের মতো মহিলা পুনর্জনন তন্ত্রটিও কয়েকটি বিশেষ কার্য সাধনে ডিজাইন করা হয়েছে। এটার মূল কাজ হলো পুনর্জননের জন্য গুরুত্বহ **'নারী ডিম্বকোষ'** [female egg cell] তৈরী করা। সঠিক স্থানে এই ডিম্বকোষ পৌঁছানোর জন্য একটি যোগাযোগ ব্যবস্থা তন্ত্রের মধ্যে সম্পৃক্ত হয়েছে। যেখানে ডিম্বকোষ পুরুষের শুক্রকোষ দ্বারা ফলনশীল হবে সে স্থানকে আমরা **'ফলনশীলতার এলাকা'** [site of fertilization] বলতে পারি। **ফ্যালোপিয়ান টিউব** [Fallopian tube] নামক একটি পাইপ হলো এই এলাকা। এখানেই **'গর্ভধারণ'** [pregnant] ক্রিয়াটি সংঘটিত হয়।



গর্ভধারণ মুহূর্ত শেষে ডিম্বকোষটি **'ফলনশীল'** [fertilized] হলো। নারীদের গর্ভাশয় [uterus] হলো শিশু বেড়ে ওঠার স্থান। ফলনশীল ডিম্বকোষ গর্ভাশয়ের দেওয়ালে যেয়ে লটকে থাকে। এ পর্যায়ই হলো গর্ভধারণের প্রাথমিক স্তর। কিন্তু এ স্তরে না পৌঁছলে এই ডিম্বকোষ ও অন্যান্য বস্তুর কি হবে? অর্থাৎ পুরুষের শুক্রকোষ দ্বারা ফলনশীল না হলে গর্ভধারণের জন্য প্রস্তুতি সংক্রান্ত বস্তুসমূহ তো বর্জ্য হয়ে গেল। তন্ত্রকে এরূপ ডিজাইন করা হয়েছে যে, প্রতি মাসে গর্ভধারণে ব্যর্থ হওয়ার পর যাবতীয় অকেজো বস্তু **'পিরিওডের'** বা **'মাসিকের'** [menstrual cycle] মাধ্যমে বাইরে নির্গত হয়ে যায়। মহিলা পুনর্জনন তন্ত্র খুব জরুরী একটি যৌন উদ্দীপক রসও তৈরী করে। আমরা এবার পুনর্জননের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিভিন্ন দেহযন্ত্র ও ব্যবস্থার উপর আরো কিছুটা আলোচনা করবো। আশা করি শ্রোতা বন্ধুরা এ থেকে অতিরিক্ত জানতে সক্ষম হবেন মানব পুনর্জনন ক্রিয়াটি সম্পর্কে।

৩. ১২. ক. মহিলা পুনর্জনন দেহাংশ [organs]

মহিলা পুনর্জনন তন্ত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত আছে বেশ কয়েকটি দেহাংশ। এর মধ্যে **'ইউটারাস'** [uterus], **'অভারিজ'** [ovaries] এবং **'ফ্যালোপিয়ান টিউব্‌স'** [fallopian tubes] এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমরা একে একে এ তিনটির উপর আরো কিছু তথ্য তুলে ধরার প্রয়াস পাচ্ছি।

'ইউটারাস' [uterus]: একে বাংলায় গর্ভাশয় বলে। এটা ভেতরে ফাঁকা একটি কক্ষ যেখানে শিশু বেড়ে ওঠে জন্মের পূর্ব পর্যন্ত। গর্ভের শিশুকে বিজ্ঞানের ভাষায় **'ফিটাস'** [fetus] বলে। বাংলায় শব্দটির অর্থ ভ্রূণ।

গর্ভাশয় দু'টি অংশে বিভক্ত: ছোট্ট নিম্নাংশ যাকে **'সার্ভিক্স'** [cervix] বলে। এ অংশ যোনির সঙ্গে সংযুক্ত। দ্বিতীয় অংশের নাম **'কর্পাস'** [corpus]। গর্ভাশয়ের মূল অংশ এটি। এটা শিশু বেড়ে ওঠার সময় প্রয়োজনে আয়তনে বড় হতে পারে। পুরুষের শুক্রকোষ সার্ভিক্সে স্থাপিত একটি নালা দিয়ে প্রবেশ করে। একই নালা দিয়ে পিরিওডের রক্তও বের হয়ে যায়।

'অভারিজ' [ovaries]: একে বাংলায় ডিম্বাশয় বলে। এটা ডিম্বাকৃতির গ্রন্থি। গর্ভাশয়ে উভয় দিকে এই গ্রন্থির অবস্থান। বুঝাই যাচ্ছে, অভারিজের কাজ হলো ডিম্বকোষ ও উদ্দীপক রস তৈরী করা।

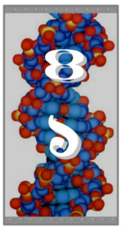
ফ্যালোপিয়ান টিউব্‌স [fallopian tubes]: এগুলো সরু পাইপের মতো। গর্ভাশয়ের উপরের অংশে উভয়টি সংযুক্ত। ডিম্বকোষ এদের ভেতর দিয়ে ভ্রমণ করে। ফ্যালোপিয়ান টিউব্‌স মূলত সুড়ঙ্গ পথের মতো। ডিম্বকোষ ডিম্বাশয় থেকে এসব সুড়ঙ্গ পথে গর্ভাশয়ে আসে। অবশ্য **'ফলনশীন'** হওয়ার জন্য ডিম্বকোষকে গর্ভাশয়ে পৌঁছা জরুরী নয়- পথে ওসব সুড়ঙ্গে থাকাবস্থায়ই শুক্রকোষ তাদের ভেতরে প্রবেশ করতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাই হয়। ডিম্বকোষের ভেতর সাধারণত একটি মাত্র শুক্রকোষ প্রবেশ করলেই গর্ভধারণ প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়।

ডিম্বকোষ ফ্যালোপিয়ান টিউবসে **'ফার্টিলাইজ্‌ড'** [fertilized] হওয়ার পর ধীরে ধীরে গর্ভাশয়ে প্রবেশ করে। প্রথমে এই ফলনশীন ডিম্বকোষ গর্ভাশয়ের দেওয়ালে যুক্ত হয়ে কোষ বিভক্তির মাধ্যমে বেড়ে ওঠতে থাকে। দীর্ঘ ১০ মাস ১০ দিন পর্যন্ত গর্ভাশয়ে থেকে নতুন এক শিশুসন্তান পৃথিবীর আলোবাতাসে আত্মপ্রকাশ করে। জন্ম-নেওয়া শিশু কিন্তু বাড়তে থাকে পূর্ণ বয়সে পদার্পণের পূর্ব পর্যন্ত।

প্রিয় ছাত্র বন্ধুরা! আজকের বক্তৃতার ইতি টানার আগে আরো এক দু'টো কথা যুক্ত করতে চাচ্ছি। মানব শিশু কিভাবে মহিলাদের গর্ভে বেড়ে ওঠে তা সঠিকভাবে জানার বিজ্ঞানকে বলে **'এম্ব্রিওলজি'** [embryology]। বাংলায় বলে ভ্রূণ-বিজ্ঞান বা ভ্রূণবিদ্যা। উপরে বর্ণিত তথ্যাদি এই বিরাট বিষয়ের উপর ধারণা প্রদান বৈ নয়। এখানে এম্ব্রিওলজির উপর আলোচনা আদৌ সম্ভব নয়। বাস্তবে এটা লেকচারের ব্যাপ্তির বাইরেও বটে। মানব দেহ সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের জন্য দীর্ঘদিন কঠোর পরিশ্রমসহ পড়াশুনা করে **'ডাক্তার'** হতে হয়। শিক্ষার্থীদের কেউ যদি এ বিষয়ের উপর অধ্যয়ন করে থাকেন তাহলে উপরোক্ত ক'টি লেকচার হয়তো তার জন্য খুব একটা সহায়ক হবে না। তবে আমার মতো যারা ডাক্তার নই, তাদের জন্য অবশ্য এ চেষ্টা একেবারে বিফলে যাবে না, আশাকরি। যাক, পরবর্তী লেকচারে উপস্থিত হতে সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো শেষ করছি। আল্লাহ হাফিজ।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম





বক্তা: ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী, নেশন্যাল ডিপ্লোমা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ইংল্যান্ড।

স্থান: খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সুবিদ বাজার, সিলেট।

চ. গণিত শাস্ত্রের গুরুত্ব

বক্তৃতা ৪১ : গণিত

চ. ১. বিজ্ঞানের 'মা' গণিত শাস্ত্র

প্রিয় ছাত্রবন্ধুরা! ওয়েলকাম! ওয়েলকাম! একচল্লিশতম লেকচারে সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। বিজ্ঞান জগতের উপর আমাদের সংক্ষিপ্ত বিচরণের এটাই সর্বশেষ চেষ্টা। ইতোমধ্যে চল্লিশটি বক্তৃতা উপস্থাপন করেছি। হ্যাঁ, সবগুলো লেকচারই ছিলো **'গণিতমুক্ত'**। কিন্তু বাস্তবে বিজ্ঞান শুধু গণিতযুক্ত নয়, বলা হয় বিজ্ঞানের **'মা'** হলো গণিত। যাকিছু আগের ৪০টি লেকচারে উপস্থাপন করেছি তার প্রত্যেকটির সঙ্গে গণিতশাস্ত্র অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গণিতেরই নির্যাস। সুতরাং শেষ এই লেকচারে সম্ভবত সর্বাপেক্ষা জটিল-কঠিন ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে **'চিত্তাকর্ষকহীন'** [boring] কিছু তথ্য তুলে ধরতে হচ্ছে। গণিতের গুরুত্ব না বুঝলে বিজ্ঞানীদের গবেষণার স্বরূপই আঁচ করা সম্ভব নয়। তাহলে আসুন, অঙ্ক নিয়ে কথা হোক!

চ. ২. গণিত কি জিনিষ?

শিরোনামের প্রশ্নের জবাব এক কথায় দেওয়া যায়: গণিত সব জিনিষ! আরবী ভাষায় গণিতকে **'ইলমুল হিসাব'** বলে। গণিত হিসাব-বিজ্ঞান, এটাই গণিতের যথার্থ সংজ্ঞা। জগতের সৃষ্টিকৌশলে গণিতের ব্যবহার সর্বত্র। প্রতিটি

অণু থেকে মহাকাশের তারামণ্ডল তথা পুরো বিশ্বজগতে গণিতের ছড়াছড়ি। মানুষ আদি যুগ থেকে গণিতকে ব্যবহার করে আসছে- স্বাভাবিক কারণেই। প্রাত্যহিক জীবনচলার ক্ষেত্রে মাপজোখ তো একান্ত অপরিহার্য। গণনা, মাপা, ওজন করা, বস্তুর গঠন-আয়তন নির্ণয় ইত্যাদি গণিত দ্বারাই সম্ভব।

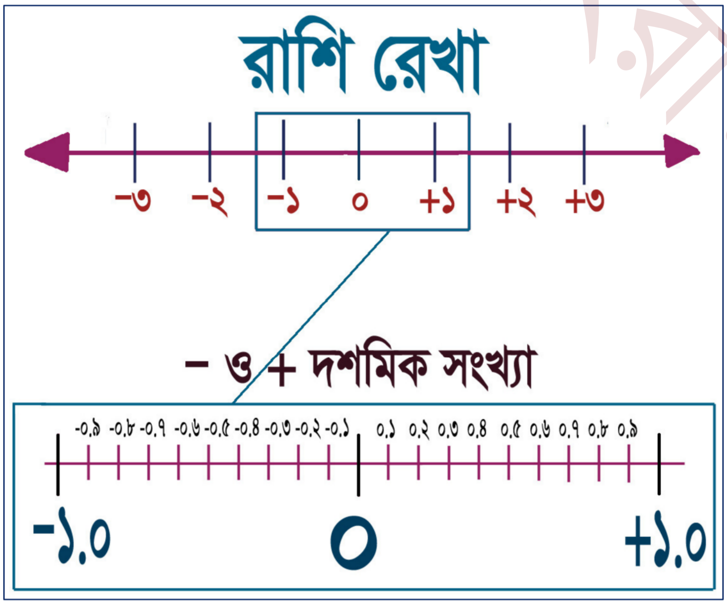
আধুনিক যুগে **'প্রযুক্তি'** ও **'পদার্থ বিজ্ঞান'** গণিতের ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের ফলে উন্নত থেকে উন্নততর হয়েছে এবং হচ্ছে। এমনকি গত ক'টি লেকচারে ব্যাখ্যাত **'জীববিদ্যা'** বিষয়েও গণিতকে বিজ্ঞানীরা কাজে লাগাচ্ছেন। কম্পিউটার বিজ্ঞান তো পুরোটাই হিসাব-নিকাশ তথা অঙ্ক শাস্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কম্পিউটারের **হার্ডওয়্যার** ও **সফট্ওয়্যার** উভয়টি অঙ্ক ছাড়া মোটেই আত্মপ্রকাশ করতো না। মুসলিম বিজ্ঞানী **মূসা আল-খোয়ারিজমি** [৭৯০-৮৫০] সেই অষ্টম শতকে **'আল-জাবরা'** বা বীজগণিত আবিষ্কার করে কম্পিউটার বিজ্ঞানের উদ্ভাবনকে সুগম করে গিয়েছিলেন। তাঁর অবদানকে মানুষ ভুলে নি। কম্পিউটার বিজ্ঞানের গণিতকে নামকরণ করা হয়েছে **'আলগরিথম'** [algorithm]। শব্দটি মূলত আল-খোয়ারিজম শব্দের বিকৃত রূপ।

চ. ৩. গণিতের মূল শাখাসমূহ

সকলেই অবগত আছেন, গণিত বা অঙ্কের মূল চারটি শাখা আছে। এগুলো হলো: ১. পাটিগণিত [arithmetic], ২. জ্যামিতি [geometry], ৩. ত্রিকোণমিতি [trigonometry] ও ৪. বীজগণিত [algebra]। প্রতিটির আবার একাধিক উপশাখা আছে। আমরা গণিতের কঠিন [কিংবা সরল] কোনো **'অঙ্ক'** কষতে যাচ্ছি না। এটা নিশ্চিত হওয়ায় হয়তো অনেকে **'হাফ ছেড়ে রক্ষা পেয়েছেন!'**। তবে আমরা অবশ্যই উক্ত চারটি বিষয়ের উপর কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত আলোচনা করবো। এগুলোর মূল উদ্দেশ্য, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিতে এদের ব্যবহারের গুরুত্ব ইত্যাদি উপলব্ধি করা একান্ত জরুরী।

চ. ৩. ক. পাটিগণিত

প্রাত্যহিক হিসাব-নিকাশে সংখ্যার ব্যবহার করতে হয়। বিশেষকরে যোগ, বিয়োগ, ভাগ ও পূরণ অঙ্ক আমরা সর্বদা করে থাকি। এছাড়া গড় ও শতাংশ নির্ণয়ও সময় সময় দরকার পড়ে। সংখ্যা নিয়ে এভাবে অঙ্ক কষার নামই হলো পাটিগণিত। বাস্তবে গ্রীক শব্দ **'এ্যারিথমোস'** [arithmos] যা থেকে **'এ্যারিথমেটিক'** [arithmetic] শব্দের উৎপত্তি অর্থই হলো **'সংখ্যা'** [number]। মোটকথা সংখ্যা নিয়ে সকল অঙ্কই মূলত পাটিগণিতের আওতাধীন।



অকৃত্রিম রাশি [natural numbers]: সংখ্যাকে গণনা করতে হয়। ০, ১, ২, ৩ .... ইত্যাদি সকল সংখ্যাকে বলে অকৃত্রিম রাশি। অকৃত্রিম রাশি বা সংখ্যা হতে পারে পজিটিভ [+ চিহ্নযুক্ত] কিংবা নেগিটিভ [− চিহ্নযুক্ত]। পাশের **'রাশি রেখাটি'** দেখুন।

যোগ ও বিয়োগ: যোগের সংজ্ঞা হলো **'ক + খ = গ'**। **গ**-কে বলে **ক** ও **খ** এর যোগফল। প্রতিটি অক্ষর হলো একেকটি যোগক। '+' চিহ্নকে **'যোগ'** [plus] বলে। আর '=' বলে **'সমান'** [equal]।

বিয়োগ অঙ্ক দ্বারা একটি রাশি থেকে আরেকটি কমানো হয়। সুতরাং **'ক − খ = গ'** একটি বিয়োগ অঙ্ক। এখানে '−' চিহ্নকে বলে 'বিয়োগ' [minus]। বিয়োগফল [difference] **গ** হতে পারে পজিটিভ কিংবা নেগিটিভ। যদি **ক** এর মান **খ** থেকে ছোট হয় তাহলে বিয়োগফল নেগিটিভ, অন্যথায় পজিটিভ।

পূরণ ও ভাগ: সংখ্যাকে গুণ করার নাম পূরণ। যেমন: **৫+৫+৫ = ১৫**। এখানে আমরা একই সংখ্যাকে তিনবার যোগ করেছি। অর্থাৎ **৩** গুণ করেছি। সুতরাং আমরা বলতে পারি **৩ x ৫ = ১৫**। এখানে সংখ্যা **'৫'** এবং **'৩'** হলো গুণক [multiplicand or multiplier]। আর **'১৫'** হলো গুণফল [product]। চিহ্ন 'x' -কে 'পূরণ' [times] বলে।

ভাগ অঙ্ক মূলত পূরণের বিপরীত ক্রিয়া। **ক / খ = গ** - এখানে **খ** রাশিকে কতোবার যোগ দিলে রাশি **ক** হবে সেটাই নির্ণয় হবে। আমরা দেখিয়েছি **'৫+৫+৫ = ১৫'** -এই অঙ্ককে **৩ x ৫ = ১৫** লিখা যায়। এখন যদি আমরা লিখি, **১৫/৫** তাহলে ফল হবে **৩**। এটা দ্বারা বুঝানো হচ্ছে **'১৫'** সংখ্যা হবে **৫**-কে তিনবার যোগ দিলে।

আস্ত বা পূর্ণ সংখ্যা [integer]: সকল অকৃত্রিম সংখ্যাকে বলে **'পূর্ণ সংখ্যা'** [integer]। যেমন, ১, ২, ৩, ৪ ... ইত্যাদি। এই সেটের নাম পজিটিভ পূর্ণ সংখ্যা [ঢ়ড়ংরঃরাব রহঃবমবৎ]। আর -১, -২, -৩, -৪ .... ইত্যাদি হলো নেগিটিভ পূর্ণ সংখ্যা [negative integer]।

লক্ষ্য করুন, পজিটিভ কিংবা নেগিটিভ পূর্ণ সংখ্যা দ্বারা যোগ কিংবা বিয়োগ করলে ফলাফল পজিটিভ কিংবা নেগিটিভ পূর্ণ সংখ্যা হবে। যেমন: **−৩+৫ = ২** এবং **৭−৯ = −২**। একই কথা সত্য পূরণ অঙ্কের ক্ষেত্রেও। যেমন: **−৯ x ৭ = −৬৩** বা **৮ x ৩ = ২৪**। কিন্তু ভাগ অঙ্কের ক্ষেত্রে ভাজক ও ভাজ্য উভয়টি [পজিটিভ কিংবা নেগিটিভ] পূর্ণ সংখ্যা হলেও ফলাফল পূর্ণ সংখ্যা না-ও হতে পারে। যেমন: **৬/৪ = ১.৫** - এখানে ফলাফল দশমিক সংখ্যা।

পাওয়ার [power - exponent]: কোন রাশি যদি বার বার যোগ করা হয় তাহলে একে আমরা ভিন্নভাবে লিখতে পারি। যেমন: **ক+ক+ক = ৩ক**। অনুরূপ কোন রাশি যদি বার বার গুণ করা হয়- যেমন: **ক x ক x ক x ক** $= ক^{৪}$। এভাবে লিখাই হলো পাওয়ার। আমরা বলি **'ক টু দ্যা পাওয়ার অব ৪'**। আমরা যদি বলি রাশি **ক**-কে রাশি **গ** পাওয়ারে তুলা হবে- তাহলে লিখবো $ক^{গ}$। এভাবে লিখা অনেকটা সহজ ও এগুলো নিয়ে অঙ্ক কষাও সুবিধাজনক। যেমন: $২^{৩} \times ২^{৫} = ২^{(৩+৫)} = ২^{৮}$। এখানে একটি **'ইন্ডিসেস আইন'** [rules of indices] ব্যবহার করেছি। নীচে সব ক'টি আইন তুলে ধরলাম।

১. গুণ: $ক^{খ} \times ক^{গ} = ক^{(খ+গ)}$

২. ভাগ: $ক^{খ}/ক^{গ} = ক^{(খ-গ)}$

৩. পাওয়ার: $(ক^{খ})^{গ} = ক^{খগ}$।

৪. রুট: $\sqrt[খ]{ক} = ক^{১/খ}$।

৫. নেগিটিভ পাওয়ার: $ক^{-খ} = ১/ক^{খ}$

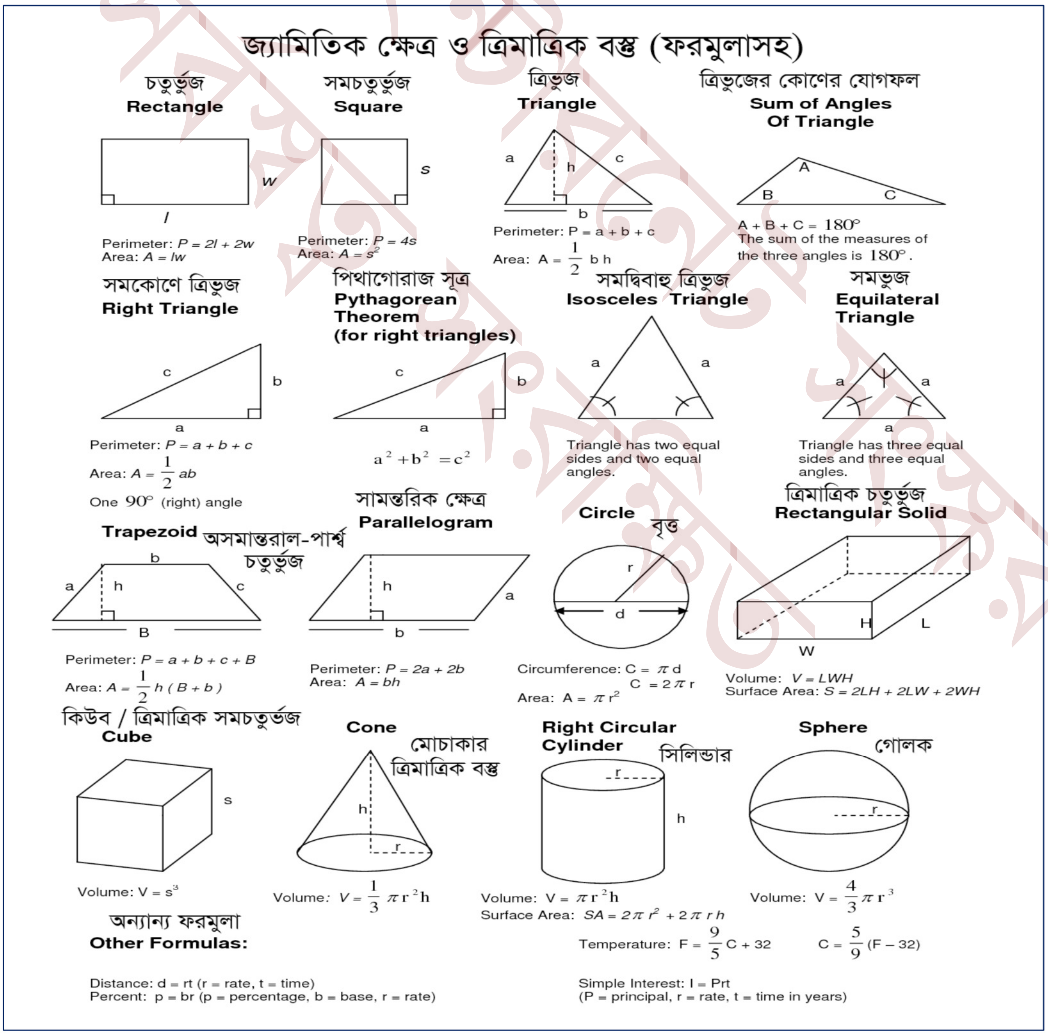
৬. পাওয়ার ভগ্নাংশ: $ক^{গ/ঘ} = (\sqrt[ঘ]{ক})^{গ}$

ছাত্রবন্ধুদেরকে নিশ্চিত করেছিলাম, অঙ্ক কষতে যাবো না। তাই পাটিগণিতের আরো এক দু'টো বিষয় উল্লেখ করে গণিতের অন্যান্য শাখার উপর কিছুটা আলোচনা করার ইচ্ছা রাখি।

ভগ্নাংশ: যে কোন রাশি অপর কোনো রাশি দ্বারা ভাগ করতে যেয়ে আমরা লিখতে পারি: **ক/খ** এবং ফলাফলও **ক/খ** হিসাবে রেখে দেওয়া যায়। এভাবে করার নামই **ভগ্নাংশ** [ভাগের অংশ]। যেমন: **৫/১৫ = ১/৩**। ভগ্নাংশের যোগ, বিয়োগ, ভাগ ও পূরণ করা যায়।

যেমন: **১/২ + ১/৪ = ৩/৪; ২/৫ - ৪/১৫ = ২/১৫; ১/৯/৬/৭ = ১/৯ x ৭/৬ = ৭/৫৪ এবং ১/২ x ৫/৮ = ৫/১৬।**

উপরের চারটি ভগ্নাংশ অঙ্ক কষতে যেয়ে কিছু আইন-কানুন ব্যবহার করেছি। এ সম্পর্কে অতিরিক্ত কিছু বলছি না। পাটিগণিতের উচ্চতর পর্যায়ে কিছু **'রাশি থিওরী'** [number theory] আছে যেগুলোর উপর বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই।



চ. ৩. খ. জ্যামিতি

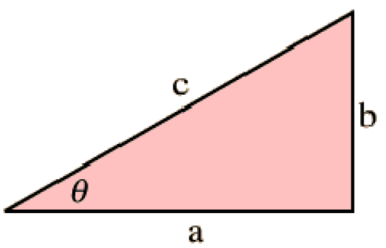
এটি গণিতের আরেকটি বিরাট বিষয়। এ প্রসঙ্গে জ্যামিতির উপর শুধুমাত্র **‘ভূমিকা’** প্রদান ছাড়া আর কিছু সম্ভব নয়।

জ্যামিতি শব্দের অর্থ **‘জমিনের মাপজোখ’**। এটা ঠিক তা-ই। বস্তুর সারফেস বা পৃষ্ঠদেশ নিয়ে অঙ্ক কষার নাম **‘সমতল জ্যামিতি’** [plane geometry]। বস্তুর ত্রিমাত্রিক মাপজোখের উপর অঙ্ক কষার নাম **‘ত্রিমাত্রিক জ্যামিতি’** [solid geometry]। জ্যামিতির মূল কয়েকটি শাখা আছে। যেমন: ইউক্লিডিয়ান জ্যামিতি, এ্যানালিটিক জ্যামিতি, প্রজেক্টিভ জ্যামিতি, ডিফ্রানশিয়্যাল জ্যামিতি, নন-ইউক্লিডিয়ান জ্যামিতি এবং টপোলজি। আমরা এগুলোর উপর বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি না।

উপরের (আগের পৃষ্ঠার) চিত্রে আমরা বিভিন্ন **‘ফিগার’** [figure] দেখতে পাচ্ছি। জ্যামিতির মাধ্যমে এগুলোর ক্ষেত্রফল, ঘনফল, রেখার মাত্রা, পরিধিরেখা ইত্যাদি বের করতে পারি। প্রতিটি মান বের করার সূত্র বা সমীকরণ চিত্রে দেওয়া আছে। শ্রোতাবন্ধুরা! অবসর সময়ে এগুলো দেখে নেবেন।

চ. ৩. গ. ত্রিকোণমিতি

শিক্ষার্থীদের যারা স্কুল-কলেজে পড়েছেন তারা তো অবশ্যই **ত্রিকোণমিতি** [trigonometry] কি জানেন। গণিতের এই শাখার কাজ হলো **‘কোণ’** নিয়ে অঙ্ক কষা। গ্রীক শব্দ **‘ট্রাইগোনোন’** [trigonon] থেকে **‘ট্রিগোনোমেট্রি’** [trigonometry] শব্দের উৎপত্তি। ট্রাইগোনোন অর্থ **‘ট্রায়াঙ্গল’** [triangle]। কোণের মোট ৬টি ফাংশন আছে। এগুলো ত্রিকোণমিতিতে ব্যবহৃত হয়। এগুলো হলো: ১. সাইন [sine - sin], ২. কোসাইন [cosine - cos], ৩. টানজেন্ট [tangent - tan], ৪. কোটানজেন্ট [cotangent - cot], ৫. সিকেন্ট [secant - sec] ও ৬. কোসিকেন্ট [cosecant - csc]। আমরা ব্রাকেটে সংক্ষেপ শব্দগুলোও উল্লেখ করেছি যা সচরাচর ব্যবহৃত হয়। এই ৬টি ত্রিকোণমিতির ফাংশন সমকোণে ত্রিভুজের ক্ষেত্রে যেভাবে উপস্থাপন হয় তা দেখানো হয়েছে।



$$\text{sine}: \sin\theta = \frac{b}{c} = \frac{\textit{side opposite } \theta}{\textit{hypotenuse}}$$

$$\text{cosine}: \cos\theta = \frac{a}{c} = \frac{\textit{side adjacent } \theta}{\textit{hypotenuse}}$$

$$\text{tangent}: \tan\theta = \frac{b}{a} = \frac{\textit{side opposite } \theta}{\textit{side adjacent } \theta} = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}$$

$$\text{cotangent}: \cot\theta = \frac{\cos\theta}{\sin\theta} = \frac{1}{\tan\theta}$$

$$\text{secant}: \sec\theta = \frac{1}{\cos\theta}$$

$$\text{cosecant}: \csc\theta = \frac{1}{\sin\theta}$$

ত্রিকোণমিতি গণিতের খুব ব্যবহারোপোযোগী একটি শাখা। মহাকাশবিজ্ঞান, মানচিত্র তৈরী, সার্ভে কাজ ইত্যাদিতে ত্রিকোণমিতি ব্যবহৃত হয় বিভিন্ন কোণ ও দূরত্ব নির্ণয়ে। ত্রিকোণমিতির মূল শাখা দু'টি: ১. সমতল ত্রিকোণমিতি ও ২. গোলকাকার ত্রিকোণমিতি।

চ. ৩. গ. বীজগণিত

ফার্সি মুসলিম গাণিতিক **মুসা আল-খোয়ারিজমি** গণিতের এই গুরুত্বপূর্ণ শাখার জন্মদাতা। পুরো বিজ্ঞানজগৎ অচল হয়ে পড়বে বীজগণিত ছাড়া। এই গণিতের মৌলিক কথা হলো, সংখ্যার বদলে অক্ষরের ব্যবহার। এর ফলে যে কোন সমীকরণকে **'জেনারেলাইজ'** [generalize] করা যায়। এই সার্বজনীনকরণ একান্ত জরুরী।

ইক্যুয়েশন [equation] বা সমীকরণ শব্দের অর্থ হলো একটি '=' [equal] চিহ্নের উভয় দিক গাণিতিকভাবে সমান। একটি অজানা রাশি **ক**-এর সঙ্গে আরেকটি অজানা রাশি **খ** যোগ করলে ফল হয় আরেকটি অজানা রাশি **গ**। এই কথাগুলো আমরা এভাবে লিখতে পারি: **ক + খ = গ**। এই সমীকরণটি সাধারণ ও সার্বজনীন। **ক** ও **খ** যে কোন রাশি হতে পারে। ফলাফল সর্বদাই **গ** হবে। আমরা এই সাধারণ সমীকরণে রদবদল আনতে যেয়ে একটি আইন অনুসরণ করতে পারি: **"সমান চিহ্নের বায়ে যা করবো, সমান চিহ্নের ডানেও তা-ই করতে হবে।"**

উপরের আইন মতে যতি বলি: **৩ক+৩খ = ৩গ**, তাহলে সমীকরণ সঠিক থাকবে। এখানে সকল অজানা রাশিকে ৩ গুণ করেছি। অনুরূপ যদি বলি: **ক/ক + খ/ক = গ/ক** তাহলেও সমীকরণ সঠিক থাকবে। এখানে আমরা উভয় দিক **ক** দ্বারা ভাগ করেছি। বাস্তবে এরূপ করার মাধ্যমেই **'সমীকরণের সমাধান'** বের করতে হয়।

আল-খোয়ারিজমির পূর্ব পর্যন্ত বীজগণিতের **'সমীকরণ'** ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু তখন পর্যন্ত **'০'** এর কোন ধারণা কারোর ছিলো না। শূন্য আবিষ্কৃত হয়েছিল ভারতে। এর ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয় মুসলিম বিজ্ঞানীদের দ্বারা। আমরা যে সমীকরণ নিয়ে কথা বলছি তাকে এভাবেও লিখা যায়: **(ক+খ)-গ = ০**। আমরা যোগফল **গ**-কে সমান [=] চিহ্নের বায়ে নিয়ে যাওয়ায় তার সাইন [sign - + or −] বদলে দিয়েছি। ডানে **'কোন কিছু নাই'** তাই শূন্য বসেছে। যে কোনো এক বা একাধিক অক্ষরকে সমান চিহ্নের ডানে কিংবা বায়ে নিয়ে গেলে তার সঙ্গে জড়িত সাইন [+ কিংবা −] পাল্টাতে হবে। এটা বীজগণিতের একটি আইন। আসলে অধিকাংশ সমীকরণ ডানে শূন্য দিয়েই লিখা হয়। যেমন:

1. $3x^2 - 9x + 12 = 0$
2. $x^3 + cx = 0$

প্রিয় অনুসন্ধানী বন্ধুরা! বীজগণিতের উপর আর তেমন কিছু বলতে যাচ্ছি না। এটার সঙ্গে সমীকরণ জড়িত। আমরা যেহেতু অঙ্ক কষবো না তাই আর অতিরিক্ত কিছু বলার নেই। বাস্তবে পুরো লেকচারের ক্ষেত্রেও একই কথা সত্য-বিজ্ঞানের উপর আমাদের তথ্যানুসন্ধানের ইতি হতে যাচ্ছে এই লেকচারের মাধ্যমে। আপনারা নোটগুলো পাঠ করবেন। অনেক ছবি, চিত্রাঙ্কন ইত্যাদিসহ সুদীর্ঘ এই নোটগুলো সাজিয়েছি। আমি আশা করছি আপনারা সময় সময় এগুলো অধ্যয়ন করে উপকৃত হবেন। এটুকু বলেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফিজ।

সমাপ্ত